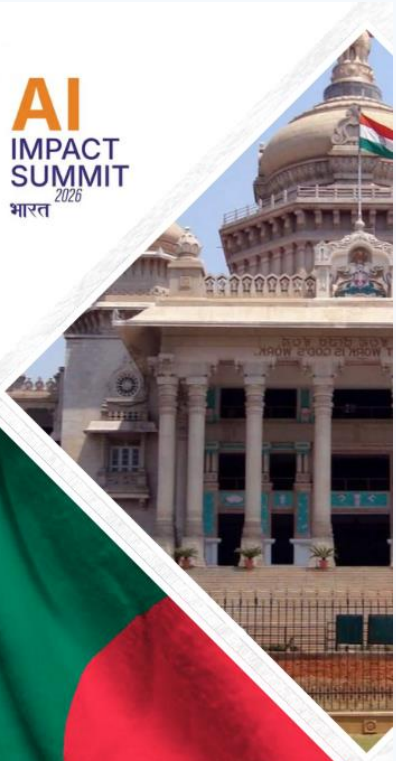

মার্চ ২০২৬

RICE IAS - এর সাথে শুরু হোক আপনার **UPSC CSE** প্রস্তুতির যাত্রা।

MAINS- এর জন্য প্রত্যাশিত

CURRENT AFFAIRS

Sealdah, Kolkata	Old Rajinder Nagar, New Delhi	At Adamas University
8100819447	9933118849	8100971442

RICE IAS

Daily Deep Analysis

for IAS Mains

- ***In-depth*** coverage of ***micro-topics*** from the ***UPSC GS Mains syllabus***
- One ***GS Mains topic*** covered ***comprehensively*** every day
- ***Systematic*** GS Mains syllabus ***mapping***
- Focused coverage of ***GS Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions*** with model answers

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis on our website

SCAN this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447

Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849

At Adamas University 8100971442

RICE IAS

Daily Editorial Explained

for IAS Mains

- *UPSC **Mains-oriented editorial** decoding*
- ***Theme-based** conceptual clarity*
- *Clear linkage with **UPSC GS papers***
- *Focused coverage of **UPSC Mains Previous Years' Questions***
- ***Expected Mains questions** with model answers*

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Read full analysis
on our website
SCAN
this QR

For more details visit: riceias.com

Sealdah, Kolkata 8100819447
Old Rajinder Nagar, New Delhi 9933118849
At Adamas University 8100971442

সূচক

1. সাধারণ স্টাডিজ ১ 1

1.1. ভারতীয় সমাজ 1

1.1.1. শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ 1

1.1.2. ভাষার গুরুত্ব: ভারতে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার 4

2. সাধারণ স্টাডিজ ২ 9

2.1. রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা 9

2.1.1. রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা: একটি পুনর্মূল্যায়ন 9

2.1.2. ১৬ তম অর্থ কমিশন 12

2.1.3. সংবিধান যখন পবিত্র আঙিনায়: ভারতে ধর্মীয় বিবাদের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা 15

2.1.4. আরবান লোকাল বডিজ (ULBs) 19

2.1.5. ফেডারেলিজম বা যুক্ত রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা 22

2.1.6. ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের অপরিহার্যতা 26

2.1.7. গোপনীয়তা বনাম স্বচ্ছতার দ্বন্দ্ব: RTI আইন ও DPDP আইনের ভারসাম্য 30

2.1.8. ব্যঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে: সাংবিধানিক নৈতিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা 33

2.1.9. সংসদের ঐতিহাসিক আইন: মহিলাদের জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর 37

2.1.10. ভারতের বিমান নিরাপত্তা ও অ-নির্ধারিত অপারেটর: চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার 39

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 42

2.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক 42

2.2.2. ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্ক 45

2.2.3. ভারত-গ্রীস সম্পর্ক 50

2.2.4. ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক 53

2.2.5. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির অস্পষ্টতা 57

2.2.6. বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির বিবর্তনীয় রূপ 60

2.2.7. ভারত-ব্রাজিল সম্পর্ক 63

2.2.8. আন্তর্জাতিক আইন 66

2.2.9. ভারত-ইসরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব 70

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার 73

2.3.1. ভারতে বন্ধকী শ্রম 73

2.3.2. বিমুক্ত জাতিদের (Denotified Tribes) জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণিবিভাগ 76

2.3.3. আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন 80

3. সাধারণ স্টাডিজ ৩ 83

3.1. অর্থনীতি 83

3.1.1. কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এর সারসংক্ষেপ 83

3.1.2. ভারতের টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ 86

3.1.3. ডিসকম (DISCOMs) এবং আগামীর পথ 89
3.1.4. রেলওয়েনিরাপত্তা: কবচ (Kavach) এবংএআই (AI) ইন্টিগ্রেশন 91
3.1.5. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬ 95
3.1.6. ভারতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পরবর্তী পর্যায় 98
3.1.7. ভারতের পরবর্তী শিল্প বিপ্লব: অণু বনাম ইলেকট্রন 102
3.1.8. ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা 106
3.1.9. সংশোধিত শ্রমবিধি: মজুরি কাঠামোর সংস্কার ও শ্রমিক সশক্তিকরণ 109
3.1.10. ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার 113
3.1.11. ভারতের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস স্ট্র্যাটেজি: নীতিগত পরিবর্তন থেকে কৌশলগত মূলধারা পর্যন্ত 116
3.2. পরিবেশ 120
3.2.1. জলাভূমি—জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য 120
3.2.2. র‍্যাট-হোল মাইনিং-এর স্থায়িত্ব: আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ 124
3.2.3. গ্রেট নিকোবর প্রকল্প: উন্নয়ন বনাম পরিবেশ 127
3.2.4. কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) প্রযুক্তি 130
3.2.5. ভারতে বোতলজাত জলের নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রকৃত সত্য 133
3.3. বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি 136
3.3.1. ইন্ডিয়া এআই স্ট্যাক 136
3.3.2. AMCA এবং ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যবস্থা 138
3.3.3. আসন্ন এআই (AI) বিপ্লব এবং এর বৈশ্বিক প্রভাব 141
3.3.4. SHANTI আইন এবং ভারতের পারমাণবিক রূপান্তর 144
3.3.5. ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষেবা 147
3.3.6. এআই ইমপ্যাক্ট সংক্রান্ত নয়াদিল্লি ঘোষণা 150
4. সাধারণ স্টাডিজ 8 155
4.1. নীতিশাস্ত্র 155
4.1.1. খননযোগ্য সত্তা – পরবর্তী বড় পণ্য হিসেবে মানবজীবন 155

***

সাধারণ স্টাডিজ ১

1.1. ভারতীয় সমাজ

1.1.1. শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে তিন বোনের মর্মান্তিক আত্মহত্যার ঘটনা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর **সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব** নিয়ে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক তদন্তে **স্ক্রিন আসক্তি** (অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার) এবং পারিবারিক কলহের বিষয়গুলি উঠে এসেছে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত বিভিন্ন উদাহরণের মতো ভারতেও সোশ্যাল মিডিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে।
- যাইহোক, এই ধরনের **কঠোর বা একতরফা নীতি** অনিচ্ছাকৃতভাবে নাবালকদের ডিজিটাল অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলোকে তাদের **কাঠামোগত দায়বদ্ধতা** থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারে। তাই এখন সময় এসেছে একটি **সুস্থ মিডিয়া বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশের** দিকে নজর দেওয়ার।

সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বিমুখী প্রভাব

1. **শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল**

   বৈধ উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও, একটি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সমাজে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো শিশুদের বিকাশ এবং সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু **গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা** প্রদান করে:

   - **তথ্য প্রাপ্তি এবং শিক্ষা:** এটি গতানুগতিক শিক্ষার বাইরেও বিভিন্ন **শিক্ষামূলক কন্টেন্ট**, নতুন দক্ষতা অর্জনের উপায় এবং সম্মিলিতভাবে শেখার সুযোগ তৈরি করে দেয়।
   - **সৃজনশীল প্রকাশ:** এটি শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা প্রকাশের একটি পথ খুলে দেয়, যা শিশুদের **কল্পনাশক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা** বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
   - **সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সহায়তা:** এটি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য (যেমন- LGBTQIA+ **তরুণ-তরুণী**, প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রত্যন্ত বা সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিশু) একটি লাইফলাইন হিসেবে কাজ করে। এটি এমন এক **সহমর্মী নেটওয়ার্ক** তৈরি করে যা অফলাইনে হয়তো পাওয়া সম্ভব হয় না।
   - **ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি:** অল্প বয়স থেকে এই মাধ্যমগুলোর সাথে যুক্ত থাকলে শিশুদের **মিডিয়া সাক্ষরতা**, যোগাযোগের দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য অপরিহার্য।
   - **নাগরিক এবং সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ:** এটি শিশুদের বিভিন্ন **সামাজিক কর্মকাণ্ড**, সচেতনতামূলক অভিযান এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে অংশ নিতে উৎসাহিত করে, যা তাদের একজন সচেতন ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
   - **সামাজিক গতিশীলতা এবং লিঙ্গ সাম্য:** সোশ্যাল মিডিয়া তথ্য ও সুযোগের পরিধি বাড়িয়ে দেয়, যা বিশেষ করে মেয়েদের জন্য খুব উপকারী।
     - **তথ্য:** ভারতের **ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে** (NSS) অনুযায়ী, ভারতে মাত্র **৩৩.৩% নারী** ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার **৫৭.১%**।

2. **শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা**

শিশুদের গঠনমূলক বয়সে স্বাস্থ্য, আচরণ এবং নিরাপত্তার ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার বহুমুখী প্রভাবের কারণে এটি নিষিদ্ধ বা সীমিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়:

- **জ্ঞানীয় কার্যকারিতার ওপর প্রভাব:** অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে ব্যয় করার ফলে মনোযোগের অভাব, একাগ্রতা হ্রাস এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, যা সরাসরি শিক্ষাগত পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকি:** দীর্ঘসময় ধরে আসক্তিমূলক ব্যবহারের ফলে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, হীনম্মন্যতা এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়া ADHD-এর মতো মনোযোগজনিত ব্যাধিও বৃদ্ধি পায়।
- **শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি:** আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত কন্টেন্ট দীর্ঘক্ষণ দেখার ফলে শারীরিক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা তৈরি হয়। এটি ঘুমের ব্যাঘাত, স্থূলতা এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার জন্ম দেয়।
- **সামাজিক বিকাশে বাধা:** ভার্চুয়াল কথোপকথনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সরাসরি কথা বলার প্রবণতা কমিয়ে দেয়, যার ফলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং আবেগীয় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
- **অনলাইন নিরাপত্তা ও শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি:** শিশুরা ক্রমশ সাইবার বুলিং (অনলাইনে হেনস্থা), যৌন শোষণ এবং বয়স-অনুপযোগী বা ক্ষতিকর কন্টেন্টের শিকার হওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
- **বিপজ্জনক ভাইরাল ট্রেন্ডের প্রভাব:** অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ঝুঁকিপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহ (যেমন দম আটকে রাখা বা অপরাধমূলক প্রবণতা) শিশুদের শারীরিক ক্ষতি এবং আইনি সমস্যার মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
- **অপর্যাপ্ত অভিভাবকীয় তত্ত্বাবধান:** শহুরে এবং কর্মজীবী বাবা-মায়ের পরিবারে শিশুদের ওপর নজরদারি সীমিত হওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত স্ক্রিন টাইম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শৈশবকে ডিভাইস-নির্ভর করে তুলছে।
- **অ্যালগরিদম-চালিত আসক্তি:** সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলো এমনভাবে তৈরি যা ব্যবহারকারীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখে। এটি শিশুদের পক্ষে ফোন থেকে দূরে থাকা কঠিন করে তোলে এবং আসক্তি বাড়ায়।

শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

স্ট্যানলি কোহেনের **'মোরাল প্যানিক'** ধারণা অনুযায়ী, এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে "অশুভ শক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণের একটি মিথ্যা আশ্বাস তৈরি করে। এটি মূলত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত অভাব থেকে নজর ঘুরিয়ে দেয়। এর চ্যালেঞ্জগুলো বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ পায়:

- **বয়স যাচাইকরণ এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত উদ্বেগ:** নির্ভরযোগ্য বয়স যাচাইকরণ ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা VPN বা অন্য উপায়ে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যায়। সরকারি পরিচয়পত্র বা বায়োমেট্রিক যাচাইকরণের মতো পদক্ষেপগুলো ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- **অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা:** ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারি করলে গেম বা যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মগুলোও (যেমন PUBG বা Instagram) এর আওতায় চলে আসতে পারে, যা সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি করবে।
- **অনিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলে যাওয়া:** যেহেতু নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা কঠিন, তাই শিশুরা আরও অনিয়ন্ত্রিত এবং এনক্রিপ্টেড প্ল্যাটফর্ম বা **'ডার্ক ওয়েব'**-এ চলে যেতে পারে, যা তাদের ক্ষতির ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।
- **অধিকার-সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং বঞ্চনা:** নিষেধাজ্ঞা জারি করলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এটি বিশেষ করে প্রান্তিক গোষ্ঠী বা LGBTQIA+ তরুণদের ওপর প্রভাব ফেলে যারা অনলাইনের সহায়তামূলক নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল।
- **ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনে বাধা:** অ্যাক্সেস সীমিত করলে সৃজনশীলতা, শিক্ষামূলক সহযোগিতা এবং আগ্রহ-ভিত্তিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়, যা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল দক্ষতা তৈরির প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দেয়।

ভারতে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা কেন কার্যকর হবে না

বিদেশের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা ভারতের অনন্য সামাজিক ও প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে, যা গণতান্ত্রিক ঘাটতি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির কারণ হতে পারে।

- **প্রযুক্তিগত ছিদ্র:** ভারতের বিশাল ডিজিটাল জনসংখ্যার কারণে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা অবাস্তব।
- **প্রেক্ষাপটের বৈচিত্র্য:** সব ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করলে ভারতের শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য উপেক্ষিত হয়।
- **গণতান্ত্রিক ঘাটতি:** শিশুদের সাথে পরামর্শ না করেই প্রায়শই নীতি নির্ধারণ করা হয়, যা তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে (agency) অবজ্ঞা করে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা:** নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কাছে নিয়ম মানার বিষয়টি কার্যকরভাবে তদারকি করার মতো প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- **রাষ্ট্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ঝুঁকি:** সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সাথে পরিচয়পত্র যাচাইকরণ যুক্ত করলে তা নাগরিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করতে পারে।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শিশুদের সুরক্ষায় ভারতের উদ্যোগ

ভারত প্রতিরোধ, সম্মতি এবং প্রয়োগের ওপর জোর দিয়ে একটি বহুমুখী কাঠামো তৈরি করেছে।

- **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০২৩:** ১৮ বছরের কম বয়সীদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য অভিভাবকদের যাচাইযোগ্য সম্মতি বাধ্যতামূলক করে।
- **আইটি (IT) আইন ২০০০, ধারা ৬৭বি:** শিশুদের যৌন নির্যাতনমূলক কন্টেন্ট (CSAM) প্রকাশ, প্রচার বা দেখার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান দেয়।
- **শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৬:** যৌন অপরাধকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
- **পকসো (POCSO) আইন, ২০১২:** ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের শোষণ থেকে রক্ষা করে এবং শিশু-কেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।
- **NCPCR-এর কার্যপদ্ধতি:** দ্রুত প্রতিকারের জন্য 'ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস' অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
- **UNCRC (১৯৯০) অনুসমর্থন:** অনলাইনে এবং অফলাইনে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুরক্ষাকে উৎসাহিত করে।

শিশুদের সুরক্ষায় বিশ্বজুড়ে নেওয়া পদক্ষেপ

- **অস্ট্রেলিয়া:** ১৬ বছরের কম বয়সীদের ১০টি প্রধান সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে (**ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স ইত্যাদি**) অ্যাকাউন্ট খোলা নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেছে। বয়স যাচাইকরণ এবং ৫০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার পর্যন্ত জরিমানার মাধ্যমে এটি কার্যকর করা হচ্ছে।
- **জার্মানি এবং ফ্রান্স:** অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য অভিভাবকদের সম্মতির বয়সসীমা বাড়িয়েছে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** 'কিডস অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট' গোপনীয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করে।
- **যুক্তরাজ্য:** 'অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট, ২০২৩' ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য কঠোর মানদণ্ড এবং উপযুক্ত বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে।
- **নেদারল্যান্ডস এবং দক্ষিণ কোরিয়া:** শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করেছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

- **শিশু-কেন্দ্রিক ডিজিটাল শাসন কাঠামো:** রাষ্ট্র, প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বয়স-উপযোগী ডিজাইন, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা (Privacy-by-default) এবং অ্যালগরিদমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের 'Age-Appropriate Design Code' থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে।
- **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ:** চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এর পরিধি বাড়ানো, সাইবার নোডাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ এবং অনলাইন নির্যাতনের দ্রুত অভিযোগ জানাতে 'POCSO e-Box'-এর মতো ডিজিটাল প্যানিক বোতামের ব্যবহার আরও জনপ্রিয় করতে হবে।
- **ডিজিটাল দক্ষতা ও শিক্ষার প্রসার:** স্কুল পর্যায় থেকে ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। স্ক্রিন আসক্তি কাটাতে কেরালার 'ডিজিটাল ডি-অ্যাডিকশন (D-DAD)' কেন্দ্রের মতো মডেল সারা দেশে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- **সচেতনতামূলক অভিযান:** 'নিপুণ ভারত' (NIPUN Bharat) এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র মতো সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অনলাইন ঝুঁকি শনাক্ত ও তা মোকাবিলা করার জন্য সচেতন করতে হবে।
- **অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ:** শিশু ও অভিভাবকের যৌথ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা এবং 'গুগল ফ্যামিলি লিঙ্ক'-এর মতো অ্যাপের মাধ্যমে স্ক্রিন-টাইম নিয়ন্ত্রণ ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে উৎসাহ দিতে হবে।
- **প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা:** প্ল্যাটফর্মগুলোকে ব্যবহারকারীর সুরক্ষায় বিশেষ আইনি বাধ্যবাধকতার (Duty of care) আওতায় আনতে হবে। আইটি মন্ত্রকের (MeitY) বাইরে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে (যেমনটা বর্তমানে মেটা-র ১৩+ বয়সসীমা নীতিতে রয়েছে)।

উপসংহার

নিষেধাজ্ঞা কেবল নিয়ন্ত্রণের একটি ভ্রান্ত আশ্বাস দেয়, যা সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বিমুখী সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে ডিজিটাল অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রকৃত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে নীতি নির্ধারণ এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করা—যাতে প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে শিশুদের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবতন্ত্র ভারতের সংবিধানের সেই আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েই তরুণ সমাজকে শক্তিশালী করতে চায়।

প্রশ্ন: *ভারতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা ও ডিজিটাল অধিকার-এর মধ্যে বিদ্যমান টানাপোড়েন আলোচনা করুন। কীভাবে রাষ্ট্র একটি অধিকারভিত্তিক ও শিশু-কেন্দ্রিক ডিজিটাল শাসন কাঠামো নিশ্চিত করতে পারে? (২৫০ শব্দ)*

1.1.2. ভাষার গুরুত্ব: ভারতে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার

প্রেক্ষাপট

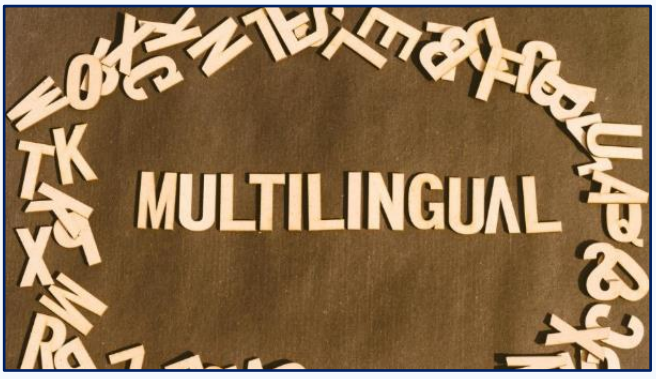

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারি)** উপলক্ষে, যার এবারের মূলভাব (Theme) ছিল **"বহুভাষিক শিক্ষায় যুব কণ্ঠস্বর"**, ইউনেস্কো (UNESCO) তাদের ভারত বিষয়ক সপ্তম শিক্ষা প্রতিবেদন (SOER) ২০২৫ প্রকাশ করেছে। **"ভাষা ম্যাটারস: মাতৃভাষা ও বহুভাষিক শিক্ষা"** শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি শিখন প্রক্রিয়ায় **ভাষাগত পরিচয়ের** গুরুত্বকে জাতীয় স্তরে নতুন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে।

ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতে **১,৩০০-এরও বেশি মাতৃভাষা** এবং **১২১টি স্বীকৃত ভাষা** রয়েছে। এই সুবিশাল বৈচিত্র্য ভারতের এক অনন্য জাতীয় সম্পদ।

সাংবিধানিক সুরক্ষা ও বিধি:

- **ধারা ২৯(১):** যে কোনও নাগরিক গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব **ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি** সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করে।
- **ধারা ৩০:** সংখ্যালঘুদের নিজেদের পছন্দমতো **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা** করার অধিকার দেয়।
- **ধারা ৩৫০এ (350A):** প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়।
- **ধারা ৩৫০বি (350B):** ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় একজন **বিশেষ আধিকারিক** নিয়োগের সংস্থান রাখে।
- **অষ্টম তফশিল:** বর্তমানে ভারতের **২২টি দাপ্তরিক ভাষাকে** স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া সংবিধানের **সপ্তদশ পরিচ্ছেদে** সরকারি ভাষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে।

নীতিগত কাঠামো: সাংবিধানিক এই বিধানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০** এবং **জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF) ২০২২ ও ২০২৩**-এ শিশুর **গৃহভাষা বা মাতৃভাষাকে** প্রাথমিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মাতৃভাষায় মানসম্মত শিক্ষা

ধারণা ও শিক্ষাতাত্ত্বিক ভিত্তি

- **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTBMLE)** পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রাথমিক স্তরে শিশুর **প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা বা গৃহভাষা)**-কে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এবং সুশৃঙ্খলভাবে **অন্যান্য ভাষা** (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- **ইউনেস্কো** (UNESCO) এবং **জাতীয় শিক্ষানীতি** (NEP) ২০২০—উভয়ই এই নীতিতে একমত যে, **বুনিয়াদি শিক্ষা** তখনই সবচেয়ে কার্যকর হয় যখন শিশুকে তার **পুরো বোধগম্য** ভাষায় পড়ানো হয়। এটি শিক্ষার্থীর **ধারণাগত স্পষ্টতা**, পঠন-পাঠন এবং শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণকে আরও ফলপ্রসূ করে তোলে।

জ্ঞানীয় ও বিকাশগত সুবিধাসমূহ

- **শক্তিশালী বুনিয়াদি সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান:** মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরু হলে শিশুরা কোনও অপরিচিত ভাষার পাঠোদ্ধারের অতিরিক্ত মানসিক চাপ ছাড়াই সরাসরি **শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর** ওপর মনোযোগ দিতে পারে।
- **শিক্ষার্থীর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও স্কুলছুট রোধ:** গ্রামীণ ও আদিবাসী স্কুলগুলোর তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের **উপস্থিতি, আত্মবিশ্বাস ও পড়াশোনা শেষ করার হার** বৃদ্ধি করে; বিশেষ করে **প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী** ও মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
- **আজীবন শিক্ষা ও উচ্চতর দক্ষতা:** মাতৃভাষার মজবুত ভিত্তি পরবর্তী স্তরে **অন্যান্য ভাষা এবং জটিল বিষয়গুলোতে** সহজে মানিয়ে নিতে সহায়তা করে।

NEP ২০২০ এবং NCF-এ নীতির প্রতিফলন

- **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০** সুপারিশ করেছে যে, অন্তত **পঞ্চম শ্রেণি** এবং সম্ভব হলে **অষ্টম শ্রেণি** পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিশুর **গৃহভাষা বা স্থানীয় ভাষা** ব্যবহার করা উচিত।
- **জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF) ২০২২ ও ২০২৩**-এর মাধ্যমে এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে **বহুভাষিক শিক্ষণপদ্ধতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উপকরণ** এবং **শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্কারকে** পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ করা হয়েছে।

ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা: শিখন ও ভাষার অসঙ্গতি

- **ভাষার বাধা:** এনসিইআরটি (NCERT)-র তথ্যমতে, ভারতের প্রায় **৪৪% শিশু** স্কুলে এমন একটি ভাষায় কথা বলে যা শিক্ষার মাধ্যম (Medium of Instruction) থেকে আলাদা। এটি তাদের শেখার পথে তাৎক্ষণিক এক **ভাষাগত প্রাচীর** তৈরি করে।
- এই শিশুদের জন্য শিক্ষা একটি **দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ** হয়ে দাঁড়ায়: তাদের একই সাথে শিক্ষার মাধ্যমের **পাঠোদ্ধার** করতে হয় এবং **শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু** বুঝতে হয়। এর ফলে প্রায়ই তাদের **বুনিয়াদি দক্ষতা** দুর্বল থেকে যায়।
- **ক্রমবর্ধমান শিক্ষার ঘাটতি:** প্রাথমিক স্তরে সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞানের এই দুর্বলতা সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে, যা **প্রভাবশালী ভাষা** ও **সংখ্যালঘু ভাষা**ভাষী শিশুদের মধ্যে এক বিশাল বৈষম্য তৈরি করে।
- **আত্মবিশ্বাসের অভাব ও স্কুলছুটের ঝুঁকি:** যারা ক্লাসের পড়া বুঝতে লড়াই করে, তারা ক্রমশ নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করে এবং পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে **আদিবাসী, গ্রামীণ এবং আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া** সম্প্রদায়ের মধ্যে এর ফলে স্কুলছুটের প্রবণতা বেড়ে যায়।
- **সামাজিক স্তরবিন্যাস আরও প্রকট হওয়া:** স্কুলে যখন কেবল প্রভাবশালী ভাষাগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখন তা **ভাষাগত সংখ্যালঘুদের** কোণঠাসা করে এবং বিদ্যমান সামাজিক ও শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

এখানে অনুচ্ছেদটির একটি সাবলীল, নির্ভুল এবং যথাযথ পরিভাষা সমৃদ্ধ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

'ভাষা'র গুরুত্ব

- **শিক্ষাগত সাম্য ও অন্তর্ভুক্তি: মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা** (MTBMLE) পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি **প্রধান কৌশল** হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে **তফসিলি জাতি (Dalit), আদিবাসী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো** ভাষার অমিলের কারণে পিছিয়ে পড়বে না।
  - শিশুর **গৃহভাষাকে** শিক্ষার একটি বৈধ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে স্কুলগুলো কেবল পাঠদানের কেন্দ্র নয়, বরং শিক্ষার্থীর **সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের** স্থানে পরিণত হয়।
- **ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** যখন একটি ভাষা হারিয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে যুক্ত একটি **স্বতন্ত্র বিশ্বদর্শন, মৌখিক ঐতিহ্য এবং আদিম জ্ঞানভাণ্ডারও** বিলুপ্ত হয়।
  - **ইউনেস্কো** একে মানবতার **সঞ্চিত জ্ঞানের অপূরণীয় ক্ষতি** হিসেবে বর্ণনা করেছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি বিপন্ন ও সংখ্যালঘু ভাষাগুলোকে **নথিভুক্ত, পুনরুজ্জীবিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে** সাহায্য করে, যা ভারতের **অস্পৃশ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য** রক্ষায় সহায়ক।
- **সামাজিক সংহতি ও জাতীয় পরিচয়:** কেবল হিন্দি বা ইংরেজি নয়, বরং **সব ভাষাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া** একটি বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের **'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'**-কে সুসংহত করে এবং **সামাজিক বন্ধন** দৃঢ় করে।
  - এটি সংবিধানের **অষ্টম তফশিল** এবং ভাষা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানে প্রতিফলিত **ভাষাগত বহুত্ববাদের** প্রতি ভারতের অঙ্গীকারকেও সমর্থন করে।

প্রাথমিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা: আশাব্যঞ্জক কিছু দৃষ্টান্ত

- **ওড়িশার বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম:** ওড়িশা দীর্ঘ সময় ধরে একটি MTBMLE **কর্মসূচি** পরিচালনা করছে, যা ১৭টি জেলার **২১টি আদিবাসী ভাষাকে** অন্তর্ভুক্ত করেছে। দ্বিভাষিক শিক্ষা উপকরণ এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে প্রায় **৯০,০০০ আদিবাসী শিশু** এই ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে।
  - মূল্যায়ন অনুযায়ী, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে **পঠন-পাঠনের বোধগম্যতা, শ্রেণিকক্ষে সক্রিয়তা এবং স্কুলে টিকে থাকার হার** উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **তেলেঙ্গানা ও ডিজিটাল বহুভাষিক সম্পদ:** তেলেঙ্গানায় **দীক্ষা** (DIKSHA) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ভাষা সহ বিভিন্ন **স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা উপকরণ** ব্যবহার করতে পারছেন।
  - এটি প্রমাণ করে যে, সীমিত সম্পদের মধ্যেও **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (DPI) কীভাবে বহুভাষিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারে।

- **জাতীয় ডিজিটাল ও ভাষা-প্রযুক্তি উদ্যোগ:** **পিএম ই-বিদ্যা (PM eVIDYA)** এবং **আদি বাণী (Adi Vaani)** বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য **বহুভাষিক অডিও-ভিজ্যুয়াল এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট** সরবরাহ করছে।
    - **ভাষিণী (BHASHINI)** এবং **AI4Bharat**-এর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত প্রযুক্তিগুলো **কণ্ঠস্বর থেকে কণ্ঠস্বর অনুবাদ** এবং **টেক্সট-টু-স্পিচ টুলের** মাধ্যমে ভারতীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করছে। এই প্রযুক্তিগুলো বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ এবং স্থানীয় ভাষায় কন্টেন্ট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বহুভাষিক মডেল বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ

একটি বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে বেশ কিছু কাঠামোগত এবং সামাজিক বাধা রয়েছে:

কাঠামোগত বাধা:

- **নীতিগত সীমাবদ্ধতা:** অনেক রাজ্যে এখনও সুনির্দিষ্ট **মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTB-MLE)** কাঠামোর অভাব রয়েছে, যার ফলে এর বাস্তবায়ন বিচ্ছিন্নভাবে ঘটছে।
- **শিক্ষক সংকট:** আদিবাসী ভাষায় দক্ষ এবং বহুভাষিক শিক্ষণপদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের চরম ঘাটতি রয়েছে।
- **শিক্ষা উপকরণের গুণমান:** সংখ্যালঘু ভাষাগুলোতে পাঠ্যপুস্তক এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব রয়েছে, অথবা সেগুলোর শিক্ষাগত মান সন্তোষজনক নয়।

আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ:

- **অভিভাবকদের পছন্দ:** অনেক অভিভাবকই **ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে** সামাজিক উন্নতির একমাত্র পথ হিসেবে দেখেন, যা মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি এক ধরণের অনীহা তৈরি করে।
- **ভাষাগত আধিপত্য:** হিন্দি বা ইংরেজির আধিপত্য আঞ্চলিক এবং আদিবাসী উপভাষাগুলোকে অবহেলিত করে রাখছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা:

- **অর্থায়ন:** এই ধরণের উদ্যোগগুলো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বদলে প্রায়ই স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে চলে।
- **ডিজিটাল বিভাজন:** ইন্টারনেট সংযোগের অসমতা দূরবর্তী এলাকাগুলোতে ডিজিটাল বহুভাষিক শিক্ষা পৌঁছানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: নীতি ও বাস্তবায়ন

ইউনেস্কো প্রতিবেদন এবং এনইপি (NEP) ২০২০-এর লক্ষ্যপূরণে একটি বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:

- **জাতীয় MTB-MLE মিশন:** কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রচেষ্টায় সমন্বয় আনতে এবং সফল পাইলট প্রকল্পগুলোকে পদ্ধতিগত সংস্কারে রূপ দিতে একটি জাতীয় মিশন গঠন করা প্রয়োজন।
- **স্থানীয়করণ নীতি:** রাজ্যগুলোকে তাদের নিজস্ব ভাষাগত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে নীতি তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

- **নিয়োগে অগ্রাধিকার:** স্থানীয় উপভাষায় সাবলীল শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে এবং **B.Ed.** ও **D.El.Ed.** পাঠ্যক্রমে MTB-MLE নীতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** শিক্ষকদের বহুভাষিক ডিজিটাল সরঞ্জাম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারে নিরন্তর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম ও সম্প্রদায়:

- **বহুভাষিক উপকরণ:** সংখ্যালঘু ভাষা সহ সব স্তরের জন্য উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক ও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে।

- **আদিম জ্ঞানভাণ্ডার:** শিক্ষার শেকড় সংস্কৃতির গভীরে পৌঁছে দিতে স্থানীয় বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান এবং মৌখিক ইতিহাসকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অভিভাবকদের অংশগ্রহণ:** পাঠ্যক্রমের নকশা ও উপকরণ তৈরিতে অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের যুক্ত করতে হবে।

প্রযুক্তিগত ও আর্থিক অঙ্গীকার:

- **ডিজিটাল সরঞ্জামের বিস্তার:** DIKSHA, PM eVIDYA, BHASHINI এবং AI4Bharat-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।
- **টেকসই অর্থায়ন:** শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও নিবেদিত তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের এই **'ভাষাগত মুহূর্ত'** শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সুযোগ এনে দিয়েছে। ভাষাগত বৈচিত্র্য কোনও বোঝা নয়, বরং এটি **সাম্য, অন্তর্ভুক্তি এবং উদ্ভাবনের** একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন—যদি শিশুরা তাদের বোধগম্য ও আপন ভাষায় শিখতে পারে। এই পরিবর্তন কেবল একটি শিক্ষণতাত্ত্বিক পছন্দ নয়, বরং SDG 4 (মানসম্মত শিক্ষা) অর্জনের এক অপরিহার্য শর্ত, যা শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলবে।

প্রশ্ন: *ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য কীভাবে একই সাথে একটি চ্যালেঞ্জ এবং সামাজিক সংহতির (social cohesion) চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে? বহুভাষিক শিক্ষা সংস্কারের প্রেক্ষাপটে আপনার উত্তরটি ব্যাখ্যা করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ স্টাডিজ ২

2.1. রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা

2.1.1. রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকা: একটি পুনর্মূল্যায়ন

প্রেক্ষাপট

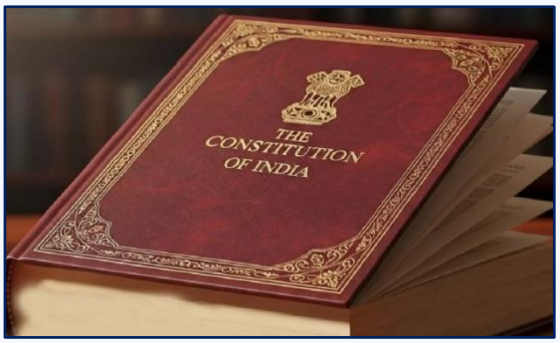

- সম্প্রতি তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং কেরালার মতো রাজ্যগুলিতে **রাজ্যপালদের** প্রথাগত ভাষণের বয়ান থেকে সরে আসা বা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট (Walkout) করার ঘটনাগুলি ভারতীয় সংবিধানের **১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদের** প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।
- এই সংঘাতের বিষয়গুলি রাজ্যের **সাংবিধানিক প্রধান** (রাজ্যপাল) এবং **নির্বাচিত শাসনবিভাগের** (মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা) মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকে সামনে নিয়ে আসছে। এটি একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে: এই আনুষ্ঠানিক প্রথাটি কি ধারাবাহিকতার প্রতীক থেকে রাজনৈতিক বাধার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে?

রাজ্যপালের পদের জন্য সাংবিধানিক বিধানসমূহ

ভারতের সংবিধান রাজ্যপালকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হিসেবে স্থাপন করেছে, যেখানে তিনি রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রধান এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি—উভয় হিসেবেই কাজ করেন।

- **অনুচ্ছেদ ১৬৩ (সাহায্য ও পরামর্শ):** এটি নির্দেশ দেয় যে রাজ্যপালকে অবশ্যই মন্ত্রিসভার **সাহায্য ও পরামর্শ** অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যেহেতু রাজ্যপালের ভাষণটি সরকারের একটি নির্বাহী নীতিগত দলিল, তাই মন্ত্রিসভার তৈরি করা ভাষণের বয়ান সংশোধন, বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করার কোনো **স্বাধীন ক্ষমতা** রাজ্যপালের নেই।
- **অনুচ্ছেদ ১৬৮ (সাংবিধানিক সংহতি):** রাজ্যপালকে রাজ্য আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো রাজ্যপালকে ছাড়া আইনসভা অসম্পূর্ণ; তাই বিধানসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে তাঁর অংশগ্রহণ কেবল পছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি একটি **কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা**।
- **অনুচ্ছেদ ১৭৫ (ভাষণ দেওয়া এবং বার্তা পাঠানোর অধিকার):** এটি রাজ্যপালকে আইনসভায় ভাষণ দেওয়ার বা কোনো বিচারাধীন বিল সম্পর্কে বার্তা পাঠানোর ক্ষমতা দেয়। এটি রাষ্ট্রপ্রধান এবং আইন প্রণেতাদের মধ্যে যোগাযোগের একটি মাধ্যম, যা জরুরি বিষয়গুলিতে আইনসভার মনোযোগ নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- **অনুচ্ছেদ ১৭৬ (বাধ্যতামূলক ভাষণ):** এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের পর বিধানসভার **প্রথম অধিবেশন** এবং প্রতি বছরের **প্রথম অধিবেশনের সূচনায়** ভাষণ দেওয়া রাজ্যপালের জন্য একটি **সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা**। এই ভাষণটি মূলত নির্বাচিত সরকারের একটি **নীতিগত দলিল** যার মাধ্যমে সরকার তাদের আগামী দিনের আইনি রূপরেখা, শাসনতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকারগুলো আইনসভার সামনে উপস্থাপন করে।

বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা: রাজ্যপালের ক্ষমতার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

বিচার বিভাগ বিভিন্ন সময়ে **'রাষ্ট্রপতির সন্তোষ'** এবং রাজ্যপালের **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার** সীমা নির্ধারণ করতে হস্তক্ষেপ করেছে, যাতে এই পদটি তার সাংবিধানিক এক্তিয়ার লঙ্ঘন না করে।

- **নবাম রেবিয়া মামলা (২০১৬):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, রাজ্যপাল কোনো **সমান্তরাল ক্ষমতা কেন্দ্র** নন। বিধানসভা অধিবেশন আহ্বান করা (Summon), স্থগিত রাখা বা ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যপালের নিজস্ব ইচ্ছাধীন নয়; এই ক্ষমতাগুলো অবশ্যই মন্ত্রিসভার **সাহায্য ও পরামর্শ** অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

- **শিবরাজ সিং চৌহান মামলা (২০২০):** সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, একটি সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একমাত্র সাংবিধানিক উপায় হলো **ফ্লোর টেস্ট** (Floor Test)। ক্ষমতাসীন দলের স্থায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ব্যক্তিগত বা বিষয়ভিত্তিক হস্তক্ষেপের ক্ষমতাকে আদালত সীমিত করে দিয়েছে।
- **তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম তামিলনাড়ু রাজ্যপাল (২০২৩):** আদালত জোর দিয়ে বলেছে যে, রাজ্যপালরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো বিলে **সম্মতি** আটকে রাখতে পারেন না। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যদি বিধানসভা কোনো বিল পুনরায় পাস করে পাঠায়, তবে রাজ্যপাল তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য। এটি **নির্বাচিত আইনসভার শ্রেষ্ঠত্বকে** আরও শক্তিশালী করেছে।
- **২০২৫ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স (অনুচ্ছেদ ১৪৩):** সুপ্রিম কোর্ট যদিও বলেছে যে 'স্বয়ংক্রিয় সম্মতি' (Deemed Assent)-এর মাধ্যমে কোনো কঠোর সময়সীমা চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তবে এটি স্পষ্ট করেছে যে, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়া বিলে দেরি করা **সীমিত বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার** আওতাভুক্ত। কারণ, এই ধরনের বিলম্ব **গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে** ব্যাহত করে।

রাজ্যপালের ভাষণ কি ঔপনিবেশিক আমলের অবশেষ?

১. **ভাষণ বজায় রাখার পক্ষে যুক্তি:**

- রাজ্যপালের ভাষণ প্রতীকীভাবে আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাঁর সাংবিধানিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং ভারতের **সংসদীয় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাকে** প্রতিফলিত করে।
- এটি নির্বাচিত সরকারের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং আনুষ্ঠানিক মঞ্চ তৈরি করে দেয়, যার মাধ্যমে তারা আইনসভার সদস্য এবং সাধারণ জনগণের সামনে তাদের **আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও নীতিগত অগ্রাধিকারগুলো** তুলে ধরতে পারে।

২. **পুনর্বিবেচনার পক্ষে যুক্তি:**

- বছরের অন্যান্য অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই আইনসভা কার্যকরভাবে কাজ করে। এটি নির্দেশ করে যে, প্রশাসনিক কাজগুলো কাঠামোগতভাবে এই অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল নয়।
- বর্তমান সময়ে এর ক্রমবর্ধমান **রাজনীতিকরণের** কারণে সমালোচকরা মনে করেন যে এই প্রথাটি তার উপযোগিতা হারিয়েছে। এটি এখন গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা বাড়ানোর চেয়ে **সাংবিধানিক সংঘাত** তৈরিতে বেশি ভূমিকা রাখছে।

রাজ্যপালের পদ ঘিরে প্রধান বিতর্কসমূহ

রাজ্যপালের পদটি বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। এর মূল বিবাদগুলো হলো:

- **ভাষণ নিয়ে রাজনীতি:** রাজ্যপাল যখন ভাষণের নির্দিষ্ট অংশ বাদ দেন, তখন **'সাংবিধানিক শূন্যতা'** (Constitutional Vacuum) তৈরি হয়। এর ফলে পরবর্তী **'ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব'** (Motion of Thanks) ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং আইনসভার কাজ বাধাগ্রস্ত হয়।
- **আচার্যের ভূমিকা ও উপাচার্য নিয়োগ:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যখন রাজ্য সরকারের সুপারিশ উপেক্ষা করেন, তখন সংঘাত তৈরি হয়। ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে, এই ভূমিকা ব্যক্তিগত পছন্দের বদলে **'প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের'** পক্ষে হওয়া উচিত।
- **বিলে সম্মতিতে বিলম্ব:** কোনো জোরালো কারণ ছাড়াই বিল আটকে রেখে বা রাষ্ট্রপতির জন্য পাঠিয়ে রাজ্যপালরা কার্যত **'ভেটো'** প্রয়োগ করেন। এটি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি করে।
- **কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে ভাবমূর্তি:** রাজ্যপালরা **'রাষ্ট্রপতির সন্তোষ'** অনুযায়ী কাজ করায় তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরশীলতা তাঁদের নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে কাজ করতে বাধা দেয়।
- **আইনসভা ও শাসনে হস্তক্ষেপ:** মন্ত্রিসভার পরামর্শ উপেক্ষা করে অধিবেশন ডাকতে দেরি করা, প্রথা ভেঙে হুটহাট **'ফ্লোর টেস্ট'**-এর নির্দেশ দেওয়া বা সরকার গঠনে পক্ষপাতিত্ব করার মতো ঘটনাগুলো **'গণতান্ত্রিক বৈধতাকে'** খর্ব করছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সাংবিধানিক শাসনের ওপর প্রভাব

রাজ্যপালের পদ ঘিরে এই সংঘাত ভারতের **যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য** নষ্ট করছে এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্কের বদলে প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থা তৈরি করছে।

- **সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অবক্ষয়:** রাজ্যপালের পদটি যখন রাজ্যের নীতিতে বাধা দিতে ব্যবহৃত হয়, তখন **'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো'** দুর্বল হয়ে পড়ে। এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে গভীর অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।
- **যৌথ দায়বদ্ধতা লঙ্ঘন:** মন্ত্রিসভার তৈরি করা ভাষণ পড়তে অস্বীকার করা অনুচ্ছেদ ১৬৩-এর অধীনে **'যৌথ দায়বদ্ধতাকে'** সরাসরি আঘাত করে। এর ফলে নির্বাচিত সরকারের গুরুত্ব কমে যায় এবং একটি অনির্বাচিত **'সমান্তরাল ক্ষমতা কেন্দ্র'** তৈরি হয়।
- **প্রশাসনিক স্থবিরতা:** অনুচ্ছেদ ২০০-তে নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকায় রাজ্যপালরা **'পকেট ভেটো'** ব্যবহার করে বিল আটকে রাখেন। এতে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো থমকে যায় এবং **'সাংবিধানিক সৌজন্য'** নষ্ট হয়।
- **পরোক্ষ কেন্দ্রীকরণ:** রাজ্যপাল যখন কেন্দ্রের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেন, তখন তা পরোক্ষভাবে রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে এবং **'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন'** ধারণাটিকে দুর্বল করে দেয়।
- **বিরোধের বিচারিকরণ:** প্রশাসনিক স্তরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় রাজ্যগুলো বারবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের এই **'বিচারিকরণ'** বিচার বিভাগের ওপর চাপ বাড়ায় এবং **'সাংবিধানিক নৈতিকতার'** ব্যর্থতা প্রমাণ করে।

সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ

রাজ্যপাল পদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো** নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কমিশন নিম্নোক্ত সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে:

কমিশন	প্রধান সুপারিশসমূহ
সরকারিয়া কমিশন (১৯৮৮)	রাজ্যপালকে অবশ্যই রাজ্যের বাইরের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে হবে এবং তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। ৩৫৬ নম্বর অনুচ্ছেদ কেবল "শেষ উপায়" হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।
ভেঙ্কটচলিয়া কমিশন (২০০২)	রাজ্যপালের জন্য পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ নিশ্চিত করা এবং তাঁকে অপসরণের আগে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
পুঞ্ছি কমিশন (২০১০)	'রাষ্ট্রপতির সন্তোষ' (Pleasure Doctrine) বিষয়টি বাদ দেওয়া এবং রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক অভিশংসনের (Impeachment) ব্যবস্থা রাখা। প্রশাসনিক সংঘাত এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালের ভূমিকা সীমিত করা।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: রাজ্যপালের পদে সাংবিধানিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার

রাজ্যপালের ভাষণ এবং অন্যান্য কার্যাবলীকে গঠনমূলক করতে কিছু কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য:

- **স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিধিবদ্ধকরণ:** রাজ্যপাল কোন পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন, তা কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা উচিত। এটি ১৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যা রোধ করবে এবং সাংবিধানিক আচরণে স্বচ্ছতা আনবে।
- **নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধান বিচারপতি, লোকসভার স্পিকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একটি **' কলেজিয়াম'** ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যপাল নিয়োগ করা উচিত। এটি রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।
- **সাংবিধানিক কর্তব্যে সময়সীমা নির্ধারণ:** বিলের অনুমোদন এবং ১৭৬ ও ২০০ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে বাধ্যতামূলক কাজগুলোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা প্রয়োজন। এটি 'পকেট ভেটো'র অপব্যবহার এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা রোধ করবে।

- **সাংবিধানিক শিষ্টাচার বজায় রাখা:** রাজ্যপালের কোনো আপত্তি থাকলে তা গোপন ও আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক মাধ্যমে জানানো উচিত। জনসমক্ষে মন্ত্রিসভা অনুমোদিত ভাষণ থেকে সরে আসা এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে **যৌথ দায়বদ্ধতা** ও সাংবিধানিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
- **ফ্লোর টেস্টের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা:** ২০২০ সালের শিবরাজ সিং চৌহান মামলার রায় অনুযায়ী, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের একমাত্র পথ হবে **ফ্লোর টেস্ট**। এতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে।
- **দলীয় ভূমিকা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের মতো অ-নির্বাহী কাজগুলো থেকে রাজ্যপালকে দূরে রাখা উচিত। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংঘাত কমবে এবং তিনি একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

উপসংহার

রাজ্যপালের ভূমিকাকে কেন্দ্রের নজরদারির হাতিয়ার থেকে সরিয়ে একটি নিরপেক্ষ **সাংবিধানিক প্রহরী** হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বিধিবদ্ধকরণ এবং কোলজিয়াম ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। তবেই ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা সুরক্ষিত থাকবে।

প্রশ্ন: *সংবিধানের ১৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের ভাষণের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পরীক্ষা করুন এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.2. ১৬ তম অর্থ কমিশন

প্রেক্ষিত

১৬তম অর্থ কমিশন (FC) **১৭ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে রাষ্ট্রপতির কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এটি **২০২৬-৩১** সময়কালের জন্য ভারতের **আর্থিক ফেডারেলিজম বা আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর** ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

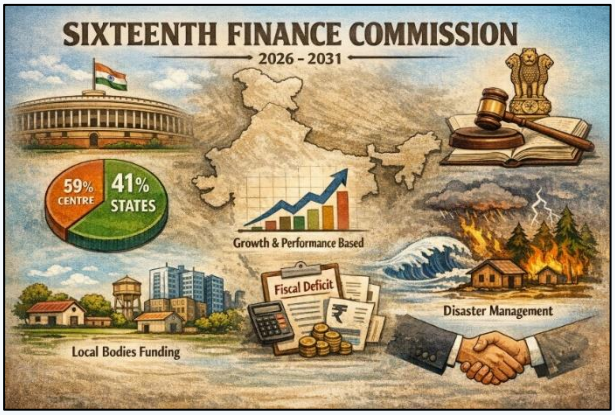

অর্থ কমিশন (FC) সম্পর্কে কিছু তথ্য

অর্থ কমিশন হলো একটি **সাংবিধানিক সংস্থা**, যা ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে আর্থিক ভারসাম্যের চাকা হিসেবে কাজ করে।

- **ধারা ২৮০:** সংবিধানের ২৮০ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছর অন্তর একটি অর্থ কমিশন গঠন করেন।
- **গঠন: চেয়ারম্যান:** ড. অরবিন্দ পানাগাড়িয়া।
  - **পূর্ণকালীন সদস্য:** শ্রী অজয় নারায়ণ ঝা, শ্রীমতী অ্যানি জর্জ ম্যাথিউ এবং ড. মনোজ পান্ডা।
  - **অস্থায়ী সদস্য:** ড. সৌম্য কান্তি ঘোষ।
- **প্রধান কাজসমূহ:**
  - **উল্লম্ব রাজস্ব বণ্টন (Vertical Devolution):** কেন্দ্রের সংগৃহীত করের অংশ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করা।
  - **অনুভূমিক বিভাজন (Horizontal Devolution):** রাজ্যগুলোর নিজেদের মধ্যে ওই করের অংশ বরাদ্দ করা।
  - **সহায়ক অনুদান (Grants-in-aid):** ভারতের সঞ্চিত তহবিল (ধারা ২৭৫) থেকে রাজ্যগুলোকে অনুদান দেওয়ার নীতি নির্ধারণ।
  - **স্থানীয় সংস্থা:** পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলোর জন্য রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

১৬তম অর্থ কমিশনের মূল সুপারিশসমূহ (২০২৬-৩১)

১. উল্লম্ব রাজস্ব বণ্টন (কেন্দ্র থেকে রাজ্য)

দক্ষিণের রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে করের অংশ ৪৫-৫০% করার জোরালো দাবি থাকা সত্ত্বেও, ১৬তম অর্থ কমিশন বর্তমানে যা আছে তা-ই **বজায় রেখেছে**।

- **৪১% অংশ বহাল:** কেন্দ্রীয় করের নিট আয়ের মধ্যে রাজ্যগুলোর অংশ **৪১%** রাখা হয়েছে।
- **'সেস' (Cess) নিয়ে উদ্বেগ:** কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, কেন্দ্রের **সেস এবং সারচার্জের** ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে রাজ্যগুলোর প্রাপ্য করের ভাণ্ডার ছোট হয়ে যাচ্ছে (কারণ সেস রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না)।

২. অনুভূমিক বিভাজন (রাজ্যগুলোর মধ্যে বরাদ্দ)

রাজ্যগুলোর মধ্যে ৪১% অর্থ ভাগ করার সূত্রটি অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে।

মাপকাঠি (Criterion)	ওজন (Weight %)	গুরুত্ব (Significance)
আয়ের দূরত্ব (Income Distance)	৪২.৫%	কম আয়ের রাজ্যগুলোর জন্য সমতা নিশ্চিত করা।
জনসংখ্যা (২০১১)	১৭.৫%	পরিষেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন।
জনসংখ্যাগত কর্মদক্ষতা	১০.০%	১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ করা।
আয়তন	১০.০%	ভৌগোলিকভাবে বড় বা দুর্গম রাজ্যে পরিষেবা দেওয়ার খরচ বিবেচনা করা।
বন ও পরিবেশ	১০.০%	পরিবেশ রক্ষার জন্য এখন **"মুক্ত বন"** (Open Forests) এলাকাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জিডিপিতে অবদান	**১০.০%**	**নতুন মাপকাঠি।** এটি "কর প্রচেষ্টা" মাপকাঠির পরিবর্তে আনা হয়েছে। যে রাজ্যগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে, তাদের পুরস্কৃত করা।

দ্রষ্টব্য: ১৫তম অর্থ কমিশনের "কর ও আর্থিক প্রচেষ্টা" মাপকাঠিটি এখন **জিডিপিতে অবদান** মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. সহায়ক অনুদান (মোট ৯.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা)

১৬তম অর্থ কমিশনের একটি বড় পরিবর্তন হলো **রাজস্ব ঘাটতি অনুদান** (Revenue Deficit Grants), নির্দিষ্ট ক্ষেত্র-ভিত্তিক অনুদান এবং নির্দিষ্ট রাজ্য-ভিত্তিক অনুদানগুলো **বন্ধ করে দেওয়া** হয়েছে। এখন অর্থ মূলত দুটি স্তম্ভে দেওয়া হবে:

ক. স্থানীয় সংস্থার অনুদান (৭.৯১ লক্ষ কোটি টাকা)

- **গ্রাম ও শহরের অনুপাত:** গ্রামীণ (RLB) এবং শহর এলাকার (ULB) স্থানীয় সংস্থার জন্য **৬০:৪০ অনুপাতে** বরাদ্দ করা হয়েছে।
- **কর্মদক্ষতা ভিত্তিক:** ৮০% অর্থ দেওয়া হবে **মৌলিক অনুদান** হিসেবে এবং ২০% দেওয়া হবে **কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে**।
- **শর্তাবলী:** অনুদান তখনই দেওয়া হবে যদি রাজ্যগুলো:
  - সময়মতো **রাজ্য অর্থ কমিশন** (SFC) গঠন করে।
  - স্থানীয় সংস্থাগুলোর নিরীক্ষিত হিসাব (audited accounts) জনসমক্ষে প্রকাশ করে।
- **নগরায়ণ প্রিমিয়াম:** যেসব রাজ্য শহর সংলগ্ন গ্রামগুলোকে সফলভাবে বড় শহরের সাথে যুক্ত করবে, তাদের জন্য **১০,০০০ কোটি টাকার** এককালীন অনুদান দেওয়া হবে।

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (২.০৪ লক্ষ কোটি টাকা)

- **SDRF এবং SDMF:** অর্থ বরাদ্দকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সাড়া প্রদান (SDRF) এবং প্রশমন (SDMF), যাতে দুর্যোগ প্রতিরোধের ওপর বেশি জোর দেওয়া যায়।
- **ব্যয় ভাগাভাগি:** সাধারণ রাজ্যগুলোর জন্য **৭৫:২৫** এবং উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলোর জন্য **৯০:১০** অনুপাত বজায় রাখা হয়েছে।

৪. আর্থিক রোডম্যাপ এবং সংস্কার

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বোঝা কমাতে কমিশন কঠোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

- **আর্থিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা:** * **কেন্দ্র:** ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে আর্থিক ঘাটতি জিডিপির **৩.৫%-এ** নামিয়ে আনা।
  - **রাজ্য:** রাজ্যের জিএসডিপি-র (GSDP) **৩%-এর** মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- **অফ-বাজেট ঋণ:** বাজেটের বাইরে ঋণ নেওয়ার ওপর **সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা** সুপারিশ করা হয়েছে; সমস্ত দায়বদ্ধতা স্বচ্ছভাবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **বিদ্যুৎ খাত:** বিদ্যুৎ বণ্টনকারী সংস্থাগুলোর (DISCOMs) বিপুল ঋণ কমাতে রাজ্যগুলোকে সেগুলো **বেসরকারিকরণের** দিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- **ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ:** রাজ্যগুলোকে "শর্তহীন নগদ সহায়তা" পুনর্বিবেচনা করতে এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে কঠোর বর্জনীয় নীতি (exclusion criteria) কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৫. সরকারি উদ্যোগ (PSE) সংস্কার

- **প্রস্থান নীতি:** ৩০৮টি অকেজো রাজ্য পিএসই (PSE) **বন্ধ করার** সুপারিশ করা হয়েছে।
- **কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা:** যেসব রাজ্য পিএসই টানা ৪ বছরের মধ্যে ৩ বছর লোকসান করছে, সেগুলো বেসরকারিকরণ বা বন্ধের বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৬তম অর্থ কমিশনের তাৎপর্য

- **উৎপাদনশীলতার পুরস্কার:** স্রেফ সাহায্যের পরিবর্তে অর্থনৈতিক দক্ষতা এবং জাতীয় বৃদ্ধিতে অবদানকে গুরুত্ব দিতে **"জিডিপিতে অবদান"** (১০% ওজন) যুক্ত করা হয়েছে।
- **কঠোর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ:** বাজেটের বাইরের ঋণ নিষিদ্ধ করা এবং রাজস্ব ঘাটতি অনুদান বন্ধ করার ফলে রাজ্যগুলো নিজস্বভাবে স্বনির্ভর হতে বাধ্য হবে।
- **তৃতীয় স্তরের স্বায়ত্তশাসন:** ২০% অনুদান কর্মদক্ষতা এবং **জিআইএস (GIS) ভিত্তিক কর সংস্কারের** সাথে যুক্ত করার ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলো অনুদান-নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব আয় বাড়াতে সক্ষম হবে।
- **ভারসাম্যপূর্ণ ফেডারেলিজম:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং **মুক্ত বনভূমি** রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে পরিবেশবান্ধব এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে না।
- **২০৪৭-এর ভিকশিত ভারত:** ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে কেন্দ্রের ঘাটতি ৩.৫%-এ নামানোর লক্ষ্যমাত্রা ভারতকে একটি উচ্চ-আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্থিতিশীলতা দেবে।

১৬তম অর্থ কমিশন নিয়ে উদ্বেগসমূহ

১. 'সেস এবং সারচার্জ' সমস্যা

- সেস এবং সারচার্জ রাজ্যগুলোর সাথে ভাগ করা হয় না। কেন্দ্রের মোট কর আয়ে এদের অংশ ২০১৩ সালের ৫% থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে **১১-১২%** হয়েছে। এর ফলে রাজ্যগুলো কাগজে-কলমে ৪১% প্রাপ্য হলেও বাস্তবে প্রায় **৩১-৩২%** অর্থ পায়।

২. রাজস্ব ঘাটতি অনুদান (RDG) বন্ধ করা

- হিমাচল প্রদেশ বা উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি রাজ্যগুলো মনে করে যে, তাদের ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে রাজস্ব ঘাটতি এড়ানো অসম্ভব। এই "নিরাপত্তা কবচ" সরিয়ে নেওয়ায় তাদের আর্থিক সংকটে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

৩. **দক্ষতা বনাম সমতা (দক্ষিণ বনাম উত্তর বিতর্ক)**

- জিডিপিতে অবদান যুক্ত করায় এবং "আয়ের দূরত্ব"-এর গুরুত্ব কমানোয় ধনী রাজ্যগুলো লাভবান হতে পারে। কিন্তু বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলোর প্রাপ্য অংশে টান পড়তে পারে। আবার দক্ষিণের রাজ্যগুলো মনে করে, ২০১১ সালের জনসংখ্যা ব্যবহার করায় তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাফল্যকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

৪. **রাজ্যের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন হ্রাস**

- স্থানীয় সংস্থাগুলোর অনুদানের বড় অংশ নির্দিষ্ট কাজের (যেমন স্যানিটেশন বা জল) জন্য "আবদ্ধ" (tied) রাখা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ সংস্থা বেসরকারিকরণের মতো শর্তগুলোকে রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আর্থিক ফেডারেলিজম শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

1. **সেস এবং সারচার্জ সীমিত করা:** একটি সাংবিধানিক সংশোধনী বা আইনি সীমার (যেমন মোট করের ১০%) মাধ্যমে সেস ও সারচার্জের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার।
2. **রাজ্যের রাজস্ব স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি:** জিএসটি কাঠামোর মধ্যে রাজ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে সামান্য কর পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া উচিত।
3. **তৃতীয় স্তরের শক্তিশালীকরণ:** রাজ্য অর্থ কমিশন (SFC) সময়মতো গঠন করা এবং সরাসরি স্থানীয় সংস্থার অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো নিশ্চিত করা।
4. **ব্যয় যৌক্তিকীকরণ:** কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসর করা স্কিমগুলোকে (CSS) রাজ্যগুলোর চাহিদা অনুযায়ী সাজানোর স্বাধীনতা দেওয়া।
5. **প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন:** সংবিধানের **২৬৩ ধারা** অনুযায়ী আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলকে (ISC) সক্রিয় করা, যা আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার

১৬তম অর্থ কমিশন ভারতকে "অধিকার-ভিত্তিক" সহায়তা থেকে **"কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক"** ফেডারেলিজমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। **জিডিপি অবদান** এবং **আর্থিক স্বচ্ছতাকে** অগ্রাধিকার দিয়ে এটি একটি **"বিকশিত ভারত"**এর ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছে, যা আঞ্চলিক সমতা এবং ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে।

***প্রশ্ন:** ভারতের ১৪তম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলো রাজ্যগুলোকে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে কীভাবে সাহায্য করেছে? (১৫০ শব্দ)*

2.1.3. সংবিধান যখন পবিত্র আঙিনায়: ভারতে ধর্মীয় বিবাদের বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি **মাদ্রাজ হাইকোর্ট** দুটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেছে। এর একটি হলো **তিরুপারঙ্কুনদ্রম দীপথুন (Thiruparankundram Deepathoon)** সংক্রান্ত বিতর্ক এবং অন্যটি কাঞ্চিপুরম বরদরাজ পেরুমল মন্দিরে **থেনকালাই (Thenkalai)** সম্প্রদায়ের স্তোত্র পাঠের অধিকার বিষয়ক।
- এই রায়গুলি জটিল ধর্মীয় বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে **বিচারবিভাগের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার** ওপর আলোকপাত করে। এই বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে আদালত পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, মন্দিরগুলি কোনও একান্ত **'ব্যক্তিগত স্থান'** নয় যা **সাংবিধানিক নজরদারির** ঊর্ধ্বে থাকতে পারে।

- এই ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় আইনের ক্ষেত্রে এক **সন্ধিক্ষণকে** নির্দেশ করে, যেখানে ধর্মীয় আচার-আচরণকে সুশৃঙ্খলভাবে **সাংবিধানিক নীতিমালার** সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হচ্ছে।

মন্দির-সংক্রান্ত বিবাদ: দেওয়ানি অধিকার থেকে সাংবিধানিক অধিকারে বিবর্তন

ক) প্রাক-সাংবিধানিক যুগ: দেওয়ানি বিবাদ হিসেবে মন্দিরে প্রবেশ

- **দেওয়ানি মামলা কাঠামো:** স্বাধীনতার আগে মন্দিরে প্রবেশ বা উপাসনা সংক্রান্ত বিবাদগুলিকে কেবল ব্যক্তিগত **দেওয়ানি অধিকার** (Civil Rights) হিসেবে দেখা হতো।
- **কামুধি মন্দির প্রবেশ মামলা:** একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হলো রামানাথপুরমের কামুধি মন্দিরে নাডার সম্প্রদায়ের প্রবেশের অধিকারের লড়াই, যা শেষ পর্যন্ত লন্ডনের **প্রিভি কাউন্সিল** (Privy Council) পর্যন্ত গড়িয়েছিল।
- **শঙ্করলিঙ্গ নাডান বনাম রাজা রাজেশ্বর দোরাই (১৯০৮):** এই মামলায় প্রিভি কাউন্সিলকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে নাডার সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কি না। এটি প্রতিফলিত করে যে তৎকালীন সময়ে এই প্রশ্নগুলি মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে কেবল দেওয়ানি অধিকারের মানদণ্ডে বিচার করা হতো।

খ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আইনি হস্তক্ষেপ

- **নিয়ন্ত্রণমূলক মাইলফলক:** ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সরকার মন্দির ও তাদের এনডাওমেন্ট পরিচালনার জন্য **'মাদ্রাজ হিন্দু রিলিজিয়াস এনডাওমেন্টস অ্যাক্ট'** প্রণয়ন করে।
- **তদারকি ভূমিকা:** এই আইনের ফলে মন্দিরের তহবিলের অডিট এবং স্থানীয় মন্দির কমিটি গঠন সম্ভব হয়, যা মন্দির প্রশাসনে সরকারের **তদারকি ভূমিকার** (Supervisory Role) ভিত্তি স্থাপন করে।

গ) ১৯৫০ পরবর্তী সময়: মৌলিক অধিকারে রূপান্তর

- **সংবিধান গ্রহণ:** ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের মাধ্যমে **অনুচ্ছেদ ২৫ এবং ২৬** যুক্ত হয়, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উপাসনার স্বাধীনতা প্রদান করে।
- **জনস্বার্থে সীমাবদ্ধতা:** এই অধিকারগুলিকে জনশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতার অধীন রাখা হয়েছে, যা জনচেতনাকে আঘাত করে এমন ধর্মীয় আচারকে রাষ্ট্রের জন্য **নিয়ন্ত্রণ** করার পথ প্রশস্ত করে।
- **আইনতাত্ত্বিক রূপান্তর:** আদালতগুলি এখন দেওয়ানি অধিকারের গণ্ডি পেরিয়ে সাংবিধানিক নির্দেশিকা, **সাম্য** (Equality) এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে মন্দির প্রবেশ, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পুরোহিত নিয়োগে সমতার মতো আধুনিক আইনতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে।

ঘ) মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্ব গঠনে রাজ্যগুলির ভূমিকা

- **আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব:** সুশাসনের লক্ষ্যে অনেক রাজ্য **'হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এনডাওমেন্টস অ্যাক্ট'** প্রণয়ন করেছে।
- **বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা:** এই আইনগুলি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এর মাধ্যমে রিট আদালতগুলি (Writ Courts) খতিয়ে দেখে যে, সরকারি হস্তক্ষেপ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি অন্যদের **সাংবিধানিক অধিকার** সুনিশ্চিত করছে কিনা। এভাবেই গত ৭০ বছরে মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের সমৃদ্ধি ঘটেছে।

মূল ধারণা: অপরিহার্য ধর্মীয় আচার (ERP) পরীক্ষা

১. অপরিহার্য ধর্মীয় আচার (Essential Religious Practice) পরীক্ষার প্রকৃতি

- **অপরিহার্যতা তত্ত্ব (Doctrine of Essentiality):** ধর্মীয় বিবাদ সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের বিবর্তনে আদালতগুলি খতিয়ে দেখে যে, কোনও ধর্মীয় আচার সাংবিধানিক নীতির সাথে বিরোধিতা করছে কিনা। বিশেষ করে যেখানে মন্দিরে প্রবেশে বাধা বা এমন কোনও প্রথা থাকে যা মৌলিক অধিকার খর্ব করে, সেখানে সাংবিধানিক আদালতগুলি হস্তক্ষেপ করে।

- **ERP পরীক্ষা:** সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পরীক্ষাটি যাচাই করে যে, কোনও নির্দিষ্ট প্রথা বা আচার ধর্মের জন্য **অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য** কিনা। যদি তা অপরিহার্য না হয়, তবে সেই প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক আদর্শের অধীনে বিচার করা হয়।
- **ধর্মনিরপেক্ষ বনাম পবিত্র (Secular vs. Sacred):** যে আচারগুলো ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয়, সেগুলোকে **"ধর্মনিরপেক্ষ" (Secular)** হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিচারবিভাগীয় নির্দেশনার আওতায় আনা হয়। অন্যদিকে, "অপরিহার্য" আচারগুলো বেশি সুরক্ষা পায়, তবে তাও নিরঙ্কুশ (Absolute) নয়।

২. **সমালোচনা এবং এই পরীক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার**

- **বিচারবিভাগীয় সমালোচনা:** ERP পরীক্ষাটি অনেক সময় **অসংলগ্ন ব্যাখ্যার (Inconsistent Interpretation)** সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন বিচারপতির বেঞ্চ "অপরিহার্য" কী, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।
- **বস্তুনিষ্ঠতা:** সমালোচনা সত্ত্বেও, আদালতগুলো এই পরীক্ষাটি চালিয়ে যাচ্ছে কারণ এটি ধর্মের মূল তত্ত্বে মনোনিবেশ করে বিচারে এক ধরণের **বস্তুনিষ্ঠতা (Objectivity)** প্রদান করে।
- **শবরীমালা রায় এবং তত্ত্বের সংহতি:** ২০১৮ সালের **ইন্ডিয়ান ইয়াং লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কেরালা রাজ্য** (শবরীমালা মামলা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এক যুগান্তকারী রায় দেয়। আদালত জানায়, কোনও আচার অপরিহার্য হলেও যদি তা **সাংবিধানিক নৈতিকতার (Constitutional Morality)** পরিপন্থী হয়, তবে তাকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বাইরে রাখা যাবে না।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব:** এখন এটি দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সবসময় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে গঠিত **সাংবিধানিক নৈতিকতার** অধীন।

সাম্প্রতিক মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়

১. **তিরুপারঙ্কুনদ্রম দীপথুন রায়:** আদালত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত পাথরের স্তম্ভে কার্তিকাই দীপম জ্বালানোর অনুমতি দিয়েছে এবং এটিকে মন্দিরের আচারিক কাঠামোর অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। এটি প্রমাণ করে যে, ঐতিহ্য ও সাংবিধানিক আইনের সংযোগস্থলে আদালত ধর্মীয় আচারকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

২. **কাঞ্চিপুরম বরদরাজ পেরুমল মন্দির বিবাদ:** স্তোত্র পাঠ নিয়ে **থেনকালাই** এবং **ভাদাকালাই** সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিবাদ আদালত নিষ্পত্তি করেছে। ১৯১৫ এবং ১৯৬৯ সালের পুরনো আদেশ এবং ২০০ বছরের পুরনো প্রথার ওপর ভিত্তি করে আদালত থেনকালাই সম্প্রদায়ের **একচেটিয়া অধিকার (Exclusive Right)** বহাল রেখেছে, যা সাম্প্রদায়িক স্বায়ত্তশাসন এবং বৈষম্যহীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সাংবিধানিকীকরণে বিচারবিভাগের ভূমিকার তাৎপর্য

ধর্মীয় বিবাদগুলো যখন হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়, তখন তা ভারতীয় আইনতত্ত্বে এক রূপান্তরমূলক অধ্যায়ের সূচনা করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে আনার ফলে তাদের **নিরঙ্কুশ প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের** ধারণাটি সীমাবদ্ধ হয়েছে।

- **সাংবিধানিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** যখন ধর্মীয় বিবাদ আদালতে আসে, তখন আদালত **অনুচ্ছেদ ১৪ (সাম্য), ১৫ (বৈষম্যহীনতা), ২১ (জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা), ২৫ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)** এবং **২৬ (সাম্প্রদায়িক অধিকার)**-এর নিরিখে বিশ্বাস ও মৌলিক অধিকারের সংযোগস্থল পরীক্ষা করার ক্ষমতা পুনরায় নিশ্চিত করে।
- **পাবলিক ল ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়া:** মন্দিরগুলি কেবল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্থান— এই যুক্তিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় এনডাওমেন্ট আইনের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় এগুলোর প্রশাসন এখন **পাবলিক ল (Public Law)**-এর আওতাভুক্ত এবং বৈধ বিচারবিভাগীয় তদারকির যোগ্য।
- **ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** ঘনঘন মামলা মোকদ্দমার ফলে ধর্ম সংক্রান্ত আইনগুলো এখন সাংবিধানিক আলোচনার কেন্দ্রে। আদালত এখানে একটি কাঠামোবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে, যা ধর্মীয় প্রথা এবং **ব্যক্তিগত মর্যাদার** মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে।

- **সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের সমন্বয়:** বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হলো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন এবং **সাংবিধানিক নৈতিকতার** মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, যাতে ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব **আইনের শাসনের** (Rule of Law) অধীন থাকে।
- **ধর্মীয় পরিসরে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা:** বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে গভীরমূল প্রথাগুলোকে পরীক্ষা করা হয় যাতে উপাসকদের অধিকার সাম্য বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়।
- **রাষ্ট্র-ধর্ম-নাগরিক সম্পর্কের পুনর্গঠন:** ধারাবাহিক সাংবিধানিক নজরদারি রাষ্ট্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ককে নতুন রূপ দিয়েছে, যা ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ বজায় রেখেই বিশ্বাসের শাসনকে সংবিধানের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের সাংবিধানিকীকরণে বিচারবিভাগীয় চ্যালেঞ্জ

ধর্মের "সাংবিধানিকীকরণ"-এর পেছনে প্রগতিশীল উদ্দেশ্য থাকলেও, পবিত্র আধ্যাত্মিক পরিসরে প্রবেশের সময় বিচারবিভাগকে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়:

- **বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা (Judicial Overreach) ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব:** ধর্মীয় আচার ও তত্ত্বের গভীরে ব্যাপক হস্তক্ষেপ অনেক সময় 'জুডিশিয়াল ওভাররিচ'-এর ঝুঁকি তৈরি করে। আদালত এমন সব ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়তে পারে যা ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত।
    - তাছাড়া, বিচারকদের অনেক সময় প্রাচীন শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় **ধর্মতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের** (Theological Expertise) অভাব থাকে, যার ফলে আইনিভাবে সঠিক হলেও সিদ্ধান্তগুলো ধর্মীয়ভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়ে।
- **ERP পরীক্ষায় অসংলগ্নতা:** 'অপরিহার্য ধর্মীয় আচার' (ERP) পরীক্ষাটি প্রায়ই বিভিন্ন বিচারপতির বেঞ্চে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়, যা একটি **আইনতাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা** তৈরি করে।
    - **"অপরিহার্য"** আচারের সংজ্ঞা নিয়ে এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আইনের **পূর্বাভাসযোগ্যতা (Predictability)** কমিয়ে দেয়, ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে আদালতের সম্ভাব্য রায় বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।
- **রাজনৈতিকীকরণের ঝুঁকি :** উচ্চ-পর্যায়ের ধর্মীয় রায়গুলি প্রায়ই রাজনৈতিক রূপ পায়। বিভিন্ন পক্ষ আদালতের আদেশকে সামাজিক বিভাজন বাড়াতে বা নিজেদের জনসমর্থন জোরালো করতে ব্যবহার করে।
- **নৈতিকতা বনাম স্বায়ত্তশাসনের সংঘাত:** সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং **অনুচ্ছেদ ২৬** দ্বারা প্রদত্ত সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সংস্কারের দাবি জানালে আদালতকে অনেক সময় **"ধর্মনিরপেক্ষ অভিভাবকত্ব"** (Secular Paternalism)-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়, আবার প্রথার পক্ষে সায় দিলে বৈষম্যের সহযোগী হিসেবে দোষারোপ করা হয়।
- **বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বাধা:** আদালত যুগান্তকারী রায় দিলেও তৃণমূল স্তরে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রতিরোধ, সামাজিক বয়কট বা প্রাতিষ্ঠানিক অসহযোগিতার কারণে বিচারবিভাগীয় আদেশ কার্যকর করা প্রায়ই ব্যহত হয়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: সাংবিধানিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ

১. **বিচারবিভাগের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা**

- **মানদণ্ডের ধারাবাহিকতা:** পরস্পরবিরোধী রায় এড়াতে আদালতকে **'অপরিহার্য ধর্মীয় আচার' (ERP)** পরীক্ষায় সুনির্দিষ্ট ও সুসংগত মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে।
- **অতিসক্রিয়তা পরিহার:** বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ যেন আচারের সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার (Micromanagement) পরিবর্তে কেবল মূল সাংবিধানিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে।
- **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিচার:** রায়গুলোকে বাস্তবসম্মত করতে ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
- **মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা:** সংঘাতমূলক মামলার সংখ্যা কমাতে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শের মতো বিকল্প ব্যবস্থার অন্বেষণ করা উচিত।

- **প্রাতিষ্ঠানিক মধ্যস্থতা বৃদ্ধি:** তিরুপারঙ্কুনদ্রম মামলার ন্যায়, যৌথ পবিত্র স্থানের বিবাদ মেটাতে আদালতকে 'শান্তি কমিটি' এবং মধ্যস্থতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

২. আইনসভা ও শাসনবিভাগের ভূমিকা

- **আইন পর্যালোচনা:** ধর্মীয় এনডাওমেন্ট আইনগুলোকে আধুনিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও **আর্থিক দায়বদ্ধতার** (Financial Accountability) নিরিখে সংস্কার করা প্রয়োজন।
- **প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ:** মন্দির পরিচালনা পর্ষদগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় **সাম্য ও প্রতিনিধিত্ব** নিশ্চিত করতে পারে।
- **নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণ:** রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে ধর্মীয় আচারের নিয়ন্ত্রণ যেন সম্পূর্ণ **নিরপেক্ষ ও বৈষম্যহীন** হয়।

৩. নাগরিক সমাজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

- **সাম্যের অভ্যন্তরীণ চর্চা:** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে বৈষম্যহীন নীতি গ্রহণ করতে হবে।
- **সম্প্রদায়গত সংলাপ:** বিভিন্ন উপদলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মেটানো গেলে সামাজিক **মেরুকরণ** (Polarization) এবং মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস পাবে।
- **সাংবিধানিক সাক্ষরতা:** শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন মানসিকতা তৈরি করতে হবে যা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং **মৌলিক অধিকার**—উভয়কেই যথাযথ সম্মান দিতে শেখাবে।

উপসংহার

ভারতে মন্দির-সংক্রান্ত আইনতত্ত্বের বিবর্তন এটিই প্রমাণ করে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা কোনও **নিরপেক্ষ বা অবাধ অধিকার** (Absolute Right) নয়; বরং এটি সংবিধানের মূল ভিত্তির সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। 'গর্ভগৃহে' প্রবেশের মাধ্যমে বিচারবিভাগ বিশ্বাসের স্থান দখল করতে চায় না, বরং এটি নিশ্চিত করতে চায় যে বিশ্বাস যেন **ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের** কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। বিচারব্যবস্থার চিরস্থায়ী ভূমিকা হলো ধর্মের মূল আধ্যাত্মিক সারমর্মকে সুরক্ষা দেওয়া এবং একইসাথে মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী কুপ্রথাগুলিকে নির্মূল করা।

প্রশ্ন: *'ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়, বরং তা সাংবিধানিক নৈতিকতার অধীন'। সাম্প্রতিক বিচারবিভাগীয় প্রবণতা এবং যুগান্তকারী রায়ের প্রেক্ষিতে এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। ধর্মীয় বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সম্প্রীতি জোরদার করার উপায়গুলি প্রস্তাব করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.4. আরবান লোকাল বডিজ (ULBs)

প্রেক্ষাপট:

শহর স্থানীয় সরকার (ULBs) হলো শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৯২ সালের **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে Part IX-A **(অনুচ্ছেদ** 243P–243ZG) এবং **দ্বাদশ তফসিল** (12th Schedule) যুক্ত করা হয়েছে। এই তফসিলে ১৮টি কার্যকরী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন—শহর পরিকল্পনা, জল সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা, বস্তি উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য।

ভারতে শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) প্রকারভেদ:

ভারতে জনবসতির আকার, জনসংখ্যা এবং আয়ের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকারগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন** অনুযায়ী এটি মূলত তিন প্রকার, তবে আরও কিছু বিশেষ প্রশাসনিক সংস্থা রয়েছে।

১. **সাংবিধানিক তিনটি স্তর:**

- **মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন:** বড় **মেট্রোপলিটন শহরগুলোর** (যেমন—দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু) জন্য এটি গঠিত হয়। এরা সরাসরি রাজ্য সরকারের সাথে কাজ করে এবং এদের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা অনেক বেশি।
- **মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা:** মাঝারি বা ছোট শহরগুলোর জন্য এটি গঠিত হয়। এগুলি বিভিন্ন **ওয়ার্ডে** বিভক্ত থাকে এবং একটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।
- **নগর পঞ্চায়েত:** এটি এমন একটি এলাকা যা গ্রাম থেকে শহরে **পরিবর্তিত** হচ্ছে।

২. **বিশেষায়িত শহর সংস্থা :**

ধরন	উদ্দেশ্য	মূল বৈশিষ্ট্য
নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি	দ্রুত উন্নত হওয়া শহর বা যেগুলি পৌরসভার শর্ত পূরণ করে না।	সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার দ্বারা মনোনীত; কোনো নির্বাচন হয় না।
টাউন এরিয়া কমিটি	সীমিত নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন ছোট শহর (আলো, ড্রেনেজ)।	আধা-স্বায়ত্তশাসিত; বড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো কাজ করে।
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	যেখানে **সামরিক বাহিনী** এবং সাধারণ মানুষ একসাথে থাকে।	এটি **প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের** সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
টাউনশিপ	বড় বড় সরকারি সংস্থা (PSUs) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।	কর্মীদের নাগরিক সুবিধা প্রদান করে (যেমন—স্টিল সিটি টাউনশিপ)।
পোর্ট ট্রাস্ট	বন্দর এলাকার ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার জন্য।	এটি বন্দরের বাণিজ্যিক ও নাগরিক—উভয় দিকই দেখাশোনা করে।
স্পেশাল পারপাস এজেন্সি	নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য তৈরি (যেমন—ডিডিএ)।	একক কোনো লক্ষ্য (যেমন—আবাসন বা জল সরবরাহ) নিয়ে কাজ করে।

শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) শাসন কাঠামো:

ধরণ যাই হোক না কেন, বেশিরভাগ স্থানীয় সরকারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো একই রকম:

- **কাউন্সিল:** এটি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শাখা, যেখানে নির্বাচিত **ওয়ার্ড কাউন্সিলররা** থাকেন।
- **মেয়র বা চেয়ারপারসন:** ইনি হলেন নামমাত্র প্রধান (রাজ্য ভেদে নির্বাচিত বা মনোনীত হন)।
- **কমিশনার:** একজন আইএএস (IAS) অফিসার বা রাজ্য পর্যায়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, যিনি **নির্বাহী প্রধান** হিসেবে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন করেন।

শহর স্থানীয় সরকারের (ULBs) আর্থিক ব্যবস্থা:

আয়ের উৎসসমূহ:

- **নিজস্ব কর রাজস্ব: সম্পত্তি কর (Property Tax)** হলো আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া পেশা কর ও বিজ্ঞাপন কর রয়েছে। GST চালু হওয়ার পর 'অক্ট্রয়' এবং 'এন্ট্রি ট্যাক্স' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদের আর্থিক স্বাধীনতা অনেকটা কমে গেছে।
- **নিজস্ব কর-বহির্ভূত রাজস্ব:** ব্যবহারের খরচ (জল, পরিচ্ছন্নতা), বিল্ডিং লাইসেন্স ফি, মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির ভাড়া এবং জরিমানা।
- **আর্থিক অনুদান (Fiscal Transfers):** রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পাওয়া অর্থ। এছাড়া বিশেষ প্রকল্প (AMRUT, SBM 2.0) থেকেও গ্র্যান্ট পাওয়া যায়।
- **বাজার-ভিত্তিক ও উদ্ভাবনী অর্থায়ন: মিউনিসিপ্যাল বন্ড**, ব্যাংক বা হুডকো (HUDCO) থেকে ঋণ এবং **পিপিপি (PPP)** মডেল।

প্রস্তাবিত **আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড (Urban Challenge Fund)** শহরগুলিকে "বাজার-নির্ভর" করার চেষ্টা করছে, যেখানে শহরগুলিকে ৫০% অর্থ বন্ড বা ঋণের মাধ্যমে জোগাড় করতে হবে এবং কেন্দ্র ২৫% সহায়তা দেবে।

আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামোগত সমস্যা:

ভারতের মিউনিসিপ্যাল আয় জিডিপি-র (GDP) মাত্র **১%**, যা উন্নত দেশগুলির (৫–৮%) তুলনায় অনেক কম।

- **ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল ভারসাম্যহীনতা:** স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি কিন্তু আয়ের উৎস খুব সীমিত। এছাড়া বড় শহর এবং ছোট শহরগুলোর আয়ের ক্ষমতার মধ্যেও বিশাল পার্থক্য রয়েছে।
- **উৎপাদনশীল কর হারানো:** GST আসার আগে 'অক্ট্রয়' থেকে প্রচুর আয় হতো, যা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।
- **নির্ভরশীলতা:** নিজস্ব আয় কম থাকায় শহরগুলি রাজ্য বা কেন্দ্রের **ক্ষতিপূরণের** ওপর নির্ভর করে থাকে, যা অনেক সময় পেতে দেরি হয়।
- **কার্যকরী ওভারল্যাপ:** রাজ্যগুলি কাজের দায়িত্ব (১২তম তফসিল অনুযায়ী) দিলেও সেই অনুযায়ী **তহবিল (Fund)** বা পর্যাপ্ত **কর্মী (Functionaries)** দেয় না।
- **বাধ্যতামূলক ব্যয়:** বাজেটের সিংহভাগ (৬০%-৮০%) বেতন ও পেনশনের মতো **রাজস্ব ব্যয়ে** চলে যায়, ফলে নতুন পরিকাঠামো তৈরির জন্য টাকা থাকে না।
- **দুর্বল অ্যাকাউন্টিং:** অনেক শহর এখনও সঠিক অডিট বা **ডবল-এন্ট্রি বুককিপিং** করে না, যার ফলে তারা বাজার থেকে ঋণ বা বন্ড নিতে পারে না।

সরকারি উদ্যোগসমূহ:

- **আরবান চ্যালেঞ্জ ফান্ড (UCF):** শহরগুলিকে ঋণের যোগ্য বা "ব্যাঙ্কবল" করার জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প। শহর বাজার থেকে ৫০% অর্থ জোগাড় করলে কেন্দ্র ২৫% টাকা দেবে।
- **ক্রেডিট রিপেমেন্ট গ্যারান্টি:** ছোট শহরগুলিকে বাজার থেকে ঋণ নিতে সহায়তা করার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার গ্যারান্টি ফান্ড।
- AMRUT 2.0: ২০২৬ সালের মধ্যে শহরগুলিকে **"জল সুরক্ষিত"** করার লক্ষ্য। এর মধ্যে 'জল সরবরাহ' এবং 'নিকাশি ব্যবস্থা' উন্নত করা অন্তর্ভুক্ত।
- SBM-Urban 2.0: শহরগুলিকে **"আবর্জনা মুক্ত"** করার লক্ষ্য। এর মূল কাজ হলো বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পুরনো ল্যান্ডফিল পরিষ্কার করা।
- PM e-Bus Sewa: পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য পিপিপি (PPP) মডেলে **১০,০০০ ইলেকট্রিক বাস** নামানোর পরিকল্পনা।
- **ডিজিটাল ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ:** স্মার্ট সিটি মিশনের সময়সীমা বাড়ানো, TULIP ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে মেধাবী তরুণদের নিয়োগ এবং ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড তৈরি।

ভবিষ্যৎ পথ:

- **আর্থিক স্বায়ত্তশাসন:** রাজ্যগুলিকে কেবল নিয়ন্ত্রণ না করে শহরগুলিকে নিজস্ব কর আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে।
- **প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি:** দ্রুত **ডবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং** ব্যবস্থা চালু করতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা ভরসা পায়।
- **সেবা ও আয়ের ভারসাম্য:** কেবল লাভজনক প্রজেক্ট নয়, বস্তি উন্নয়ন বা গরিবদের সেবার মতো কাজগুলোতেও নজর দিতে হবে।
- **মাস্টার প্ল্যান শক্তিশালী করা:** শহর পরিকল্পনাকে শক্তভাবে কার্যকর করতে হবে যাতে অবৈধ নির্মাণ রোধ করা যায়।
- **পারফরম্যান্স ভিত্তিক গ্র্যান্ট:** যারা ভালো কাজ করবে (যেমন—বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), তাদের বেশি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- **দুর্বল শ্রেণির সুরক্ষা:** শহর আধুনিকীকরণের সময় গরিব মানুষ বা ভাড়াটেদের ওপর যাতে বাড়তি চাপের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উপসংহার:

ভারতের শহরগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শহর স্থানীয় সরকারগুলোকে কেবল অনুদান-নির্ভর না রেখে **আর্থিক স্বয়ম্ভর কেন্দ্রে** পরিণত করার ওপর। ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা এবং **স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণের** মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুললেই শতকোটি মানুষের জন্য উন্নত ও নিরাপদ শহর তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: *স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বা লোকাল বডিজ-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন এবং গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের সাথে শহর স্থানীয় সরকারের একত্রীকরণের ভালো ও মন্দ দিকগুলি তুলে ধরুন। ২০২৪ (২৫০ শব্দ, GS-2 রাষ্ট্রবিজ্ঞান)*

2.1.5. ফেডারেলিজম বা যুক্ত রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

জাস্টিস কুরিয়ান জোসেফ কমিটি দাবি করেছে যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র সরকারের হাতে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ ঘটছে। গণপরিষদের বিতর্ক এবং পূর্ববর্তী কেন্দ্র-রাজ্য কমিশনগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে এই কমিটি সংবিধান সংশোধন, **রাজ্যপাল পদের অপব্যবহার**, জিএসটি-পরবর্তী **আর্থিক ভারসাম্যহীনতা**, জম্মু ও কাশ্মীরের পুনর্গঠন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মতো কাঠামোগত উদ্বেগগুলো তুলে ধরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা ফেডারেলিজম হলো এমন একটি **দ্বৈত শাসনব্যবস্থা**, যেখানে সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা **কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ** এবং **আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর** মধ্যে ভাগ করা থাকে। এটি রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটি অভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমে **জাতীয় ঐক্য** বজায় রাখে।

1. **দ্বৈত শাসনব্যবস্থা:** সরকার দুটি স্তরে থাকে—কেন্দ্র এবং রাজ্য। প্রতিটি স্তর সংবিধান থেকে সরাসরি ক্ষমতা লাভ করে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করে।
2. **লিখিত এবং সর্বোচ্চ সংবিধান:** সংবিধানই হলো দেশের **সর্বোচ্চ আইন**। কোনও পক্ষই যাতে অন্যের ওপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তার জন্য সংবিধান স্পষ্টভাবে ক্ষমতার কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়।
3. **ক্ষমতার বিভাজন:** সংবিধানের **সপ্তম তফশিল (Seventh Schedule)** অনুযায়ী ক্ষমতা তিনটি তালিকায় বিভক্ত:
   - **কেন্দ্রীয় তালিকা:** জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় (যেমন—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি)।
   - **রাজ্য তালিকা:** আঞ্চলিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় (যেমন—পুলিশ, কৃষি)।
   - **যুগ্ম তালিকা:** যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই আইন করতে পারে (যেমন—শিক্ষা, বন)।
4. **স্বাধীন বিচার বিভাগ: সুপ্রিম কোর্ট** এখানে "আম্পায়ার" হিসেবে কাজ করে। এটি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করে।
5. **সংবিধানের অনমনীয়তা:** যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো (যেমন—ধারা ৩৬৮) কেন্দ্র একতরফাভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। এর জন্য সংসদে **বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা** এবং অন্তত **অর্ধেক রাজ্য বিধানসভার** সমর্থন প্রয়োজন।
6. **দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা:** সংসদে দুটি কক্ষ থাকে। **রাজ্যসভা** (উচ্চকক্ষ) জাতীয় স্তরে রাজ্যগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকারভেদ

১. **কাঠামোগত মডেল:**

- **সংহতিমূলক ফেডারেল ব্যবস্থা:** একটি বড় দেশ যখন বৈচিত্র্য ও ঐক্য বজায় রাখতে নিজের ক্ষমতা রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়।
  - **উদাহরণ: ভারত**, স্পেন, বেলজিয়াম।
- **সমবেত ফেডারেল ব্যবস্থা:** স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যখন নিজেদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে স্বেচ্ছায় একটি বড় ইউনিয়ন গঠন করে।
  - **উদাহরণ: আমেরিকা (USA)**, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড।

২. **কার্যনির্বাহী শৈলী:**

- **দ্বৈত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Dual Federalism):** কেন্দ্র ও রাজ্য একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে।
- **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Cooperative Federalism):** কেন্দ্র ও রাজ্য সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করে।
  - **উদাহরণ: GST কাউন্সিল** এবং NITI Aayog।
- **প্রতিযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Competitive Federalism):** বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সুশাসনের উন্নতির জন্য রাজ্যগুলো একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে।
  - **উদাহরণ:** SDG India Index বা **ইজ অফ ডুইং বিজনেস** র‍্যাঙ্কিং।
- **আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Fiscal Federalism):** কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলোতে আর্থিক সম্পদ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।
  - **উদাহরণ: ধারা ২৮০ (অর্থ কমিশন)**।

৩. **বিশেষ বিভাগ:**

- **অপ্রতিসম যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা:** সব রাজ্যের ক্ষমতা সমান নয়। ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক কারণে কিছু রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। (যেমন—**ধারা ৩৭১ থেকে ৩৭১-জে**)।
- **আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় (Quasi-Federalism):** কাঠামোগতভাবে ফেডারেল হলেও চরিত্রে এককেন্দ্রিক।

পণ্ডিত **কে.সি. হোয়ার (K.C. Wheare)** ভারতকে এই নামে অভিহিত করেছেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি

ভারতীয় সংবিধানে কোথাও **"ফেডারেশন"** শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। **ধারা ১** ভারতকে **"রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন"** (Union of States) হিসেবে বর্ণনা করেছে।

১. **"আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" (Quasi-Federal) তকমা:** ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতিকে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করা হয় **"Sui Generis"** (অনন্য) হিসেবে। প্রখ্যাত পণ্ডিত **কে.সি. হোয়ার (K.C. Wheare)** ভারতকে **"আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়"** বলেছেন, কারণ এটি এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র যেখানে কিছু এককেন্দ্রিক (Unitary) বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

২. **এককেন্দ্রিক ঝোঁক (শক্তিশালী কেন্দ্র):** আমেরিকার মতো দেশগুলোর তুলনায় ভারতের কেন্দ্রের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা রয়েছে:

- **ধারা ৩:** সংসদ চাইলে রাজ্যগুলোর সম্মতি ছাড়াই তাদের সীমানা বা নাম পরিবর্তন করতে পারে।
- **অবশিষ্ট ক্ষমতা:** এগুলো কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে (রাজ্যগুলোর হাতে নয়)।
- **জরুরি অবস্থা:** জরুরি অবস্থার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ **এককেন্দ্রিক** রূপ নিতে পারে (ধারা ৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০) ।
- **একক নাগরিকত্ব:** ভারতে কেবল ভারতীয় নাগরিকত্বই আছে; আলাদা কোনও "রাজ্য নাগরিকত্ব" নেই।

- **সমন্বিত বিচার বিভাগ ও সর্বভারতীয় পরিষেবা:** আইএএস (IAS)/আইপিএস (IPS) অফিসাররা কেন্দ্রের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও রাজ্যগুলোতে কাজ করেন।

৩. **যুক্তরাষ্ট্রীয় শক্তি (মৌলিক কাঠামো):** কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশি থাকলেও রাজ্যগুলো নিছক প্রশাসনিক এজেন্ট নয়:

- **এস.আর. বোম্মাই মামলা (১৯৯৪):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে **যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ**।
- **স্বাধীন ক্ষমতা:** সপ্তম তফশিলের **"রাজ্য তালিকা"**-র বিষয়গুলোতে রাজ্যগুলোর সর্বোচ্চ আইনি ক্ষমতা রয়েছে।
- **আর্থিক স্বায়ত্তশাসন:** ধারা ২৮০ (অর্থ কমিশন) এবং ২৭৯এ (GST কাউন্সিল) রাজ্যগুলোর জন্য রাজস্বের একটি বাধ্যতামূলক অংশ নিশ্চিত করে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়

প্রথম পর্যায়: একক দলের আধিপত্য (১৯৫০–১৯৬৭)

- **"কংগ্রেস ব্যবস্থা":** কেন্দ্র এবং প্রায় সব রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় থাকায় এটি ছিল একটি কেন্দ্রীভূত এবং ঐক্যমত্য-ভিত্তিক ব্যবস্থা।
- **পরিকল্পনা কমিশন:** কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।
- **প্রকৃতি:** সহযোগিতামূলক কিন্তু কেন্দ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় পর্যায়: সংঘাতময় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (১৯৬৭–১৯৮৯)

- **আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান:** বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলগুলোর ক্ষমতা দখল (**যেমন—তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট**)।
- **ধারা ৩৫৬–এর অপব্যবহার:** কেন্দ্র প্রায়ই **রাষ্ট্রপতি শাসন** জারি করে রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করতে শুরু করে।
- **মূল উন্নয়ন:** সংঘাত বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পর্যালোচনার জন্য **সরকারিয়া কমিশন (১৯৮৩)** গঠন করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়: বহুদলীয় / জোট সরকারের যুগ (১৯৮৯–২০১৪)

- **আঞ্চলিক গুরুত্ব:** জাতীয় সরকারগুলো টিকে থাকার জন্য আঞ্চলিক দলগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ফলে ক্ষমতার ভারসাম্য রাজ্যগুলোর দিকে ঝুঁকে যায়।
- **এস.আর. বোম্মাই রায় (১৯৯৪):** সুপ্রিম কোর্ট ধারা ৩৫৬-এর যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।
- **অর্থনৈতিক উদারীকরণ:** রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে।

চতুর্থ পর্যায়: প্রভাবশালী দল এবং সহযোগিতামূলক–প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা (২০১৪–বর্তমান)

- **কাঠামোগত পরিবর্তন:** পরিকল্পনা কমিশনের বদলে **নীতি আয়োগ** গঠন (**সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম**)।
- **এক দেশ, এক কর:** GST কার্যকর হওয়া এবং একটি সাংবিধানিক সংস্থা (GST কাউন্সিল) গঠন করা, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে ভোট দেয়।
- **সংঘাতের বিন্দু:** রাজ্যপালের ভূমিকা, কেন্দ্রীয় সংস্থা (ED/CBI)-র ব্যবহার এবং **সেস ও সারচার্জ** নিয়ে নতুন করে বিতর্ক।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) আর্থিক চ্যালেঞ্জ ও "সংকুচিত তহবিল"

- **সেস (Cess) এবং সারচার্জ:** এগুলো **বিভাজ্য তহবিলের** অংশ নয়, অর্থাৎ রাজ্যগুলোর সাথে এগুলো ভাগ করা হয় না। ২০২৫-২৬ সালে এগুলো কেন্দ্রের মোট রাজস্বের প্রায় **১৮–২০%**।
- **অর্থ কমিশন নিয়ে উত্তেজনা:** দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোর দাবি, "**আয় দূরত্ব**" (Income Distance)-র মাপকাঠি তাদের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের জন্য তাদেরই শাস্তি দিচ্ছে।

- **GST স্বায়ত্তশাসন:** অধিকাংশ পরোক্ষ কর বসানোর ক্ষমতা হারিয়ে রাজ্যগুলো এখন কেন্দ্রের আর্থিক হস্তান্তরের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল।

খ) রাজ্যপালের কার্যালয়

- **সাংবিধানিক অচলাবস্থা:** তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো রাজ্যগুলোতে রাজ্যপালরা বিলে সই না করে অনির্দিষ্টকাল ফেলে রাখছেন (**পকেট ভেটো**)।
- **রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব:** বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলোতে রাজ্যপালকে প্রায়ই "কেন্দ্রের এজেন্ট" হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গ) রাজ্যের বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ

- **যুগ্ম তালিকার বিস্তার:** শিক্ষা ও কৃষির মতো বিষয়ে রাজ্যগুলোর সঙ্গে খুব একটা আলোচনা না করেই কেন্দ্র বেশি মাত্রায় আইন প্রণয়ন করছে।
- **কেন্দ্রীয় সংস্থা:** ED, CBI, এবং NIA-কে "অস্ত্র" হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে অনেক রাজ্য (**যেমন—পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু**) সিবিআই-এর জন্য দেওয়া **"সাধারণ সম্মতি"** (General Consent) প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়

- **নীতি আয়োগ:** সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের মতো নীতি আয়োগের হাতে রাজ্যগুলোকে মূলধনী অনুদান দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা নেই।
- **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (ধারা ২৬৩):** এই সাংবিধানিক বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থাটি খুব কমই বৈঠকে বসে, ফলে আলোচনার পথ রুদ্ধ হচ্ছে।

ঙ) নতুন উদীয়মান দ্বন্দ্ব (২০২৫–২৬ প্রেক্ষাপট)

- **এক দেশ, এক নির্বাচন:** আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এতে জাতীয় ইস্যুগুলোর ভিড়ে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো হারিয়ে যাবে এবং রাজ্য বিধানসভার নির্দিষ্ট মেয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- **ডিলিমিটেশন বা সীমানা নির্ধারণের ভয়:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়া রাজ্যগুলো (বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত) ভয় পাচ্ছে যে পরবর্তী আদমশুমারির পর লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যা কমে যেতে পারে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ

১. রাজ্যপালের কার্যালয় বা পদের সংস্কার

- **সময়সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত:** রাজ্য বিধানসভায় পাস হওয়া বিলগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপালদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা (**যেমন—৬ মাস**) বেঁধে দেওয়ার যে সুপারিশ **পুঞ্চি কমিশন** করেছিল, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **নিরপেক্ষ নিয়োগ: সরকারিয়া কমিশনের** পরামর্শ অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে যে, রাজ্যপাল যেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাইরের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি হন এবং সাম্প্রতিক অতীতে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকেন।

২. আর্থিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমাধান

- **সেস এবং সারচার্জ ভাগ করা:** সংবিধান সংশোধন করে **সেস** (Cess) এবং **সারচার্জ** (Surcharge)-এর একটি অংশ রাজ্যগুলোর জন্য নির্ধারিত **বিভাজ্য তহবিলের** (Divisible Pool) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অনুদানের স্বায়ত্তশাসন:** সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের অভাব পূরণ করতে **নীতি আয়োগ** বা অনুরূপ কোনও সংস্থাকে রাজ্যগুলোকে সংবিধিবদ্ধ মূলধনী অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক পুনরুজ্জীবন

- **সক্রিয় আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল (ধারা ২৬৩):** যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে বড় ধরনের নীতি পরিবর্তন বা বিল নিয়ে আলোচনার জন্য **আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলকে** (Inter-State Council) একটি বাধ্যতামূলক ও স্থায়ী মঞ্চে পরিণত করতে হবে।

- **আঞ্চলিক কাউন্সিল (Zonal Councils):** নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সমস্যা এবং সীমানা বিরোধগুলো বড় আকার ধারণ করার আগেই সেগুলো সমাধানের জন্য নিয়মিত **আঞ্চলিক কাউন্সিল**-এর বৈঠক আয়োজন করতে হবে।

৪. পরামর্শমূলক আইন প্রণয়ন

- **যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভাব মূল্যায়ন (Federal Impact Assessment):** শিক্ষা বা কৃষির মতো যুগ্ম তালিকার বিষয়গুলোতে আইন প্রণয়নের আগে কেন্দ্রের উচিত রাজ্যগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি **"ফেডারেল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট"** পরিচালনা করা।
- **গণতান্ত্রিক সীমানা নির্ধারণ (Democratic Delimitation): ২০২৬ সালের সীমানা নির্ধারণ (Delimitation)** প্রক্রিয়া নিয়ে দক্ষিণ ভারতের সফল রাজ্যগুলোর উদ্বেগ নিরসন করতে হবে, যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হওয়ার কারণে তারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

উপসংহার

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অবশ্যই "আদেশ ও নিয়ন্ত্রণ" পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে একটি **সহযোগিতামূলক-প্রতিযোগিতামূলক (Collaborative-competitive)** মডেলে রূপান্তরিত হতে হবে। আন্তঃরাজ্য কাউন্সিলের মতো সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারত আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় অখণ্ডতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। এটি একটি স্থিতিস্থাপক, বিকেন্দ্রীকৃত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক **বিকশিত ভারত (Viksit Bharat)** গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: *"কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি কী কী পরিবর্তন এনেছে? কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?" (২০২৪ – ১৫ নম্বর)*

2.1.6. ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের অপরিহার্যতা

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি ডিএমকে (DMK) সাংসদ তথা প্রবীণ আইনজীবী **পি. উইলসন** রাজ্যসভায় একটি **বেসরকারি সংবিধান সংশোধনী বিল** পেশ করেছেন। এই বিলটি বিচারবিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে **সামাজিক বৈচিত্র্য** নিশ্চিত করা এবং সুপ্রিম কোর্টের **আঞ্চলিক বেঞ্চ** স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর পুনরায় আলোকপাত করেছে।
- এই উদ্যোগটি মূলত **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার** দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার চেষ্টা করে। বর্তমান ব্যবস্থা ভারতের সামাজিক বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে, বিশেষ করে **তফসিলি জাতি (SC)**, **তফসিলি উপজাতি (ST)**, **অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)**, **নারী** এবং **ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের** প্রতিনিধিত্বের অভাবের বিষয়টি এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

পটভূমি: বিচারবিভাগীয় নিয়োগের সাংবিধানিক বিধি

ভারতীয় সংবিধান বিচারবিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন একটি কাঠামো তৈরি করেছে যা শাসনবিভাগ (Executive) এবং বিচারবিভাগের (Judiciary) ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

- **ধারা ১২৪:** সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা **ভারতের প্রধান বিচারপতির (CJI)** সঙ্গে পরামর্শক্রমে **রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে বিচারবিভাগের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **ধারা ২১৭:** হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে **প্রধান বিচারপতি (CJI)**, সংশ্লিষ্ট **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি** এবং **রাজ্যপালের** সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক, যা বহু-পক্ষীয় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে।

- **ধারা ১৩০:** সুপ্রিম কোর্টের প্রধান আসন **দিল্লিতে** অবস্থিত হলেও, প্রধান বিচারপতি (CJI) কেন্দ্র সরকারের অনুমোদন নিয়ে ভারতের অন্য যে কোনো স্থানে সুপ্রিম কোর্টের আসন বা **আঞ্চলিক বেঞ্চ** নির্দিষ্ট করতে পারেন। এর জন্য নতুন কোনো সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজন নেই।
- **ধারা ১৬:** এটি সরকারি চাকরিতে **সমান সুযোগ** এবং সংরক্ষণের অধিকার প্রদান করে। এই নীতিটি সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগেও প্রয়োগ করা সম্ভব, যাতে সেখানে সঠিক **সামাজিক প্রতিনিধিত্ব** নিশ্চিত করা যায়।

নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিবর্তন: কোলেজিয়াম ব্যবস্থা

১. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন**

- **১৯৮০-র দশকের আগে:** মূল সাংবিধানিক নকশা অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শের পর নিয়োগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত শাসনবিভাগ।
- **প্রথম বিচারক মামলা (১৯৮১):** জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার যুক্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে **শাসনবিভাগের প্রাধান্য** বজায় রাখা হয়।
- **দ্বিতীয় বিচারক মামলা (১৯৯৩):** আগের রায় বাতিল করে **কোলেজিয়াম ব্যবস্থা** গঠন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগের জন্য **প্রধান বিচারপতি + ৪ জন প্রবীণতম বিচারপতি** এবং হাইকোর্টের জন্য **প্রধান বিচারপতি + ২ জন প্রবীণতম বিচারপতি**র সমন্বয়ে এই ব্যবস্থা গঠিত হয়, যেখানে বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- **তৃতীয় বিচারক মামলা (১৯৯৮):** কোলেজিয়ামের ভূমিকা আরও বিস্তৃত করা হয়। সরকার একবার আপত্তি জানাতে পারে, কিন্তু কোলেজিয়াম সেই সুপারিশ পুনরায় পাঠালে তা মানা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক। এর ফলে নিয়োগে **বিচারবিভাগের চূড়ান্ত আধিপত্য** প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী**

- **কার্যপদ্ধতি:** মেধা, জ্যেষ্ঠতা এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে কোলেজিয়াম নাম প্রস্তাব করে এবং তা **কেন্দ্রীয় সরকারের** কাছে পাঠায়। সরকার পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোলেজিয়ামের হাতেই থাকে।
- **বর্তমান পরিস্থিতি (২০২৬):** বর্তমানে সুপ্রিম কোর্ট তার পূর্ণ অনুমোদিত **৩৪ জন বিচারপতি**র শক্তি নিয়ে কাজ করছে। তবে ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী হাইকোর্টগুলিতে **৩৩১টি শূন্যপদ** রয়ে গেছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতাকে প্রকট করে।
- **স্বচ্ছতার প্রচেষ্টা:** স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে একটি নতুন **মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর** (MoP) তৈরির নির্দেশ দেয়। ২০১৭ সালে এটি চূড়ান্ত হলেও সরকার তা গ্রহণ করেনি।

৩. **কোলেজিয়াম ব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা গুরুত্বপূর্ণ রায়সমূহ**

- **বিচারক মামলাসমূহ (Judges Cases):** কোলেজিয়াম ব্যবস্থাকে সংবিধানের **মৌলিক কাঠামো** (Basic Structure) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।
- **চতুর্থ বিচারক মামলা (২০১৫):** ২০১৪ সালের **৯৯তম সংবিধান সংশোধনী**র মাধ্যমে **জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন** (NJAC) গঠন করা হয়েছিল। এতে প্রধান বিচারপতি, ২ জন প্রবীণ বিচারপতি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং ২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকার কথা ছিল।
- **সুপ্রিম কোর্টের রায়:** ৫:০ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট এই কমিশনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করে। আদালতের মতে, এটি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও মৌলিক কাঠামোকে লঙ্ঘন করেছে।
- **যুক্তি:** আইনমন্ত্রী ও অ-বিচারবিভাগীয় সদস্যদের উপস্থিতিতে শাসনবিভাগের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল; ফলে পুনরায় কোলেজিয়াম ব্যবস্থা ফিরে আসে।

বিচারবিভাগে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে বেসরকারি বিল

এই বিলটি মেধার সঙ্গে আপস না করেই বিচারবিভাগে **বৈচিত্র্য** এবং বিচারে **সর্বজনীন প্রবেশাধিকার** নিশ্চিত করার প্রস্তাব দেয়।

- **বৈচিত্র্যের ম্যান্ডেট:** সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী **তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC), নারী** এবং **ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের** জন্য আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- **সময়সীমা:** কোলেজিয়ামের সুপারিশ পাওয়ার পর কেন্দ্র সরকারকে সর্বোচ্চ **৯০ দিনের** মধ্যে তা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া।
- **আঞ্চলিক বেঞ্চ:** দিল্লি (প্রধান বেঞ্চ) ছাড়াও **কলকাতা, মুম্বাই** এবং **চেন্নাইয়ে** সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আঞ্চলিক বেঞ্চ স্থাপন করা।
- **এক্তিয়ার:** এই আঞ্চলিক বেঞ্চগুলি সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ এক্তিয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করবে; কেবল **সাংবিধানিক বিষয়গুলি** দিল্লির মূল 'কনস্টিটিউশন বেঞ্চ'-এর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- **যৌক্তিকতা:** এটি বিচারে সাধারণ মানুষের **প্রবেশাধিকার** উন্নত করবে, দিল্লির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা কমাবে এবং **ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা** দূর করবে। উল্লেখ্য যে, ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে **৯০,০০০-এর বেশি মামলা** বকেয়া রয়েছে।

ভারতের বিচারবিভাগে বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

১. **দীর্ঘস্থায়ী প্রতিনিধিত্বের অভাব দূরীকরণ**

ভারতের বহুমাত্রিক সমাজের প্রতিফলন বিচারবিভাগে থাকা আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান তথ্য এক হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরে:

- **২০১৮-২০২৪ হাইকোর্ট নিয়োগ (৭১৫ জন বিচারক):** মাত্র **২২ জন তফসিলি জাতি (SC), ১৬ জন তফসিলি উপজাতি (ST), ৮৯ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)** এবং **৩৭ জন সংখ্যালঘু** নিযুক্ত হয়েছেন (অর্থাৎ মাত্র প্রায় **২৩%** প্রান্তিক গোষ্ঠী থেকে)।
- **সুপ্রিম কোর্ট:** ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮৭ জন বিচারপতির মধ্যে মাত্র **১১ জন মহিলা** (~৮%)। আজও কোনও **SC/ST মহিলা** বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে নিযুক্ত হননি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু থেকে মাত্র একজন নারী নিযুক্ত হয়েছিলেন (**বিচারপতি ফাতিমা বিবি**)।
- **বার (Bar) থেকে সরাসরি নিয়োগ:** সরাসরি আইনজীবীদের মধ্য থেকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়—যেখানে **৯ জন পুরুষ** সরাসরি নিযুক্ত হয়েছেন, সেখানে মহিলা মাত্র **১ জন (বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা)**।

২. **প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির পথে কাঠামোগত বাধা**

ব্যক্তিগত মেধার অভাব নয়, বরং কাঠামোগত বাধাগুলোই নারী এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অগ্রগতিকে সীমিত করেছে:

- **বিলম্বিত নিয়োগ:** মহিলা বিচারকদের প্রায়ই ক্যারিয়ারের অনেক দেরিতে উচ্চতর বিচারবিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা তাঁদের কার্যকাল (Tenure) সংক্ষিপ্ত করে দেয় এবং জ্যেষ্ঠতা (Seniority) অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।
- **সংক্ষিপ্ত কার্যকাল:** অনেক মহিলা বিচারপতি ৩ বছরেরও কম সময় দায়িত্ব পালন করেছেন, যা আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাঁদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ কমিয়ে দেয়।
- **সুযোগের সীমাবদ্ধতা:** এই কাঠামোগত সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কোনো সুসংগত ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিধিত্বের অভাবের এক দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে।

৩. **ন্যায়বিচারের গুণগত মান ও সামাজিক বৈধতা**

বিচারবিভাগে একজাতীয়তা (Homogeneity) গণতান্ত্রিক বৈধতাকে দুর্বল করে, যা শেষ পর্যন্ত জনমনে আস্থার অভাব তৈরি করে:

- **দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা:** বৈচিত্র্যহীন বেঞ্চ অনেক সময় প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ, **হাথরাস ধর্ষণ মামলায়** দলিত মহিলার জবানবন্দি খারিজ হওয়া বনাম **২০১২ সালের দিল্লি গণধর্ষণ মামলায়** তা গ্রহণ করার তুলনামূলক বিতর্কটি উল্লেখযোগ্য।

- **গণতান্ত্রিক ঘাটতি:** সংসদ বা সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ থাকলেও বিচারবিভাগে তার অনুপস্থিতি একে সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।
- **প্রতিষ্ঠানের বৈধতা:** বৈচিত্র্যময় বিচারকরা আইনি ব্যাখ্যাকে সমৃদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপ, লিঙ্গ সংবেদনশীলতার বিষয়ে **বিচারপতি বি.ভি. নাগরত্ন** এবং উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে **বিচারপতি লায়লা শেঠের** অবদান অনস্বীকার্য।

৪. কোলেজিয়াম ব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা

কোলেজিয়াম ব্যবস্থা প্রায়ই তার অস্বচ্ছতা এবং সামাজিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার জন্য সমালোচিত হয়:

- **স্বজনপোষণ ও অস্বচ্ছতা:** নির্দিষ্ট কোনও কার্যকরী 'মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর' (MoP) না থাকায় নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ বলে গণ্য হয়। বিচারপতি দীপক মিশ্রর সময় স্বচ্ছতার চেষ্টা করা হলেও তা স্থায়ী হয়নি।
- **"মেধার মিথ" এবং সামাজিক পুঁজি:** সমাজবিজ্ঞানী সতীশ দেশপান্ডের মতে, মেধার আড়ালে অনেক সময় উচ্চবর্ণের সামাজিক সুবিধা এবং নেটওয়ার্ক লুকিয়ে থাকে।
  - ইয়েল অধ্যাপক ড্যানিয়েল মার্কোভিটস একে একটি **"মেরিটোক্র্যাসি ট্র্যাপ"** হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
  - **ডঃ বি.আর. আম্বেদকর** সতর্ক করেছিলেন যে, যদি কাউকে সামাজিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তার মেধা অর্থহীন হয়ে পড়ে।
- **লিঙ্গ অন্ধত্ব:** কোলেজিয়াম মূলত প্রবীণতম পুরুষ বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হওয়ায় লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। এর ফলে পারিবারিক আইন বা কর্মক্ষেত্রে হেনস্থার মতো মামলায় বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক সেরা উদাহরণ

কোলেজিয়াম ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করতে ভারত আন্তর্জাতিক কিছু মডেল অনুসরণ করতে পারে:

- **যুক্তরাজ্য :** এখানে বিচারক, আইনজীবী এবং **সাধারণ নাগরিকদের (Lay members)** নিয়ে একটি স্বাধীন কমিশন কাজ করে। এটি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেবল বিচারকদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখে না এবং আইনি বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করে।
- **দক্ষিণ আফ্রিকা :** স্বচ্ছতার দিক থেকে এটি একটি বিশ্বসেরা মডেল। এদের সংবিধানেই বলা আছে যে বিচারবিভাগে দেশের জাতিগত ও লিঙ্গগত বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হতে হবে।
- **কেনিয়া:** কেনিয়ায় বিচারপতি নিয়োগের জন্য **প্রকাশ্যে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার** নেওয়া হয়। এই স্বচ্ছতা জনমনে গভীর বিশ্বাস তৈরি করে এবং বিচারকের আইনি জ্ঞানের পাশাপাশি সামাজিক সংবেদনশীলতাও যাচাই করে।

ভবিষ্যতের পথ: একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিচারবিভাগের জন্য সংস্কার

- **বিচারবিভাগের স্ব-সংস্কার:** কোলেজিয়ামের উচিত স্বেচ্ছায় **বৈচিত্র্যকে** অগ্রাধিকার দেওয়া এবং স্বচ্ছতার জন্য বার্ষিক **জাতিগত ও লিঙ্গভিত্তিক তথ্য** প্রকাশ করা।
- **সাংবিধানিক সংশোধনী: ১৬ নম্বর ধারার** যুক্তিকে **১২৪ ও ২১৭ নম্বর ধারায়** প্রসারিত করা; ১০৪তম সংশোধনীর আদলে **আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব** বাধ্যতামূলক করা।
- **এনজেএসি (NJAC)-র পুনরুজ্জীবন:** একটি ব্যাপকভিত্তিক কমিশন গঠন করা প্রয়োজন যা:
  - প্রান্তিক মেধাবীদের খুঁজে বের করতে একটি **'ডাইভারসিটি সেক্রেটারিয়েট'** গঠন করবে।
  - স্বাধীনতা রক্ষায় **বিচারকদের সংখ্যাধিক্য** বজায় রাখবে, তবে সামাজিক প্রেক্ষিত বুঝতে **বিশিষ্ট নাগরিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের** অন্তর্ভুক্ত করবে।
  - চূড়ান্ত সুপারিশের আগে **বার কাউন্সিল** বা জনসমীক্ষার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করবে।

- **আঞ্চলিক বেঞ্চ:** ল কমিশন ও সংসদীয় প্যানেলের সুপারিশ অনুযায়ী **১৩০ নম্বর ধারা** প্রয়োগ করে **কলকাতা** থেকে শুরু করে আঞ্চলিক বেঞ্চের বিস্তার ঘটানো।
- **আইন প্রণয়ন:** নিয়োগের মাপকাঠি হিসেবে সামাজিক পটভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করতে **'জুডিশিয়াল ডাইভারসিটি অ্যাক্ট'** পাস করা।
- **তথ্য স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** আইন মন্ত্রক ও বিচারবিভাগ কর্তৃক বার্ষিক **মেশিন-রিডেবল রিপোর্ট** প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা; এই তথ্যকে RTI-এর অন্তর্ভুক্ত করা যাতে নাগরিক সমাজ নজরদারি চালাতে পারে এবং জনসংখ্যার অনুপাতে নিয়োগের ঘাটতি পূরণ করা যায়।
- **নিম্ন আদালতকে 'পাইপলাইন' হিসেবে শক্তিশালী করা:** নিম্ন আদালতে স্বচ্ছ নিয়োগ, পদোন্নতিতে সংরক্ষণ এবং SC/ST/OBC ও নারী প্রার্থীদের জন্য বৃত্তি ও মেন্টরশিপ নিশ্চিত করা; উচ্চতর বিচারবিভাগের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় 'ট্যালেন্ট পুল' তৈরি করা।
- **সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর:** বিচারকদের জন্য লিঙ্গবিচার, জাতিগত সমীকরণ ও প্রান্তিক মানুষের বাস্তবতা নিয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা মডিউল চালু করা; বৈচিত্র্যকে কেবল 'কোটা রাজনীতি' হিসেবে না দেখে **সাংবিধানিক সমতা ও বৈধতার** অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

উপসংহার

আম্বেদকর বলেছিলেন, **"সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থায়ী হতে পারে না।"** একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বেঞ্চ গঠন মেধার সঙ্গে আপস নয়, বরং সাম্যের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি পূরণ। যে বিচারবিভাগ তার গঠনে বৈচিত্র্যময়, তা বিচারবিবেচনায় আরও শক্তিশালী এবং ন্যায়বিচারে আরও সঠিক হবে।

প্রশ্ন: *"বিচারবিভাগের স্বাধীনতা এবং বিচারবিভাগীয় বৈচিত্র্য একে অপরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক সাংবিধানিক মূল্যবোধ।" ভারতের বিচারবিভাগীয় নিয়োগের প্রেক্ষাপটে এটি আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.7. গোপনীয়তা বনাম স্বচ্ছতার দ্বন্দ্ব: RTI আইন ও DPDP আইনের ভারসাম্য

প্রেক্ষাপট

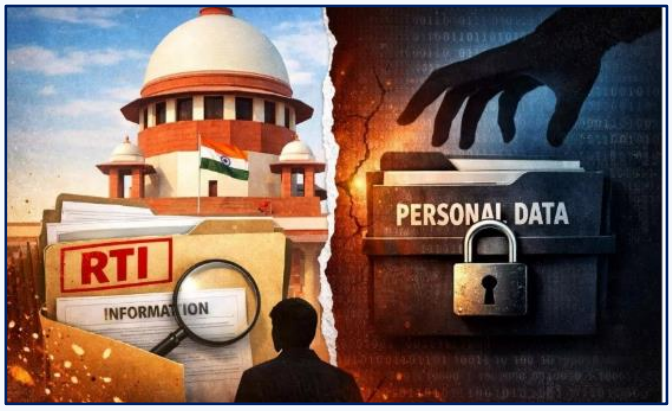

- সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন (DPDP) আইন, ২০২৩** থেকে উদ্ভূত **"সাংবিধানিক সংবেদনশীলতা"** নিরসনের জন্য একগুচ্ছ আবেদন একটি **সংবিধান বেঞ্চে** পাঠিয়েছে।
- এই আবেদনগুলোতে **তথ্য অধিকার (RTI) আইন, ২০০৫**-এর **ধারা ৮(১)(জে)** সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, যাকে সমালোচকরা গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতার ওপর এক "মরণ আঘাত" হিসেবে অভিহিত করেছেন।
- ভারতের **প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত** মন্তব্য করেছেন যে, আদালতের এখন **"ব্যক্তিগত তথ্য"**-এর সীমানা আইনিভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যাতে গোপনীয়তার অধিকারের দোহাই দিয়ে নাগরিকের জানার মৌলিক অধিকারকে অন্যায়ভাবে স্তব্ধ না করা হয়।

পটভূমি: আইনি কাঠামোর বিবর্তন

বর্তমান আইনি লড়াইটি দুটি ভিন্ন অধিকারের মধ্যে মৌলিক সংঘাতের প্রতিফলন, যা ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

১. **RTI আইন, ২০০৫: "সূর্যালোক" আইন**

RTI আইন কেবল কোনো প্রশাসনিক উপহার ছিল না; এটি সংবিধানে বিদ্যমান একটি অধিকারের আনুষ্ঠানিক সংকলন ছিল।

- **সাংবিধানিক ভিত্তি: "জানার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৯)**
  - **স্টেট অফ ইউপি বনাম রাজ নারায়ণ (১৯৭৫):** এই ঐতিহাসিক মামলায় বিচারপতি ম্যাথু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন: *"আমাদের মতো একটি দায়িত্বশীল সরকারে... এই দেশের জনগণের প্রতিটি সরকারি কাজ এবং জনস্বার্থে করা সমস্ত কিছু জানার অধিকার রয়েছে।"*
  - **যুক্তি:** আদালত রায় দিয়েছিল যে, নাগরিকদের কাছে তথ্য না থাকলে **বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১৯(১)(এ))** অর্থহীন। তথ্য গোপন রাখলে নাগরিকরা কোনো মতামত দিতে বা সরকারকে দায়বদ্ধ করতে পারে না। তাই RTI হলো অনুচ্ছেদ ১৯-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
  - **দর্শন:** এটি শাসনব্যবস্থাকে "অফিসিয়াল সিক্রেসি" থেকে **"পাবলিক ট্রাস্ট"**-এর দিকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ, তথ্য জনগণের সম্পদ এবং রাষ্ট্র কেবল তার রক্ষক।
  - **আন্দোলন:** ১৯৯০-এর দশকে অরুণা রায়ের নেতৃত্বে **মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন (MKSS)** রাজস্থানে একটি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। তাদের বিখ্যাত স্লোগান ছিল: *"হামারা পয়সা, হামারা হিসাব"*।
- **মূল ধারা ৮(১)(জে): একটি সুষম ছাড়** এটি ছিল তথ্যের সুরক্ষাকবচ, যা কেবল তখনই তথ্য প্রকাশে বাধা দিত যদি:
  - তথ্যের সাথে কোনো জনস্বার্থ বা সরকারি কাজের সম্পর্ক না থাকে।
  - তথ্য প্রকাশ করলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে অহেতুক হস্তক্ষেপ হয়।
- **"জনস্বার্থ" অগ্রাধিকার (Public Interest Override):** তথ্য ব্যক্তিগত হলেও, যদি জনতথ্য কর্মকর্তা (PIO) মনে করতেন যে "বৃহত্তর জনস্বার্থ" ব্যক্তিগত ক্ষতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে সেই তথ্য প্রকাশ করা যেত। এমনকি আইনে স্পষ্টভাবে বলা ছিল: *যে তথ্য সংসদ বা রাজ্য বিধানসভাকে দিতে অস্বীকার করা যায় না, তা কোনো নাগরিককেও অস্বীকার করা যাবে না।*

২. **DPDP আইন, ২০২৩: গোপনীয়তার ঢাল**

এই আইনটি ডিজিটাল যুগে "তথ্যগত গোপনীয়তা" (Informational Privacy) সুরক্ষায় একটি নতুন স্তর যুক্ত করেছে।

- **সাংবিধানিক ভিত্তি: "গোপনীয়তার অধিকার" (অনুচ্ছেদ ২১)**
  - **পুট্টস্বামী মামলা (২০১৭):** ৯ বিচারপতির একটি বেঞ্চ গোপনীয়তাকে **অনুচ্ছেদ ২১**-এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে।
  - **তিনটি শর্ত (Three-fold Test):** আদালত জানিয়েছে সরকার কেবল তখনই গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি তা তিনটি শর্ত পূরণ করে: **বৈধতা** (লিখিত আইন), **ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য** (জাতীয় নিরাপত্তা বা জনকল্যাণ), এবং **আনুপাতিকতা** (উদ্দেশ্য পূরণে ন্যূনতম হস্তক্ষেপ)।
- **সংশোধনী (ধারা ৪৪(৩)): "সার্বিক নিষেধাজ্ঞা"**
  - DPDP আইনটি RTI আইনের ৮(১)(জে) ধারা থেকে "জনস্বার্থ" সংক্রান্ত ভারসাম্যমূলক মানদণ্ডটি মুছে দিয়েছে।
  - এর পরিবর্তে একটি কঠোর নিয়ম আনা হয়েছে: যে কোনো **"ব্যক্তিগত তথ্য"** এখন প্রকাশের আওতামুক্ত।
  - **সমস্যা:** "জনস্বার্থ" রক্ষার সুযোগটি সরিয়ে দেওয়ার ফলে এটি **'আনুপাতিকতা তত্ত্ব' (Proportionality Doctrine)** লঙ্ঘন করে। এটি গোপনীয়তাকে এমন এক ঢাল হিসেবে তৈরি করে, যা দুর্নীতি ফাঁস বা সরকারি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ বিচারবিভাগীয় নজির: সি.পি.আই.ও (CPIO) বনাম সুভাষ চন্দ্র আগরওয়াল (২০১৯)

- সুপ্রিম কোর্ট এর আগে রায় দিয়েছিল যে, স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তা হলো সমমর্যাদার অধিকার। আদালত জানিয়েছিল যে, বিচারকদের সম্পত্তির বিবরণ বা নিয়োগ সংক্রান্ত নথি প্রকাশ করা যেতে পারে যদি তা কোনো **ন্যায়সঙ্গত জনস্বার্থ** পূরণ করে।
- ২০২৩ সালের সংশোধনীটি **'জনস্বার্থ'** (Public Interest)-এর এই পথটিকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে পূর্ববর্তী বিচারবিভাগীয় নজিরকে অগ্রাহ্য করেছে। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে জড়িত বিষয়গুলোতে RTI আইন কার্যত **'অচল'** হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রে RTI আইনের গুরুত্ব

- **অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের সুরক্ষা:** স্বচ্ছতা হলো একটি **"সদর্থক সরকারের"** ভিত্তি। RTI আইন নিশ্চিত করে যে **'সার্বভৌম' (জনগণ)** যেন কার্যকরভাবে **'এজেন্ট' (রাষ্ট্র)**-এর ওপর নজরদারি চালাতে পারে। এটি গণতন্ত্রকে কেবল ভোটদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দৈনন্দিন তদারকির স্তরে নিয়ে যায়।
- **সামাজিক অডিট ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা:** প্রান্তিক মানুষের জন্য **রেশন (PDS) বণ্টন**, MGNREGA-র মজুরি এবং পেনশনের তালিকা যাচাই করার এক অপরিহার্য হাতিয়ার হলো RTI। ভুয়া সুবিধাভোগী (Ghost Beneficiaries) রুখতে এই তালিকায় ব্যক্তিগত তথ্য থাকা জরুরি, যা RTI-এর মাধ্যমে স্বচ্ছ রাখা সম্ভব হয়।
- **দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শৃঙ্খলামূলক রেকর্ডের ওপর নজরদারি চালানোর সুযোগ দেয় এই আইন। এটি সরকারি পদের সততা বজায় রাখতে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রুখতে সাহায্য করে।
- **সততা নিশ্চিতকরণে RTI ও ই-গভর্ন্যান্সের সাফল্য:** ২০০৫ সাল থেকে RTI অসংখ্য বড় দুর্নীতি ফাঁস করেছে। যেমন:
  - **আদর্শ হাউজিং সোসাইটি কেলেঙ্কারি:** কার্গিল যুদ্ধের বিধবাদের জন্য বরাদ্দ আবাসন কীভাবে প্রভাবশালীরা দখল করেছিল, তা RTI-এর মাধ্যমেই সামনে আসে।
  - **২জি স্পেকট্রাম ও কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি:** টেলিকম স্পেকট্রাম বণ্টনে অনিয়ম এবং সরকারি তহবিলের বিশাল ক্ষতি এই আইনের সাহায্যেই উন্মোচিত হয়।
  - **ব্যাপম (Vyapam) কেলেঙ্কারি:** মধ্যপ্রদেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও নিয়োগে বড় ধরনের জালিয়াতি ফাঁস করতে RTI আবেদনগুলো বড় ভূমিকা পালন করেছিল।
- **ই-গভর্ন্যান্স ও RTI-এর পরিপূরকতা:** RTI হলো তথ্যের **'চাহিদা'** (নাগরিকের চাওয়া), আর ই-গভর্ন্যান্স হলো তথ্যের **'যোগান'** (সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ)। **'ভূমি'** (ডিজিটাইজড রেকর্ড), GeM (স্বচ্ছ কেনাকাটা) এবং DBT (সরাসরি অর্থ হস্তান্তর)-এর মতো প্রকল্পগুলো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

RTI-DPDP সংঘাতের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ

- **'লেজিটিমেট ইউজ' (Legitimate Uses) বা বৈধ ব্যবহারের বৈপরীত্য:** DPDP আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, জনকল্যাণের জন্য সরকার নাগরিকদের সম্মতি ছাড়াই তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু RTI সংশোধনী নাগরিকদের সরকারি তথ্য পেতে বাধা দিচ্ছে। এতে একটি **'একমুখী আয়না' (One-way Mirror)** তৈরি হচ্ছে—যেখানে রাষ্ট্র নাগরিকের ওপর নজর রাখতে পারবে, কিন্তু নাগরিক রাষ্ট্রের কাজ তদারকি করতে পারবে না।
- **সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর বিরূপ প্রভাব:** অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহকারী সাংবাদিকদের **'ডেটা ফিকুশিয়ারি' (Data Fiduciaries)** হিসেবে চিহ্নিত করা হতে পারে। DPDP আইনের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘনে **২৫০ কোটি টাকা** পর্যন্ত জরিমানার বিধান সাংবাদিকদের সরকারি প্রেস রিলিজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে পারে।
- **আনুপাতিকতা পরীক্ষার (Proportionality Test) ব্যর্থতা:** সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে, কোনো মৌলিক অধিকার খর্ব করতে হলে তা হতে হবে "ন্যূনতম হস্তক্ষেপকারী"। কিন্তু **'জনস্বার্থের অগ্রাধিকার' (Public Interest Override)** মুছে ফেলা

যুক্তিবিরোধী; কারণ এটি **জানার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯)** এবং **গোপনীয়তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)**-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার

- **অনুচ্ছেদ ১৯ এবং অনুচ্ছেদ ২১-এর মধ্যে সমন্বয়:** আমাদের 'জানার অধিকার' এবং 'গোপনীয়তার অধিকার'-এর মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনোটিকেই অন্যটির অধীনস্থ করা উচিত নয়।
    - সংবিধান বেঞ্চের উচিত ২০১৯ সালের **'সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার'** (CPIO) মামলার রায়ের চেতনাকে বজায় রাখা, যেখানে বলা হয়েছিল যে বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা স্বচ্ছতার প্রয়োজনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। একইভাবে, আদালত 'ব্যক্তিগত তথ্য' আসলে কী, তা নির্ধারণ করতে পারে।
- **তথ্য অনুসন্ধানকারীদের সুরক্ষা:** অধিকারকর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে **'হুইসেলব্লোয়ার্স প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০১৪'** দ্রুত কার্যকর করতে হবে।
- **সাংবাদিকদের জন্য আইনি সুরক্ষা:** ভারতের উচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের **GDPR মডেলের** মতো বিধান গ্রহণ করা, যেখানে সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংবাদমাধ্যমগুলো আর্থিক ক্ষতির ভয় ছাড়াই তাদের 'ওয়াচডগ' (Watchdog) ভূমিকা পালন করতে পারবে।
- **ARC সংস্কার বাস্তবায়ন:** আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা ভিতর থেকে পরিবর্তন করতে দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের (2nd ARC) পরামর্শ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক আমলের **'গোপনীয়তার শপথ'**-এর পরিবর্তে **'স্বচ্ছতার শপথ'** গ্রহণ করার এখনই উপযুক্ত সময়।

উপসংহার

একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে তথ্য হলো অক্সিজেনের মতো। ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেন স্বচ্ছতার পথ রুদ্ধ না হয়। একটি **'সচেতন নাগরিক সমাজ'** (Informed Citizenry) গড়ে তোলার জন্য RTI এবং DPDP আইনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং এটি একটি সুস্থ গণতন্ত্রের নৈতিক দাবি। সুপ্রিম কোর্টের আসন্ন রায় এই দুই অধিকারের একটি সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করবে—এটাই কাম্য।

প্রশ্ন: *"DPDP আইন, ২০২৩-এর 'বৈধ ব্যবহার' (Legitimate Uses) কাঠামো এবং RTI আইনের গুরুত্ব হ্রাস একত্রে একটি 'একমুখী আয়না' (One-way Mirror) তৈরি করেছে, যা গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে।" — জানার অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে উদীয়মান সাংবিধানিক সংঘাতের আলোকে এই বিবৃতিটি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.8. ব্যঙ্গের গুরুত্ব সম্পর্কে: সাংবিধানিক নৈতিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা

ভূমিকা:

ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভারতে এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সংক্রান্ত বিতর্কগুলি প্রায়শই জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা এবং সাংবিধানিক পদাধিকারীদের মর্যাদার মতো বিষয়গুলির সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রেক্ষাপট: সাম্প্রতিক বিতর্ক

- একটি **৫২ সেকেন্ডের ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন** (যেটিতে প্রধানমন্ত্রীর অবয়ব ছিল বলে অভিযোগ) নিউজ পোর্টাল 'দ্য ওয়্যার'-এর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে দেওয়া বা **ব্লক** করা হয়েছে।

- সরকার এই পদক্ষেপের সমর্থনে যুক্তি দিয়েছে যে, এটি এমন কিছু **"তথ্যসমৃদ্ধ গুজব বা যাচাইহীন তথ্য"** ছড়াচ্ছিল যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে:
  - **প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা**।
  - **দেশের ভাবমূর্তি বা মর্যাদা**।
  - **বৈদেশিক সম্পর্ক**।
- **'এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া'** এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে একে সরকারের সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি ক্রমবর্ধমান **অসহিষ্ণুতার** লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছে।
- **মূল সাংবিধানিক প্রশ্ন:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ কি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি, নাকি এটি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য একটি অপরিহার্য গণতান্ত্রিক রক্ষাকবচ?

গণতান্ত্রিক তত্ত্বে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভূমিকা: একটি কার্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

গণতান্ত্রিক আলোচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire কেবল নিছক বিনোদন নয়, বরং এটি নাগরিক অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নজরদারির একটি পরিশীলিত মাধ্যম। এর কার্যাবলিকে মূলত তিনটি স্তম্ভে ভাগ করা যায়:

১. দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা

- **পদ্ধতি:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ রাজনৈতিক অলঙ্কারকে ছাপিয়ে শাসনের ভেতরের **অসংগতি, ভণ্ডামি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারকে** জনসমক্ষে উন্মোচিত করে।
- **প্রভাব:** হাস্যরস ও শ্লেষের মাধ্যমে জটিল নীতি বা আইনি বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে তোলার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে **রাজনৈতিক সচেতনতা** বৃদ্ধি পায় এবং শাসনপ্রক্রিয়া তাদের কাছে আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

২. ভিন্নমতের 'সেফটি ভালভ' (Safety Valve)

- **পদ্ধতি:** এটি রাষ্ট্রের প্রতি জনমানসের অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশের একটি **অহিংস ও সৃজনশীল পথ** প্রশস্ত করে।
- **প্রভাব:** গঠনমূলকভাবে সমালোচনার সুযোগ করে দিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে উগ্র বা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়া তৈরির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৩. জনমত ও রাজনৈতিক আলোচনাকে শক্তিশালী করা

- **বিশ্বজনীন ঐতিহ্য:** উন্নত গণতন্ত্রে (যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) রাজনৈতিক কার্টুন বা গভীর রাতের ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানগুলোকে **'ধারণার বাজার'** (Marketplace of Ideas)-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **বিচারবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি:** আদালত প্রায়শই ঐতিহাসিক উদাহরণ টেনে বলেন যে—উপহাস সহ্য করার ক্ষমতা একটি **শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের** অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- **প্রভাব:** এটি জনমতের পরিধিকে বিস্তৃত করে এবং নিশ্চিত করে যে ভিন্নমত কেবল সহ্য করার বিষয় নয়, বরং তা জনজীবনের একটি **অপরিহার্য উপাদান**।

সাংবিধানিক কাঠামো: অনুচ্ছেদ ১৯ এবং যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ

- **অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক):** সকল নাগরিকের **বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার** মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমের (মুদ্রিত, ডিজিটাল, শিল্পকলা) সাহায্যে ধারণা বা মত প্রচারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।
- **অনুচ্ছেদ ১৯(২):** রাষ্ট্রকে এই অধিকারের ওপর **"যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ"** আরোপ করার ক্ষমতা দেয়।
- **যৌক্তিকতা ও আনুপাতিকতার পরীক্ষা:** বিধিনিষেধ যাতে দমনে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিচারবিভাগ নির্দিষ্ট কিছু আইনি নীতি অনুসরণ করে:

- **আনুপাতিকতার নীতি:** যেকোনো বিধিনিষেধ হতে হবে ন্যূনতম কঠোর। বিধিনিষেধের উদ্দেশ্যের সাথে এর একটি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে এবং এটি প্রতিকারের তুলনায় অত্যধিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চলবে না।
- **পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ:** 'শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' মামলায় প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী, যেকোনো সেন্সরশিপ—বিশেষত ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লক করার ক্ষেত্রে—**স্বাভাবিক ন্যায়বিচার (Natural Justice)** অনুসরণ করতে হবে। এর মধ্যে কন্টেন্ট নির্মাতাকে তাঁর বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত।
- **স্বেচ্ছাচারিতা:** স্বচ্ছতা বা বিচারবিভাগীয় তদারকি এড়িয়ে যাওয়া ঢালাও বা "জরুরি" নিষেধাজ্ঞাগুলি অসাংবিধানিক হিসেবে গণ্য হয়, কারণ সেগুলো "যৌক্তিকতার পরীক্ষায়" উত্তীর্ণ হতে পারে না।

বাকস্বাধীনতা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপ সংক্রান্ত প্রধান বিচারবিভাগীয় নজির

- **শ্রেয়া সিঙ্ঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৫):** সুপ্রিম কোর্ট আইটি আইনের **৬৬এ (Section 66A)** ধারাটিকে "অস্পষ্ট" এবং বাকস্বাধীনতার অন্তরায় হিসেবে বাতিল করে দেয়। আদালত নির্দেশ দেয় যে, কন্টেন্ট ব্লক করার আগে কন্টেন্ট নির্মাতার বক্তব্য শোনার পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ বজায় রাখতে হবে।
- **ইন্ডিবিলে ক্রিয়েটিভ বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার (২০১৯):** আদালত রায় দেয় যে, জনশৃঙ্খলার অজুহাতে সেন্সরশিপ না করে বরং **বাকস্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্তব্য**। সামাজিক অসংগতিগুলি প্রকাশ করার জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপকে অত্যাবশ্যক হিসেবে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- **কাম্মা বনাম এম. জোতিস্বরূপন (২০১৮):** মাদ্রাজ হাইকোর্ট **অতিশয়োক্তিকে (Exaggeration)** ব্যঙ্গবিদ্রূপের একটি বৈধ ও অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আদালত একে গণতান্ত্রিক সমালোচনা এবং ভণ্ডামি উন্মোচনের জন্য একটি "সহজাত আক্রমণাত্মক হাতিয়ার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে।
- **সৃজনশীল সাংবাদিকতা নিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট:** আদালত ব্যঙ্গবিদ্রূপকে ভিন্নমত প্রকাশের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে বহাল রেখেছে। আদালতের মতে, হাস্যরস বা শ্লেষকে কোনো "**অতি-সংবেদনশীল**" ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বরং একজন **"যুক্তিবাদী মানুষের"** দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত।

ব্যঙ্গবিদ্রূপের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: প্রথম সংশোধনী এবং 'ম্যালিস' (Malice) স্ট্যান্ডার্ড**
  - **আইনি ভিত্তি:** 'ধারণার বাজার' বা Marketplace of Ideas-এর মধ্যে রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপকে প্রায় নিরঙ্কুশ সুরক্ষা প্রদান করে।
  - **বিচারবিভাগীয় মাইলফলক (হাসলার বনাম ফলওয়েল):** মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, সরকারি বা জনপদাধিকারী ব্যক্তিদের **"আপত্তিকর প্যারোডি"** সহ্য করতে হবে, যদি না সেখানে সরাসরি কোনো **"বিদ্বেষমূলক মিথ্যা"** (Actual Malice) থাকে।
  - **মূলনীতি:** প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মকর্তাদের উচ্চমাত্রার উপহাস সহ্য করার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন।
- **ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত (ECHR): শৈল্পিক স্বাধীনতা**
  - **আইনি ভিত্তি:** ইউরোপীয় কনভেনশনের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়, যা এমনকি সেইসব ধারণাগুলোকেও সুরক্ষা দেয় যা **"বিরক্তিকর, স্তম্ভিত বা বিচলিত"** করতে পারে।
  - **বিচারবিভাগীয় স্বীকৃতি (ভেরেইনিগুং বনাম অস্ট্রিয়া):** আদালত নিশ্চিত করেছে যে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্বভাবগতভাবেই বাস্তবতাকে বিকৃত করে এবং শৈল্পিক প্রকাশ হিসেবে এটি উচ্চতর সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য।
  - **যৌক্তিকতা:** উসকানিমূলক ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রতি সহনশীলতা হলো **বহুত্ববাদ** এবং গণতান্ত্রিক পরিপক্কতার পরিচয়।

ডিজিটাল যুগে ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **নিষেধাজ্ঞার অস্পষ্ট ভিত্তি:** ১৯(২) অনুচ্ছেদের অধীনে বৈধ ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং প্রকৃত ভুল তথ্যের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য না করেই বারবার **"জাতীয় নিরাপত্তা"** বা "জনশৃঙ্খলা"র দোহাই দেওয়া।
- **ভীতি প্রদর্শন ও স্ব-সেন্সরশিপ (Chilling Effect):** কঠোর আইনি পদক্ষেপের (মানহানি, আইটি আইন বা UAPA-এর মতো আইন) ভয়ে নির্মাতারা আইনি জটিলতা বা সামাজিক রোষ এড়াতে নিজেরাই নিজেদের কাজ সংকুচিত বা বন্ধ করে দিচ্ছেন।
- **নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক অতিসক্রিয়তা:** আইটি রুলস (২০২১/২০২৬)-এর অধীনে বর্ধিত ক্ষমতা সরকারকে স্বচ্ছতা বজায় না রেখে বা নির্মাতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই দ্রুত **"জরুরি"** ভিত্তিতে কন্টেন্ট ব্লক করার অনুমতি দেয়।
- **"হেকলারস ভেটো" (Heckler's Veto):** সংগঠিত গোষ্ঠীর চাপ বা হুমকির মুখে বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র যখন শিল্পীকে সুরক্ষা না দিয়ে উল্টো তাঁর বক্তব্যকেই দমন করে, যা কার্যত **অসহিষ্ণুতাকে** উৎসাহিত করে।
- **ফৌজদারি ও দেওয়ানি দায়বদ্ধতা:** স্বতন্ত্র সংবাদমাধ্যম এবং ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের আর্থিকভাবে ও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করতে কৌশলগতভাবে **ফৌজদারি মানহানি** এবং বড় অংকের দেওয়ানি মামলার ব্যবহার।
- **মেরুকরণ ও সংকুচিত নাগরিক পরিসর:** উপহাস বা সমালোচনার প্রতি ক্রমহ্রাসমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সহনশীলতা, যেখানে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার জায়গা নিচ্ছে **অতি-সংবেদনশীলতা** এবং তীব্র মেরুকরণ।

উত্তরণের পথ: ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি সুরক্ষা

- **আইনি সংজ্ঞার সংশোধন:** ব্যঙ্গবিদ্রূপ/প্যারোডি এবং "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল তথ্যের" মধ্যে স্পষ্ট আইনি পার্থক্য তৈরি করতে হবে। **আনুপাতিকতার নীতি (Doctrine of Proportionality)** মেনে বিধিনিষেধগুলো এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে যাতে সৃজনশীল ভিন্নমতকে ভুলবশত "জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি" হিসেবে চিহ্নিত না করা হয়।
- **পদ্ধতিগত আইনি প্রক্রিয়া জোরদার করা:** ২০১৫ সালের **শ্রেয়া সিঙ্ঘল** মামলার নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে কন্টেন্ট নির্মাতাদের "আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার" নিশ্চিত হয়। ডিজিটাল কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে অবশ্যই লিখিত ও যুক্তিযুক্ত আদেশ দিতে হবে, যাতে সেটি বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার উপযোগী থাকে।
- **'হেকলারস ভেটো' (Heckler's Veto) রুখে দেওয়া:** ২০১৯ সালের **ইন্ডিবিলে ক্রিয়েটিভ** মামলার নজির অনুসরণ করে বক্তব্য রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইতিবাচক কর্তব্য স্বীকার করতে হবে। শৃঙ্খলা বজায় রাখার নামে শিল্পীর কণ্ঠরোধ না করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিত উত্তেজিত জনতা বা উগ্র গোষ্ঠীর চাপ সামলানো।
- **স্বাধীন তদারকি ব্যবস্থা গঠন:** ২০২৬ সালের আইটি রুলস-এ থাকা ৩ ঘণ্টার মধ্যে কন্টেন্ট সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশের বিপরীতে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা উচিত। বিচারবিভাগ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থা "জরুরি" ভিত্তিতে দেওয়া আদেশগুলোর **পোস্ট-ফ্যাক্টো অডিট (Post-facto Audit)** করবে, যাতে প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা যায়।
- **ব্যঙ্গাত্মক অভিব্যক্তিকে অপরাধমুক্ত করা:** শাস্তিমূলক ফৌজদারি ব্যবস্থা (যেমন ফৌজদারি মানহানি বা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অভিযোগ) থেকে সরে এসে আনুপাতিক দেওয়ানি প্রতিকারের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটি সেই **'চিলিং এফেক্ট' (Chilling Effect)** দূর করবে যা স্বাধীন মাধ্যম ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের কণ্ঠরোধ করে।
- **সাংবিধানিক নৈতিকতা বৃদ্ধি:** সাংবিধানিক সাক্ষরতার মাধ্যমে সমাজে সহনশীলতার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। একটি পরিপক্ক প্রজাতন্ত্রের উচিত ব্যঙ্গবিদ্রূপকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ওপর আঘাত হিসেবে না দেখে, বরং একটি **স্থিতিস্থাপক এবং স্ব-সংশোধনকারী গণতন্ত্রের** অপরিহার্য লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা।

উপসংহার

ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা স্যাটায়ার অনেক সময় সমালোচনামূলক এবং অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু সহিংসতায় উসকানি না দেওয়া পর্যন্ত এটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত। একটি পরিপক্ক গণতন্ত্র সব সময় সহনশীলতা নিশ্চিত করে, প্রকৃত নিরাপত্তা হুমকির সাথে সমালোচনার পার্থক্য বোঝে এবং দায়বদ্ধতা, ভিন্নমত ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

প্রশ্ন: *সাম্প্রতিক ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্লকিং সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে, ভারতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা Satire-এর সাংবিধানিক সুরক্ষা পর্যালোচনা করুন। বিচারবিভাগীয় রক্ষাকবচ ও ডিজিটাল যুগের উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সাথে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় বাতলে দিন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.9. সংসদের ঐতিহাসিক আইন: মহিলাদের জন্য অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর

প্রেক্ষাপট

- **সংবিধান (১০৬তম সংশোধনী) আইন, ২০২৩**, যা **'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'** নামে পরিচিত, সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ পাস হয়। এর লক্ষ্য লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ (**৩৩%**) আসন সংরক্ষণ করা।
- লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে উদযাপিত হলেও, এই আইনটি কার্যকর প্রতিনিধিত্বকে অন্তত **২০৩৪** সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি একটি "স্থগিত বাস্তবে" পরিণত হয়েছে।

মহিলা সংরক্ষণ আইন, ২০২৩-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ:** লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লির বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষিত থাকবে। এর মধ্যে তফশিলি জাতি (SC) এবং তফশিলি জনজাতি (ST)-দের জন্য নির্ধারিত আসনের মধ্যেও এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য উপ-সংরক্ষণ থাকবে।
- **সংরক্ষণ শুরু হওয়ার সময়:** এই আইনটি কার্যকর হওয়ার পর প্রথম যে **জনগণনা (Census)** হবে, তার রিপোর্ট প্রকাশের পরই এটি বাস্তবায়িত হবে। এরপর একটি **আসন বিন্যাস বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ (Delimitation)** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন চিহ্নিত করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই ব্যবস্থা ১৫ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।
- **আসন আবর্তন (Rotation):** ভৌগোলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সংরক্ষিত আসনগুলি বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় আবর্তিত হবে। প্রতিটি আসন বিন্যাস প্রক্রিয়ার পর এই আবর্তন প্রক্রিয়া সংসদীয় আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

বিলম্বের জন্য দায়ী সাংবিধানিক প্রক্রিয়া: আসন বিন্যাস (Delimitation)

- **আসন বিন্যাস কী:** জনসংখ্যার পরিবর্তনের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া, যাতে প্রতিটি আসন মোটামুটি সমান সংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে।
- **দুটি ধারাবাহিক শর্ত:** সংরক্ষণ শুরু হওয়ার আগে দুটি ধাপ প্রয়োজন—১) **জাতীয় জনগণনা** (সম্ভাব্য ২০২৭) এবং ২) সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অধীনে **আসন বিন্যাস কমিশন** গঠন। তথ্য যাচাই ও প্রকাশ করতে ১৮ মাস সময় লাগে, যা এই প্রক্রিয়াকে ২০২৯-এর দিকে ঠেলে দেয়।
- **জটিলতা:** ৫৪৩টি লোকসভা এবং ৪,০০০-এর বেশি বিধানসভা আসনের মধ্যে জনসংখ্যা সাম্য, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসনিক সীমানা এবং এসসি/এসটি কোটা বজায় রাখা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। আগের কমিশনগুলির (১৯৫২, ১৯৬৩, ১৯৭৩, ২০০২) কাজ শেষ করতে ৩-৬ বছর সময় লেগেছিল; এবার তা ২০৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত গড়াতে পারে।

এই নকশার পেছনের যুক্তি: সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমন্বয়

সংরক্ষণকে আসন বিন্যাসের সাথে জুড়ে দেওয়ার পেছনে একটি রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে:

- **পুরুষ প্রতিনিধিদের স্থানচ্যুতি এড়ানো:** বর্তমান ৫৪৩টি আসনের মধ্যেই ৩৩% কোটা চালু করলে ১৮১ জন বর্তমান পুরুষ সদস্য আসন হারাতেন।

- **"বড় পাই" (Bigger Pie) কৌশল:** ২০২৬-এর পর আসন বিন্যাস হলে লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে ৮০০ বা ৮৮৮ হতে পারে। আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে পুরুষদের সংখ্যা না কমিয়েই ৩৩% মহিলাকে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে।
- **ঐকমত্যের মূল্য:** যদিও এটি রাজনৈতিক সংঘাত কমায়, তবে এর ফলে মহিলাদের তাদের অধিকারের জন্য আরও এক দশক অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

বর্তমান চিত্র (Representation Landscape)

- মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ১৯৫৭ সালে ৩% থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ১০% হয়েছে, কিন্তু জয়লাভের হার থমকে আছে: লোকসভায় **১৪%**, রাজ্য বিধানসভায় গড়ে **৯%** এবং রাজ্যসভায় **১৭%**।
- বিশ্বজুড়ে এই গড় ২৬%; ভারত তার জি-২০ (G20) সমকক্ষ দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছে।

মূল চ্যালেঞ্জ এবং কাঠামোগত বাধা

১. **মহিলাদের বর্জনের পাঁচটি স্তম্ভ**

- **পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা:** সমাজ মহিলাদের গৃহবধূ হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত মহিলারা অনেক সময় তাদের স্বামীদের প্রক্সি হিসেবে কাজ করেন (সরপঞ্চ পতি)।
- **"জেতার ক্ষমতা" (Winnability) ট্র্যাপ:** রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম 'জেতার যোগ্য', তাই তারা মহিলাদের ১০ শতাংশের কম টিকিট দেয়।
- **"টাকা এবং পেশীশক্তি" (Money and Muscle):** মিলন বৈষ্ণবের মতে, ভারতীয় রাজনীতি চলে টাকা ও পেশীশক্তিতে। মহিলারা সাধারণত পারিবারিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন না এবং অপরাধী চক্রের সাথেও যুক্ত থাকেন না, ফলে তারা পিছিয়ে পড়েন।
- **দ্বিগুণ বোঝা:** ঘরোয়া কাজ ও সন্তান পালনের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাজনীতিতে ২৪/৭ সময় দেওয়া মহিলাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।
- **বিষাক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ:** মহিলা রাজনীতিবিদরা প্রায়ই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক মন্তব্য এবং অনলাইন চরিত্রহননের শিকার হন।

২. **ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় উত্তেজনা**

- দক্ষিণী রাজ্যগুলো, যারা সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা ভয় পাচ্ছে যে আসন বিন্যাসের ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোর তুলনায় তাদের আসন সংখ্যা কমে যাবে। এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটলে তবেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হওয়া সম্ভব।

৩. **আইনের নকশাগত ত্রুটি**

- **উচ্চকক্ষে অনুপস্থিতি:** এই আইন রাজ্যসভা বা বিধান পরিষদে প্রযোজ্য নয়।
- **ওবিসি (OBC) উপ-কোটার অভাব:** ওবিসি মহিলাদের জন্য কোনো আলাদা সংরক্ষণ নেই, যা শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত বা অভিজাত মহিলাদের প্রবেশের সুযোগ করে দিতে পারে (Elite Capture)।

বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উপায়

- **সাংবিধানিক বিচ্ছেদ:** জনগণনা এবং আসন বিন্যাসের সাথে সংরক্ষণের বাধ্যতামূলক যোগসূত্রটি সরিয়ে ফেলা।
- **অনুচ্ছেদ ১৫(৩)-এর ব্যবহার:** সংবিধানে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করার যে ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করে বর্তমান ৫৪৩টি আসনেই দ্রুত সংরক্ষণ কার্যকর করা।
- **অন্তর্বর্তী সম্প্রসারণ:** পূর্ণ আসন বিন্যাসের আগেই লোকসভায় মহিলাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত আসন যোগ করা।

- **টিকিট সংরক্ষণ:** জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ সংশোধন করে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য ৩৩% টিকিট মহিলাদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করা।

উপসংহার

মহিলা সংরক্ষণ আইন একটি ঐতিহাসিক কিন্তু স্থগিত প্রতিশ্রুতি। পদ্ধতিগত জটিলতা যেন প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে অস্বীকার করার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। সত্যিকারের গণতন্ত্র এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য ভারতের উচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলা এবং দ্রুত এই সংরক্ষণ কার্যকর করা।

প্রশ্ন: *নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম (মহিলা সংরক্ষণ আইন), ২০২৩-এর আলোকে ভারতে মহিলাদের কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথে কাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধাগুলি চিহ্নিত করুন। দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

2.1.10. ভারতের বিমান নিরাপত্তা ও অ-নির্ধারিত অপারেটর: চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার

প্রেক্ষিত

- ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের **বারামতিতে** ছোট বিমানের দুর্ঘটনা, ঝাড়খণ্ডের **সিমারিয়ার** কাছে দুর্ঘটনা এবং আন্দামানের **মায়াবন্দরের** কাছে একটি হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণসহ সাম্প্রতিক একাধিক বিমান দুর্ঘটনা ভারতের **অ-তফসিলি অপারেটর** (NSO) খাতে গভীর নিরাপত্তা উদ্বেগের সংকেত দিচ্ছে।
- এই ঘটনাগুলো জোর দিয়ে বলছে যে, চার্টার এভিয়েশন বা ভাড়ায় চালিত বিমান পরিষেবাকে তফশিলি বাণিজ্যিক ফ্লাইটের মতোই কঠোর নিয়মের আওতায় আনা প্রয়োজন, কারণ এই খাতের দ্রুত বৃদ্ধি তদারকির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।

পটভূমি: ভারতে NSO-এর বর্তমান চিত্র

- **NSO-এর সংজ্ঞা:** অ-নির্ধারিত অপারেটর বা NSO হলো এমন সংস্থা যা কোনো পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি ছাড়াই বিমান পরিবহন পরিষেবা (যাত্রী বা পণ্য) প্রদান করে। এগুলো মূলত 'চার্টার' বা ভাড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
- **বর্তমান পরিধি:** ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ভারতের প্রায় **১৩৩টি NSO পারমিটধারী সংস্থা** রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরণের ফিক্সড-উইং (স্থায়ী ডানাযুক্ত) বিমান এবং রোটারি-উইং (হেলিকপ্টার) ব্যবহার করছে।
- **বৃদ্ধির চালিকাশক্তি:** ভিআইপি (VIP) ভ্রমণ, ধর্মীয় পর্যটন (হেলিকপ্টারে তীর্থযাত্রা), জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা (এয়ার অ্যাম্বুলেন্স) এবং কর্পোরেট লজিস্টিকসের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে NSO খাতের বিস্তার ঘটছে। এই বিমানগুলো প্রায়শই এমন সব 'অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে' বা দুর্গম বিমানঘাঁটিতে চলাচল করে যেখানে সাধারণ বাণিজ্যিক এয়ারলাইনগুলো পৌঁছাতে পারে না।

ভারতের বিমান চলাচল শিল্পের বর্তমান চিত্র

- **বিশ্ব বাজারে অবস্থান :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পর ভারত বর্তমানে বিশ্বের **তৃতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ বিমান বাজার**। এটি বৈশ্বিক বিমান চলাচলের প্রায় **৪.২%** নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে বিশ্বের মোট বিমানের প্রায় **২.৪%** ভারতে রয়েছে, যা নতুন অর্ডারের মাধ্যমে দ্রুত বাড়ছে।
- **যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি :** ২০৩০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ আকাশপথের যাত্রী চাহিদা **৭১৫ মিলিয়নে** পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০৪০ সালের মধ্যে এটি **১.১ বিলিয়নে** উন্নীত হতে পারে, যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি।
- **পরিকাঠামো বিস্তার :** ২০১৪ সালে কার্যকর বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি, যা ২০২৫ সালে বেড়ে **১৬৩টিতে** দাঁড়িয়েছে। **২০৪৭ সালের মধ্যে ৩৫০-৪০০টি বিমানবন্দর** তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে গ্রিনফিল্ড প্রকল্প এবং **পিপিপি (PPP) মডেলকে** গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

- **অর্থনীতিতে অবদান:**২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, এই খাত প্রায় **৭.৭ মিলিয়ন কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করেছে এবং ভারতের **জিডিপি-তে (GDP) প্রায় ১.৫%** অবদান রাখছে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক বিবর্তন**
  - **এয়ার কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৩ (Air Corporations Act, 1953):** এই আইনের মাধ্যমে ৯টি বিমান সংস্থাকে **জাতীয়করণ** করা হয়েছিল, যার ফলে ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সরকারি বিমান সংস্থাগুলোর একাধিপত্য ছিল।
  - **ওপেন স্কাই পলিসি (১৯৯০-৯৪):** এই নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত 'এয়ার ট্যাক্সি' অপারেটরদের অনুমতি দেওয়া হয়, যা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার **একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান** ঘটায়।
- **ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, ২০২৪ (Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024):** এটি ১৯৩৪ সালের পুরনো এয়ারক্রাফট অ্যাক্টকে প্রতিস্থাপন করেছে। এই আইনটি ভারতের বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে ICAO **মানদণ্ড** এবং শিকাগো কনভেনশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। এটি **'মেক ইন ইন্ডিয়া'** এবং **'আত্মনির্ভর ভারত'** অভিযানকে শক্তিশালী করে এবং লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

ভারতের বিমান চলাচল খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো

- **নীতি নির্ধারণ ও কৌশলগত তদারকি (MoCA): বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক (Ministry of Civil Aviation)** এই খাতের মূল চালিকাশক্তি। এটি **জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি (NCAP)** তৈরি করে এবং UDAN-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও বিমানবন্দর বেসরকারীকরণ তদারকি করে।
- **নিরাপত্তা ও অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ (DGCA): ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA)** হলো প্রধান কারিগরি নিয়ন্ত্রক। এটি বিমানের ফিটনেস, পাইলটদের লাইসেন্স এবং **এয়ার অপারেটর সার্টিফিকেট (AOC)** প্রদান করে। এছাড়াও এটি নিরাপত্তা অডিট এবং **সিভিল এভিয়েশন রিকুইয়ারমেন্টস (CARs)** নির্ধারণ করে।
- **দুর্ঘটনা তদন্ত (AAIB): এয়ারক্রাফট অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB)** বিমান দুর্ঘটনা এবং গুরুতর ঘটনার তদন্ত করে। ICAO Annex 13 অনুসরণ করে এই সংস্থাটি দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করে এবং ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের জন্য পরামর্শ দেয়।
- **পরিকাঠামো ও আকাশপথ ব্যবস্থাপনা (AAI): এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI)** হলো একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এটি ভারতের আকাশপথ এবং বিমানবন্দরগুলোতে **এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট (ATM)** এবং **কমিউনিকেশন নেভিগেশন সার্ভেইল্যান্স (CNS)** ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
- **নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা (BCAS): ব্যুরো অফ সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি (BCAS)** ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি যাত্রী স্ক্রিনিং, কার্গো সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর সদর দপ্তর নয়াদিল্লিতে এবং এটি আইপিএস (DGP) পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয়।
- **প্রধান আইনী পদক্ষেপ:**
  - **ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম, ২০২৪:** এটি ১৯৩৪ সালের পুরনো আইনকে প্রতিস্থাপন করে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করেছে এবং জরিমানা বৃদ্ধি করেছে।
  - **প্রোটেকশন অফ ইন্টারেস্ট ইন এয়ারক্রাফট অবজেক্টস অ্যাক্ট, ২০২৫:** এটি বিমান লিজ বা ভাড়ার ক্ষেত্রে আইনী জটিলতা কমিয়ে বিশ্বব্যাপী ঋণদাতাদের আস্থা বাড়িয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (ICAO):** ভারত **আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)**-এর সদস্য হিসেবে **শিকাগো কনভেনশন** এবং এর মানদণ্ড (SARPs) মেনে চলতে বাধ্য। এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সুনাম এবং বীমা খরচ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভারতের বিমান চলাচল শিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **পাইলট প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার অভাব:** ভারতে পর্যাপ্ত **ফ্লাইট সিমুলেটর** এবং যোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় পাইলট সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে ২০২৫ সালে প্রায় **২৩৬ জন অস্থায়ী বিদেশী পাইলট** নিয়োগ করতে হয়েছে, যা একটি ব্যয়বহুল ও স্বল্পমেয়াদী সমাধান।
- **বাজারের একাধিপত্য এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি:** ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রায় **৯০% যাত্রী পরিবহন** নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র দুটি সংস্থা— **ইন্ডিগো** (IndiGo) এবং **এয়ার ইন্ডিয়া গ্রুপ**। এর মধ্যে ইন্ডিগো একাই ৬০% রুটে একমাত্র পরিষেবা প্রদানকারী। ফলে এই সংস্থাগুলোর পরিচালনায় কোনও বিঘ্ন ঘটলে পুরো আকাশপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **অপর্যাপ্ত অপারেশনাল বাফার:** বিশ্বজুড়ে বিমান সংস্থাগুলো সাধারণত ২০-২৫% অতিরিক্ত (স্ট্যান্ডবাই) ক্রু সদস্য রাখে। কিন্তু ভারতীয় এয়ারলাইনগুলো তাদের পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করে কাজ করায় হঠাৎ কোনও গোলযোগ বা কর্মী সংকট দেখা দিলে তা সামাল দেওয়ার মতো **অতিরিক্ত কর্মী** (Buffer) থাকে না।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক দুর্বলতা:** বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা DGCA-এর অনুমোদিত কারিগরি পদগুলোর প্রায় অর্ধেকই শূন্য। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে তদারকি ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক সময় কঠোর নিয়ম প্রয়োগের বদলে অস্থায়ীভাবে সময়সূচি শিথিল করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির কারণ।
- **উচ্চ খরচ এবং জ্বালানি তেলের দামের ওঠানামা: এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল** (ATF) বা বিমানের জ্বালানির দাম বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এবং ডলারের হারের ওপর নির্ভরশীল। জ্বালানির এই অনিশ্চিত দাম এয়ারলাইনগুলোর ওপর বিশাল আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে।
- **ঘন ঘন বিমান সংস্থা দেউলিয়া হওয়া:** ২০১২ সালে কিংফিশার এয়ারলাইন্স, ২০১৯ সালে জেট এয়ারওয়েজ এবং ২০২৩ সালে **গো ফার্স্ট** (Go First)-এর মতো বড় সংস্থাগুলোর পতন এই খাতের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আর্থিক অস্থিরতাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।
- **নিরাপত্তা এবং কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি:** আকাশপথে ট্রাফিক বৃদ্ধি এবং বারবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নিরাপত্তা উদ্বেগ বাড়ছে। ২০২৫ সালে DGCA কর্তৃক **১৯টি নিরাপত্তা লঙ্ঘনের নোটিশ** জারি করা হয়েছে, যা এই খাতের নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করে।

ভারতের বিমান চলাচল খাতকে শক্তিশালী করার মূল কৌশল

- **দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের ওপর জোর:** সাময়িক সমাধান বা ফ্লাইটের সময়সূচি বারবার পরিবর্তনের বদলে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত **৭১৫ মিলিয়ন যাত্রীর** চাপ আমাদের আকাশপথ ব্যবস্থা সামলাতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি বাড়ানো:** নিয়ন্ত্রক সংস্থা DGCA-এর খালি থাকা কারিগরি পদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ দিতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে নিরাপত্তার মান উন্নত করতে হবে এবং বিশ্বজুড়ে ভারতের সুনাম বজায় রাখতে হবে।
- **উন্নত পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি:** দেশের ভেতরেই পর্যাপ্ত **সিমুলেটর** এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। লাইসেন্স পাওয়ার পদ্ধতি সহজ করে এবং অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে জোর দিয়ে বিদেশী পাইলটদের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
- **ক্রু মেম্বারদের রিজার্ভ রাখা:** আন্তর্জাতিক মানের সাথে তাল মিলিয়ে অন্তত **২০–২৫% অতিরিক্ত কর্মী** (Spare Crew) রাখার নিয়ম বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর ফলে ব্যস্ত সময়ে বা হঠাৎ কর্মী সংকট দেখা দিলে ফ্লাইট চলাচল ব্যাহত হবে না।
- **আঞ্চলিক বিমান সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করা:** শুধুমাত্র লাইসেন্স বা NOC দিলেই হবে না, UDAN প্রকল্পের আওতায় ছোট বিমান সংস্থাগুলোকে সঠিক ভর্তুকি এবং বড় বিমানবন্দরগুলোতে নির্দিষ্ট 'স্লট' দিতে হবে। এতে বড় সংস্থাগুলোর ওপর একক নির্ভরতা কমবে।

- **জ্বালানি নীতি সংশোধন:** বিমানের জ্বালানির (ATF) ওপর ট্যাক্স কমানোর কথা ভাবতে হবে। বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওঠানামা থেকে বাঁচতে সঠিক আর্থিক কৌশল (Fuel Hedging) গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল বিমান চলাচল খাতকে নিরাপদ রাখতে হলে সরকারকে শুধুমাত্র নীতি তৈরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান অ-তফসিলি (Charter) খাতে নিরাপত্তা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে **'জিরো-টলারেন্স' বা শূন্য-সহনশীলতা** নীতি গ্রহণ করতে হবে। পরিশেষে, বাণিজ্যিক স্বার্থের চেয়ে নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, স্বচ্ছ তদারকি এবং উন্নত পাইলট প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই খাতের প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন: *ভারতের অ-নির্ধারিত অপারেটর (NSO) খাতে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা পদ্ধতিগত নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতিগুলিকে সামনে এনেছে। ভারতের বিমান শিল্পের মুখোমুখি হওয়া প্রধান সমস্যাগুলি সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক তদারকি ও আঞ্চলিক সংযোগ শক্তিশালী করার কৌশল প্রস্তাব করুন। (১৫ নম্বর)*

2.2. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

2.2.1. ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট:

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি-র বিপুল জয় লাভের পর, ভারত এক বাস্তববাদী পদক্ষেপ বা **"রিসেট"** শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর পক্ষ থেকে **তারেক রহমানের** সাথে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের মূল লক্ষ্য হলো—**শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ** নিয়ে টানাপোড়েন এবং বাংলাদেশে **চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের** মাঝে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করা।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি:

১. **স্বাধীনতার পর্যায় (১৯৭১-১৯৭৫)**

- **একটি জাতির জন্ম:** ১৯৭১ সালের **মুক্তিযুদ্ধে** ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত প্রায় **১ কোটি মানুষকে আশ্রয়** দেয় এবং **মুক্তিবাহিনীকে** সামরিক সহায়তা প্রদান করে।
- **প্রাথমিক কাঠামো:** ১৯৭২ সালের **বন্ধুত্ব চুক্তি** এবং ১৯৭৪ সালের **সীমানা চুক্তির (LBA)** মাধ্যমে **ইন্দিরা গান্ধী** ও **শেখ মুজিবুর রহমান** সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেন।
- **আকস্মিক ছন্দপতন:** ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড এই চমৎকার সূচনার অবসান ঘটায়।

২. **কৌশলগত দূরত্ব ও সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯৬)**

- **একতরফা নিরপেক্ষতা:** জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদের সামরিক আমল ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সরে আসে এবং ভারতকে চাপে রাখতে **চীন ও পাকিস্তানের** ঘনিষ্ঠ হয়।
- **নিরাপত্তা সংকট:** এই সময়ে ভারত-বিরোধী প্রচার বৃদ্ধি পায় এবং বাংলাদেশের মাটি ভারতের **উত্তর-পূর্বাঞ্চলী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর** (যেমন- ULFA) ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

৩. **সম্পর্কের "সোনালী অধ্যায়" (১৯৯৬-২০২৪)**

- **পানি ও নিরাপত্তা:** ১৯৯৬ সালের **গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি** একটি বড় সাফল্য ছিল।
- **হাসিনা আমল (২০০৯-২০২৪):** এই সময়ে সম্পর্ক শীর্ষে পৌঁছায়।
  - **২০১৫ সালের LBA বাস্তবায়ন:** ১৬২টি ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের স্থল সীমান্ত সমস্যার সমাধান হয়।

- **যোগাযোগের বিপ্লব:** ১৯৬৫-পূর্ববর্তী রেল সংযোগগুলো পুনরায় চালু হয় এবং ভারতের জন্য **চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর** ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়।
- **সন্ত্রাসবাদে জিরো টলারেন্স:** ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঢাকার কঠোর অবস্থান আঞ্চলিক নিরাপত্তার চিত্র বদলে দেয়।

৪. **বর্তমান সংকট ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন (২০২৪-২০২৬)**

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেছে:

- **২০২৬-এর নির্বাচনের ফলাফল:** ফেব্রুয়ারিতে **তারেক রহমানের বিএনপি** দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় নয়াদিল্লি দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি রহমানকে অভিনন্দন জানান, যা **"ব্যক্তি-কেন্দ্রিক"** কূটনীতি থেকে **"রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক"** কূটনীতিতে উত্তরণের সংকেত দেয়।
- **প্রত্যর্পণ সমস্যা:** ভারতের জন্য বড় অস্বস্তি হলো শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান। ঢাকার নতুন প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ঘটনার জন্য তাঁর **প্রত্যর্পণ এবং বিচার** করা তাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
- **নতুন শক্তির উত্থান: ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি** (NCP) এবং সীমান্ত এলাকায় **জামায়াতে ইসলামীর** প্রভাব বৃদ্ধি উগ্রবাদ ও **"ভারত-বিদ্বেষ"** নিয়ে নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. **কানেক্টিভিটি: উত্তর-পূর্ব ভারতের "প্রবেশদ্বার"**

- **রেল সংযোগ:** ১৯৬৫ সালের আগের ৮টি রেল সংযোগের মধ্যে ৬টি পুনরায় চালু করা হয়েছে। **আখাউড়া-আগরতলা** এবং **হলদিবাড়ি-চিলাহাটি** রুট ভারতের 'চিকেন'স নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোরের ওপর চাপ কমাবে।
- **বন্দর সুবিধা:** ২০২৩ সালের চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন উত্তর-পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহনের জন্য **চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর** ব্যবহার করতে পারছে, যা যাতায়াতের সময় ৬০% কমিয়ে দিয়েছে।
- **অভ্যন্তরীণ জলপথ:** গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য PIWTT **চুক্তি** কার্যকর রয়েছে।

২. **অর্থনৈতিক সহযোগিতা: CEPA-র লক্ষ্য**

- **বাণিজ্যের পরিমাণ:** দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার (প্রায় **১৪ বিলিয়ন ডলার**)।
- **CEPA ২০২৬:** ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ **CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)** চুক্তি চূড়ান্ত করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ যখন স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণ করবে, তখন SAFTA-র আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা হারাবে—এই অভাব মেটাতে CEPA খুবই জরুরি।
- **সীমান্ত হাট:** এই স্থানীয় বাজারগুলো সীমান্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এবং চোরাচালান কমায়।

৩. **জ্বালানি ও ডিজিটাল অংশীদারিত্ব**

- **মৈত্রী থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট:** ভারতের NTPC এবং বাংলাদেশের BPDB-র যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই **১৩২০ মেগাওয়াট** ক্ষমতার কেন্দ্রটি ২০২৬-এর শুরুতে পূর্ণ ক্ষমতায় চালু হয়েছে।
- **জৈব জ্বালানি পাইপলাইন:** শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত **মৈত্রী পাইপলাইনের** মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে ডিজেল সরবরাহ করছে।
- **মহাকাশ ও প্রযুক্তি: মৈত্রী স্যাটেলাইট** এবং ভারতের UPI **(ডিজিটাল পেমেন্ট)** ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের সমন্বয় এই নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য।

৪. **নিরাপত্তা ও পানি ব্যবস্থাপনা**

- **সীমান্ত নিরাপত্তা:** অনুপ্রবেশ ও গবাদি পশু পাচার রোধে ৪,০৯৬ কিমি সীমান্ত জুড়ে **"স্মার্ট ফেন্সিং"** এবং AI-চালিত নজরদারি চালু করা হচ্ছে।

- **পানি বণ্টন:** গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি **২০২৬ সালের ডিসেম্বরে** শেষ হবে; এটি নবায়ন করা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। **তিস্তা নদী** ব্যবস্থাপনায় ভারত একটি কারিগরি দল পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সমস্যাসমূহ

১. **"হাসিনা ফ্যাক্টর" এবং প্রত্যর্পণ (Extradition)**

- **উভয়সংকট:** ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে **বিএনপির বিজয়ের** পর, ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ হাসিনাকে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় "মানবতাবিরোধী অপরাধের" বিচারের জন্য **প্রত্যর্পণের অনুরোধ** জানিয়েছে।
- **ভারতের অবস্থান:** নয়াদিল্লি বর্তমানে একটি আইনি ও কূটনৈতিক উভয়সংকটে রয়েছে। ভারতকে একদিকে **প্রত্যর্পণ চুক্তির** বাধ্যবাধকতা রক্ষা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে "রাজনৈতিক অপরাধ" সংক্রান্ত ছাড় এবং পুরনো মিত্রদের ক্ষেত্রে ভুল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ঝুঁকি বিবেচনা করতে হচ্ছে।

২. **পানি কূটনীতি: ২০২৬-এর সময়সীমা**

- **গঙ্গা পানি চুক্তি:** ৩০ বছর মেয়াদী এই ঐতিহাসিক চুক্তির মেয়াদ **২০২৬ সালের ডিসেম্বরে** শেষ হচ্ছে। চুক্তিটি নবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ বাংলাদেশের রিপোর্ট অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে তারা গ্যারান্টিযুক্ত পানির হিস্যার মাত্র ৬৫% পেয়ে থাকে।
- **তিস্তা অচলাবস্থা:** পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কারণে এই চুক্তি এখনও স্থবির। এরই মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তে চীনের **১ বিলিয়ন ডলারের তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প** ভারতের জন্য একটি বড় কৌশলগত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. **সীমান্ত সংঘাত ও "জিরো কিলিং"**

- **বিএসএফ-এর গুলি:** ৪,০৯৬ কিলোমিটার সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যুর ঘটনা ঢাকার জন্য একটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ইস্যু। নতুন বিএনপি সরকার অভ্যন্তরীণ ভারত-বিদ্বেষ প্রশমিত করতে **"মানবিক সীমান্ত"** এবং "শুট-অন-সাইট" (দেখামাত্র গুলি) নীতি বন্ধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
- **অবৈধ অভিবাসন:** ভারতে এটি একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে রয়ে গেছে, বিশেষ করে ২০২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠেয় **আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের** প্রাক্কালে।

৪. **চীন-পাকিস্তান কৌশলগত ঝোঁক**

- **প্রতিরক্ষা পরিবর্তন:** বাংলাদেশ বর্তমানে JF-17 **যুদ্ধবিমান** (চীন-পাকিস্তান যৌথ উদ্যোগ) সংগ্রহের চেষ্টা করছে এবং ২০২৪ সালের নভেম্বরে **করাচি ও চট্টগ্রামের** মধ্যে সরাসরি নৌ-যোগাযোগ স্থাপন করেছে।
- **অবকাঠামো:** চীন এখনও বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ($১৮ বিলিয়নের বেশি), এবং বর্তমান কূটনৈতিক শূন্যতাকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের **"বেল্ট অ্যান্ড রোড"** কার্যক্রম আরও গভীর করছে।

৫. **সংখ্যালঘু নিরাপত্তা ও পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি**

- **সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা:** বাংলাদেশে **হিন্দু সংখ্যালঘুদের** নিরাপত্তা নিয়ে ভারত তার উদ্বেগ বজায় রেখেছে। ঢাকা ভারতের এই সোচ্চার অবস্থানকে "অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ" হিসেবে দেখছে, যার ফলে কূটনৈতিক শীতলতা বিরাজ করছে।

উত্তরণের উপায়

- **বাস্তববাদী সম্পর্ক (Pragmatic De-hyphenation):** দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কোনো নির্দিষ্ট নেতার ভাগ্যের সাথে না জুড়ে **প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক** করতে হবে। ২০২৬-এর বিএনপি সরকারের সাথে সমানভাবে কাজ করার পাশাপাশি শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ইস্যুটিকে একটি "বিশুদ্ধ আইনি ও বিচারিক" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।
- **পানি ব্যবস্থাপনা ২.০:** ২০২৬-এর গঙ্গা চুক্তি নবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে শুধু পানি বণ্টন নয়, বরং **পুরো অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা** এবং যৌথ নদী ড্রেজিং-এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

- **অর্থনৈতিক সুরক্ষা (CEPA):** বাংলাদেশ এলডিসি (LDC) থেকে উত্তরণ করার সাথে সাথে বাণিজ্য ধরে রাখতে **CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement)** দ্রুত কার্যকর করতে হবে। ইউপিআই (UPI) এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন মজবুত হবে।
- **নিরাপত্তা ও "স্মার্ট সীমান্ত":** সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনতে মারণাস্ত্রের বদলে **"স্মার্ট ফেন্সিং"** এবং এআই (AI) নজরদারি বাড়াতে হবে। একই সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখতে হবে।
- **প্রতিযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব:** চীনকে ঠেকাতে কেবল চাপ না দিয়ে, ভারতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত **ঋণ (Lines of Credit)** আরও দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের "প্রতিবেশী প্রথম" (Neighborhood First) নীতির সাফল্য নির্ভর করে একটি স্থিতিশীল এবং **দল-নিরপেক্ষ অংশীদারিত্বের** ওপর। **CEPA ২০২৬** এবং **"স্মার্ট সীমান্ত"** গড়ে তোলার মাধ্যমে নয়াদিল্লি বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কাটিয়ে একটি শক্তিশালী ও সংযুক্ত **বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল** নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন: *ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পেছনে যে বাধ্যবাধকতাগুলো কাজ করেছিল, তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.2.2. ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

ভারত এবং মালয়েশিয়া সম্প্রতি তাদের সম্পর্ককে **'কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ'** বা **সমগ্র কৌশলগত অংশীদারিত্বে** উন্নীত করেছে। এটি ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (Indo-Pacific) স্থিতিশীলতা বজায় রাখার একটি যৌথ প্রয়াস। এই অংশীদারিত্ব ভারতের **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'**-র একটি প্রধান স্তম্ভ।

ভারত-মালয়েশিয়া সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি:

- **প্রাচীন সম্পর্ক:** খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দুই দেশের যোগাযোগ ছিল, যা বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
- **উপনিবেশিক আমল:** ব্রিটিশ শাসনামলে রাবার বাগানে কাজ করার জন্য প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় (মূলত তামিল) মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমায়।
- **কূটনৈতিক যাত্রা:** ১৯৫৭ সালে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের মধ্যে **কূটনৈতিক সম্পর্ক** স্থাপিত হয়।
- **'মাহাথির' পরবর্তী তিক্ততা:** ২০১৯ সালের দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী **মাহাথির মোহাম্মদের** ৩৭০ ধারা এবং সিএএ (CAA) নিয়ে করা মন্তব্যের কারণে সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা দেয়। এর ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাময়িকভাবে মালয়েশিয়ার **পাম অয়েল** বয়কট করেছিল।

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ:

১. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা**

- **বাণিজ্যের পরিমাণ:** দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানে প্রায় **২০ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে। মালয়েশিয়া হলো আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলোর মধ্যে ভারতের **তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার**।

- **মুদ্রা বিনিময়:** ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে উভয় দেশ এখন **ভারতীয় রুপি (INR)**-এর মাধ্যমে বাণিজ্য শুরু করেছে। এর জন্য বিশেষ **রুপি ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট (SRVA)** ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **প্রধান পণ্য:**
  - **ভারতের আমদানি:** মূলত **পাম অয়েল** (ভারত মালয়েশিয়ার পাম তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা), খনিজ তেল এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি।
  - **ভারতের রপ্তানি:** খনিজ জ্বালানি, অ্যালুমিনিয়াম, মাংস এবং জৈব রাসায়নিক পণ্য।
- **বিনিয়োগ:** মালয়েশিয়া ভারতের অবকাঠামো (হাইওয়ে/এয়ারপোর্ট) এবং টেলিকমে বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে, ভারতের বড় আইটি কোম্পানি যেমন TCS, HCL, Infosys-এর বড় অফিস মালয়েশিয়ার সাইবারজায়ায় রয়েছে।

২. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা**

- **প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও তেজস (LCA Tejas):** মালয়েশিয়া ভারতের তৈরি **তেজস (Tejas)** যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী। ভারত মালয়েশিয়ায় একটি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত (MRO) কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাবও দিয়েছে।
- **যৌথ মহড়া:**
  - **হরিমাউ শক্তি (Harimau Shakti):** এটি দুই দেশের সেনাবাহিনীর একটি বার্ষিক মহড়া যা জঙ্গল যুদ্ধের ওপর গুরুত্ব দেয়।
  - **সমুদ্র লক্ষ্মণ (Samudra Laksamana):** ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এটি একটি নৌ-মহড়া।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা:** বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ **মালাক্কা প্রণালী** পাহারায় উভয় দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করে।

৩. **প্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতি**

- **সেমিকন্ডাক্টর:** মালয়েশিয়া চিপ বা সেমিকন্ডাক্টর পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রগণ্য। ভারত তার **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'**-এর সাথে মালয়েশিয়ার দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চায়।
- **ফিনটেক এবং ইউপিআই (UPI):** ভারতের সফল ডিজিটাল পেমেন্ট মাধ্যম UPI-কে মালয়েশিয়ার PayNet-এর সাথে যুক্ত করার কাজ চলছে, যাতে সহজেই টাকা লেনদেন করা যায়।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI):** ভারত তার 'ইন্ডিয়া স্ট্যাক' (আধার, ইউপিআই, ডিজিলকার) প্রযুক্তি দিয়ে মালয়েশিয়ার ডিজিটাল শাসন ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করছে।

৪. **জ্বালানি ও স্থায়িত্ব**

- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** মালয়েশিয়ার কোম্পানি 'পেট্রোনাস' ভারতের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বিনিয়োগ করছে।
- **কার্বন ক্যাপচার:** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় **ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার (DAC)** প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্বন শোষণ ও জ্বালানি তৈরিতেও দুই দেশ কাজ করছে।

৫. **সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক**

- **প্রবাসী ভারতীয়:** মালয়েশিয়ায় প্রায় **২৭ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত** মানুষ বাস করেন, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠী।
- **শিক্ষা:** পেশাদারদের যাতায়াত সহজ করতে দুই দেশ একে অপরের মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছে।
- **পর্যটন:** মালয়েশিয়া ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জন্য **ভিসা-মুক্ত প্রবেশের** সুযোগ দেওয়ায় পর্যটনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের তাৎপর্য

১. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব**

মালয়েশিয়া ভারতের **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'** (Act East Policy) এবং **'ইন্দো-প্যাসিফিক ভিশন'** (Indo-Pacific Vision)-এর একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ।

- **চোকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ** (Chokepoint Control): মালয়েশিয়া কৌশলগতভাবে **মালাক্কা প্রণালীর** (Strait of Malacca) তীরে অবস্থিত। ভারতের পূর্বদিকের বাণিজ্যের প্রায় **৬০%** এই পথ দিয়েই সম্পন্ন হয়। ভারতের জ্বালানি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা অপরিহার্য।
- **আসিয়ান সেন্ট্রালিটি** (ASEAN Centrality): আসিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে মালয়েশিয়ার সমর্থন ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে একটি **'রুলস-বেসড অর্ডার'** (Rules-based order) বা নীতি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
- **মাল্টিপোলারিটি** (Multipolarity): উভয় দেশই একটি **'মাল্টিপোলার এশিয়া'** বা বহুমুখী এশিয়ার স্বপ্নে বিশ্বাসী, যেখানে কোনো একক শক্তি (যেমন চীন) সামুদ্রিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না।

২. **অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়**

উভয় দেশের সম্পর্ক এখন **"পাম অয়েল থেকে মাইক্রোচিপস"** (From Palm Oil to Microchips)-এর দিকে মোড় নিচ্ছে।

- **সেমিকন্ডাক্টর ভ্যালু চেইন** (Semiconductor Value Chain): মালয়েশিয়া বিশ্বের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানিকারক দেশ, যারা বিশেষ করে **'প্যাকেজিং এবং টেস্টিং'** (Packaging and Testing)-এ পারদর্শী। ভারতের **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'** (India Semiconductor Mission)-এর সফলতার জন্য মালয়েশিয়ার এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জরুরি।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (DPI): ভারতের **ইউপিআই** (UPI) এবং ডিজিটাল শাসন মডেলের আন্তর্জাতিকীকরণের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটি অন্যতম প্রধান অংশীদার।
- **স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য** (Local Currency Trade): ভারতীয় রুপি (INR) এবং মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত-এ বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় দেশ বিশ্ববাজারের ডলারের ওঠানামা থেকে নিজেদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখছে। এটি **'গ্লোবাল সাউথ'** (Global South)-এর দেশগুলোর জন্য একটি আদর্শ মডেল।

৩. **প্রবাসী ভারতীয়: 'লিভিং ব্রিজ' বা জীবন্ত সেতু**

- **জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্ব:** প্রায় **২৯ লক্ষ** ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ (বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠী) মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **কৌশলগত মূলধন:** এই প্রবাসীরা ভারতের **'সফট পাওয়ার'** (Soft Power) হিসেবে কাজ করে, যা বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- **কল্যাণ ও গতিশীলতা: ওসিআই** (OCI) কার্ডের সুবিধা ৬ষ্ঠ প্রজন্ম পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং **ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের** মতো পদক্ষেপগুলো এই মানবিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

৪. **প্রতিরক্ষা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা**

- **নেট সিকিউরিটি প্রোভাইডার** (Net Security Provider): ভারত মালয়েশিয়াকে উন্নত সামরিক সরঞ্জাম যেমন—**তেজস** (LCA Tejas) এবং **ব্রহ্মোস** (BrahMos) ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ (MRO) সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে। এটি মালয়েশিয়াকে পশ্চিমা বা চীনা অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করবে।
- **সন্ত্রাসবাদ দমন:** উগ্রবাদ নির্মূল (Deradicalization) এবং গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে সামুদ্রিক সীমান্ত দিয়ে চরমপন্থীদের যাতায়াত রুখতে।
- ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলোর গভীর বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো (বাংলা অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণসহ):

ভারত ও মালয়েশিয়া সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অভ্যন্তরীণ বিষয়**

- অতীতের উত্তেজনা মূলত ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে মালয়েশিয়ার প্রকাশ্য অবস্থানের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল।
- বিশেষ করে **সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল** ও **সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০১৯** নিয়ে মালয়েশিয়ার কিছু রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মহলের প্রকাশ্য মন্তব্য **ভারত–মালয়েশিয়া সম্পর্ককে কূটনৈতিকভাবে সংবেদনশীল করে তোলে**।

২. **জাকির নায়েক ইস্যু**

- দুই দেশের মধ্যে বিরোধের একটি প্রধান কারণ হলো পলাতক ধর্মপ্রচারক **জাকির নায়েকের** (Zakir Naik) প্রত্যর্পণ। ভারত ক্রমাগত তাকে ফেরত পাঠানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, অন্যদিকে মালয়েশিয়া ঐতিহাসিকভাবে এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তারা "যথেষ্ট প্রমাণ" (Compelling evidence) এবং আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছে।

৩. **পাম অয়েল ডিপ্লোম্যাসি**

- বাণিজ্যকে অনেক সময় **'ইকোনমিক সিগন্যালিং'** (Economic signaling) বা অর্থনৈতিক সংকেত দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের পরিবর্তনশীল আমদানি শুল্ক এবং রাজনৈতিক বিবৃতির কারণে অতীতে মালয়েশিয়ার পাম অয়েলের ওপর অলিখিত বয়কট বাজারের অস্থিরতা (Market volatility) বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৪. **বাণিজ্য ঘাটতি**

- মালয়েশিয়ার সাথে ভারতের একটি দীর্ঘস্থায়ী **বাণিজ্য ঘাটতি** (Trade Deficit) রয়েছে। বাণিজ্য পরিবেশকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করতে বর্তমানে **'মাইসেকা'** (MICECA - India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement) এবং **'আইটিগা'** (AITIGA - ASEAN-India Trade in Goods Agreement) পর্যালোচনার প্রচেষ্টা চলছে।

৫. **দক্ষিণ চীন সাগর**

- যদিও উভয় দেশই একটি **'রুলস-বেসড অর্ডার'** (Rules-based order) এবং **'আনক্লস'** (UNCLOS - UN Convention on the Law of the Sea)-এর পক্ষে, তবুও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। চীনের অনুপ্রবেশের বিষয়ে মালয়েশিয়া একটি সতর্ক এবং আপোসহীন "আমলাতান্ত্রিক" (Bureaucratic) পদ্ধতি অনুসরণ করে; অন্যদিকে, ভারত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি সোচ্চার।

৬. **আসিয়ান সেন্ট্রালিটি**

- ভারতের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তার **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'** (Act East Policy)-কে মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যাতে আমেরিকা ও চীনের মধ্যকার প্রতিযোগিতার মাঝে ভারত কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে না পড়ে।

৭. **শ্রমিক কল্যাণ**

- মালয়েশিয়ায় কর্মরত ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং ভিসা সহজীকরণ (যেমন—**২০২৬ সোশ্যাল সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট**) সংক্রান্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা না হলে যেকোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনা তৈরি হতে পারে

ভবিষ্যৎ পথচলা

১. **"টেক-ব্রিজ" বা প্রযুক্তিগত সেতুবন্ধন শক্তিশালী করা**

- **সেমিকন্ডাক্টর ইন্টিগ্রেশন** (Semiconductor Integration): মালয়েশিয়ার সেমিকন্ডাক্টর খাতের ৫০ বছরের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে **'ব্যাক-এন্ড অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্টিং'** (OSAT - Outsourced Semiconductor Assembly and Test)-

কে ভারতের **'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন'**-এর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। একটি যৌথ সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply chain corridor) তৈরি করলে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমবে।

- **ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব (Digital Sovereignty):** ভারতের **ইউপিআই (UPI)** এবং মালয়েশিয়ার **পে-নেট (PayNet)**-এর সংহতি বাড়াতে হবে। এটি ৩ মিলিয়ন (৩০ লক্ষ) প্রবাসীর জন্য রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার বাণিজ্যে গতি আনবে।

২. অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া

- **মাইসেকা (MICECA) পর্যালোচনা:** ভারত-মালয়েশিয়া ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তির (MICECA) পর্যালোচনা দ্রুত শেষ করা জরুরি। এর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো এবং ই-কমার্স ও শ্রমিকদের যাতায়াতের (Labor mobility) মতো আধুনিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে।
- **স্থানীয় মুদ্রার প্রসার (Local Currency Expansion):** আরও বেশি ব্যাংককে **রুপি-রিঙ্গিত (INR-Ringgit)** লেনদেন পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে হবে। এটি বৈশ্বিক মুদ্রার অস্থিরতা (Currency volatility) থেকে সুরক্ষা দেবে।

৩. প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা

- **ক্রেতা থেকে অংশীদার (From Buyer to Partner):** দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কেবল সামরিক মহড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে **'সহ-উৎপাদন' (Co-production)**-এর দিকে নিয়ে যেতে হবে। মালয়েশিয়া যদি **তেজস (LCA Tejas)** যুদ্ধবিমান বেছে নেয়, তবে ভারতের উচিত মালয়েশিয়ায় একটি **এমআরও (MRO - Maintenance, Repair, and Overhaul)** হাব বা রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা, যা পুরো আসিয়ান (ASEAN) অঞ্চলকে পরিষেবা দেবে।
- **মালাক্কা প্রণালী সহযোগিতা (Strait of Malacca Cooperation):** ভারতের **'সাগর' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region)** উদ্যোগের অধীনে সমন্বিত টহল এবং **'হোয়াইট শিপিং' (White Shipping)** বা বাণিজ্যিক জাহাজের তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

৪. কূটনৈতিক সংবেদনশীলতা মোকাবিলা

- **সাইলেন্ট ডিপ্লোম্যাসি (Silent Diplomacy):** জাকির নায়েকের প্রত্যর্পণ বা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিবৃতির মতো স্পর্শকাতর ইস্যুগুলো সামলানোর জন্য একটি উচ্চ-পর্যায়ের বিশেষ ব্যবস্থা (Mechanism) তৈরি করা দরকার, যাতে এই বিষয়গুলো বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ককে ব্যাহত না করে।
- **আসিয়ান নেতৃত্ব (ASEAN Leadership):** আসিয়ান-এ মালয়েশিয়ার অগ্রণী ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে ভারত তার **'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'**-কে মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির (বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে) সাথে সমন্বয় করতে পারে।

উপসংহার

ভারত-মালয়েশিয়া অংশীদারিত্ব এখন প্রথাগত বাণিজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে একটি **উচ্চ-প্রযুক্তিগত মৈত্রীতে (High-tech alliance)** রূপান্তরিত হওয়ার পথে। **সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন**, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং **সবুজ জ্বালানি (Green Energy)**-কে একীভূত করার মাধ্যমে উভয় দেশ **গ্লোবাল সাউথ (Global South)**-কে নেতৃত্ব দিতে পারে। এই সম্মিলিত শক্তি একদিকে যেমন **মালাক্কা প্রণালীকে** সুরক্ষিত করবে, অন্যদিকে একটি স্থিতিশীল ও বহুমুখী ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তুলবে।

প্রশ্ন: *ভারত ও মালয়েশিয়ার সম্পর্কের কৌশলগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক (মানুষে-মানুষে যোগাযোগ) দিকগুলি আলোচনা করুন। এই সম্পর্কের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি কী কী এবং কীভাবে সেগুলি সমাধান করা যেতে পারে? (২৫০ শব্দ)*

2.2.3. ভারত-গ্রীস সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

ভারত ও গ্রীসের মধ্যকার সম্পর্ক এক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, যা একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ থেকে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' উন্নীত হয়েছে। যেহেতু উভয় দেশই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডোরগুলোর সংযোগস্থলে অবস্থিত, তাই উদীয়মান ইন্দো-প্যাসিফিক এবং ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা কাঠামোর জন্য তাদের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক সময়রেখা: ভারত-গ্রীস সম্পর্ক

১. প্রাচীন উৎস (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ - প্রথম শতাব্দী)

- **আলেকজান্ডার প্রভাব (৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ):** আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিয়াস নদীতে আগমন ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। তাঁর স্থাপিত 'সাত্রাপ' (প্রদেশ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্থায়ী গ্রীক উপস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।
- **মৌর্য কূটনীতি:** চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে সেলুকাস নিকেটর-এর পরাজয় প্রথম আন্তর্জাতিক বৈবাহিক জোট এবং 'মেগাস্থিনিস'-এর নিয়োগের পথ প্রশস্ত করে, যাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' (Indica) ভারতীয় ইতিহাসের একটি ভিত্তিগত আকর গ্রন্থ।
- **ইন্দো-গ্রীক সমন্বয়:** প্রথম মেনান্দার (মিলিন্দ)-এর শাসনামলে 'মিলিন্দ পানহা'-র জন্ম হয়, যা গ্রীক যুক্তিবিদ্যার সাথে বৌদ্ধ মতবাদের এক অনন্য দার্শনিক সংলাপ।

২. সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংমিশ্রণ

- **গান্ধার শিল্পকলা:** এটি একটি অনন্য গ্রীকো-বৌদ্ধ শিল্পশৈলী যেখানে ভারতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুকে গ্রীক শারীরিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল (যেমন—অ্যাপোলোর মতো কোঁকড়ানো চুল এবং পেশীবহুল অবয়বে বুদ্ধের চিত্রায়ণ)।
- **বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা:** জ্ঞানের আদান-প্রদান ছিল অত্যন্ত গভীর; ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা (গর্গ সংহিতা) এই ক্ষেত্রে গ্রীকদের পারদর্শিতাকে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছে।
- **দর্শন:** গ্রীসের 'স্টোইসিজম' (Stoicism) এবং ভারতের 'উপনিষদীয়' চিন্তাধারার সমান্তরাল বিকাশ গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময়ের ইঙ্গিত দেয়।

৩. বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক ব্যবধান

- **সামুদ্রিক রেশম পথ:** রোমান/বাইজেন্টাইন যুগে গ্রীকরা ভারতীয় মশলা এবং রেশমের প্রাথমিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত।
- **বণিক সম্প্রদায়:** ১৭৭০-এর দশকে গ্রীক ব্যবসায়ীরা কলকাতা ও ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। কলকাতার গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ (১৭৮০) সেই যুগের এক ঐতিহাসিক নিদর্শন।

৪. আধুনিক যুগ (১৯৪৭ - বর্তমান)

- **সম্পর্ক স্থাপন (১৯৫০):** স্বাধীনতার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **কৌশলগত নির্ভরযোগ্যতা (১৯৯৮):** ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার (পোখরান-২) নিন্দা জানাতে গ্রীস অস্বীকার করায় বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতার সময়ে এক গভীর বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়।
- **কূটনৈতিক বিনিময়:** আধুনিক যুগে 'পারস্পরিক বিনিময়ের' (quid pro quo) নীতি সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করেছে। ভারত 'সাইপ্রাস ইস্যুতে' গ্রীসকে সমর্থন করে, অন্যদিকে গ্রীস 'কাশ্মীর ইস্যুতে' ভারতের অবস্থান এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে ক্রমাগত সমর্থন দিয়ে আসছে।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ

১. **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা** ২০২৩ সালে উন্নীত হওয়া 'কৌশলগত অংশীদারিত্বের' সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হলো প্রতিরক্ষা।

- **যৌথ মহড়া:** 'এক্সারসাইজ ইনিয়োকোস' (বায়ুসেনা) এবং 'এক্সারসাইজ তরঙ্গ শক্তি'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ মহড়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ।
- **সামুদ্রিক নিরাপত্তা:** উভয় দেশই 'আনক্লস' (UNCLOS) এবং একটি 'মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলের পক্ষে সওয়াল করে। তারা ভূমধ্যসাগর এবং ভারত মহাসাগরে জলদস্যুতা বিরোধী অভিযানে একে অপরকে সহযোগিতা করে।
- **প্রতিরক্ষা শিল্প:** কেবল ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের 'যৌথ উৎপাদন' এবং হার্ডওয়্যার (বিশেষত যুদ্ধবিমান) রক্ষণাবেক্ষণের দিকে অগ্রসর হওয়া।

২. **সংযোগ ও পরিকাঠামো:** ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে গ্রীস হলো ভারতের জন্য 'ইউরোপের প্রবেশদ্বার'।

- **আইএমইসি (IMEC) করিডোর:** 'ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর' একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গ্রীসের 'পিরাউস বন্দর' (Port of Piraeus) ভারতীয় পণ্যের জন্য ইউরোপের প্রধান প্রবেশপথ হওয়ার প্রবল দাবিদার।
- **অসামরিক বিমান চলাচল:** পর্যটন এবং ব্যবসায়িক বিনিময় বৃদ্ধিতে সরাসরি বিমান সংযোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

৩. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক**

- **বাণিজ্যিক লক্ষ্যমাত্রা:** ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে (বর্তমানে যা প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার)।
- **মূল ক্ষেত্রসমূহ:**
  - **শিপিং:** বিশ্বব্যাপী শিপিং ব্যবসায় গ্রীক দক্ষতার ব্যবহার (বিশ্বের বাণিজ্যিক জাহাজের প্রায় ২০% গ্রীসের মালিকানাধীন)।
  - **কৃষি:** খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কোল্ড স্টোরেজ ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ।
  - **পরিকাঠামো:** ভারতীয় সংস্থাগুলি (যেমন GMR) গ্রীসের প্রধান পরিকাঠামো নির্মাণে সক্রিয়, যেমন—ক্রিটের কাসটেলি বিমানবন্দর।

৪. **শক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন**

- **আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ISA):** গ্রীস ২০২১ সালে ISA-তে যোগদান করেছে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** শিপিংয়ের জন্য পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে উভয় দেশ।

৫. **অভিবাসন ও গতিশীলতা**

- **এমএমপিএ (MMPA):** দক্ষ পেশাদার, ছাত্র এবং শ্রমিকদের চলাচল সহজতর করতে এবং অবৈধ অভিবাসন রুখতে একটি 'অভিবাসন ও গতিশীলতা অংশীদারিত্ব চুক্তি' চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৬. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি**

- **মহাকাশ সহযোগিতা:** স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং এবং সামুদ্রিক নজরদারির জন্য 'ইসরো' (ISRO) এবং 'হেলেনিক স্পেস সেন্টার'-এর মধ্যে আলোচনা চলছে।
- **ডিজিটাল অর্থনীতি:** ইউপিআই (UPI) সংযোগ এবং ফিনটেক (FinTech) ক্ষেত্রে সহযোগিতা, যাতে ভারতীয় পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের লেনদেন সহজ হয়।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের গুরুত্ব

১. **ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব: 'পাল্টা-অক্ষ' (Counter-Axis) কৌশল**

- **তুরস্ক ফ্যাক্টর:** পাকিস্তান ও আজারবাইজানকে নিয়ে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান 'ত্রিপাক্ষিক অক্ষ' (কাশ্মীর ও নাগর্নো-কারাবাখ ইস্যুতে একে অপরকে সমর্থন) ভারতকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নির্ভরযোগ্য অংশীদার খুঁজতে বাধ্য করেছে। তুরস্কের সাথে নিজস্ব বিরোধ থাকায় গ্রীস ভারতের জন্য এক স্বাভাবিক কৌশলগত মিত্র।

- **মূল ইস্যুতে সমর্থন:** কাশ্মীর ইস্যুতে গ্রীস ভারতের অটল সমর্থক, যার বিনিময়ে ভারত সাইপ্রাস ইস্যুতে গ্রীসকে সমর্থন দেয়। এই 'সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক' পারস্পরিক সমর্থন তাদের কূটনীতির মূল ভিত্তি।

২. **ভূ-অর্থনৈতিক গুরুত্ব: ইউরোপের প্রবেশদ্বার**

- **আইএমইসি টার্মিনাল:** ইউরোপীয় সিঙ্গেল মার্কেটে স্থিতিশীল প্রবেশের জন্য ভারতের গ্রীসের পিরাউস বন্দর প্রয়োজন, যা ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত যৌক্তিক।
- **বিআরআই (BRI)-এর বিকল্প:** গ্রীসের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ভারত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'-এর একটি বিকল্প তৈরি করতে চায়।

৩. **সামুদ্রিক ও নিরাপত্তা গুরুত্ব**

- **ভূমধ্যসাগরীয় উপস্থিতি:** ভারতের নৌ-শক্তির প্রসারের সাথে সাথে গ্রীস ভূমধ্যসাগরে একটি 'হোম বেস' প্রদান করে। যৌথ মহড়ার মাধ্যমে ভারতীয় নৌ ও বায়ুসেনা ভারত মহাসাগরের বাইরেও শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয়।
- **আনক্লস (UNCLOS)-এর প্রতি আনুগত্য:** উভয় দেশই আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনের পক্ষে সোচ্চার, যা চীন বা তুরস্কের মতো আগ্রাসী প্রতিবেশীদের একতরফা আঞ্চলিক দাবি মোকাবিলায় সহায়ক।

৪. **শক্তি ও স্থায়িত্বের গুরুত্ব**

- **গ্রিন শিপিং:** বিশ্বের ২০% বাণিজ্যিক জাহাজের মালিক গ্রীস। শিপিং রুটগুলোতে কার্বন নিঃসরণ কমাতে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **জ্বালানি ট্রানজিট:** গ্রীস ইউরোপের জ্বালানি হাবে (EastMed পাইপলাইনের মাধ্যমে) পরিণত হচ্ছে, যা ভারতকে ভূমধ্যসাগরীয় জ্বালানি রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয়।

৫. **জনতাত্ত্বিক ও শ্রম গুরুত্ব**

- **অভিবাসন ব্যবস্থাপনা:** গ্রীসে কৃষি ও নির্মাণ খাতে শ্রমিকের অভাব রয়েছে, অন্যদিকে ভারতে উদ্বৃত্ত দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। অভিবাসন অংশীদারিত্ব উভয় দেশের অর্থনীতিকে উপকৃত করবে।

ভারত-গ্রীস সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **গ্রীসে 'চীন ফ্যাক্টর'**

- **পিরাউস বন্দর:** পিরাউস বন্দরের অধিকাংশ শেয়ার (৬৭%) চীনের রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'কসকো' (COSCO)-র হাতে থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **কৌশলগত সংঘাত:** যেহেতু পিরাউস আইএমইসি-র প্রধান টার্মিনাল হওয়ার কথা, তাই এই পরিকাঠামোয় চীনের নিয়ন্ত্রণ ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

২. **আঞ্চলিক অস্থিরতা ও আইএমইসি বাস্তবায়ন**

- **মধ্যপ্রাচ্য সংকট:** আইএমইসি করিডোর পশ্চিম এশিয়ার স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান ইজরায়েল-হামাস-হিজবুল্লাহ সংঘর্ষ এই করিডোরের রেল ও সমুদ্র পথের কার্যকরতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

৩. **তুরস্ক-পাকিস্তান-আজারবাইজান অক্ষ**

- **নিরাপত্তা চাপ:** তুরস্কের আগ্রাসী অবস্থান এবং পাকিস্তানের সাথে তাদের সামরিক জোট ভারত ও গ্রীসকে একটি রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে।

৪. **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বাধা**

- **স্বল্প দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য:** সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য এখনও মাত্র ২ বিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ, যা ভারতের অন্যান্য ইউরোপীয় অংশীদারদের তুলনায় অনেক কম।

- **নিয়ন্ত্রক বাধা:** ইইউ-এর কঠোর স্যানিটারি ও ফাইটোপ্যাথলজিকাল (SPS) মানদণ্ড ভারতীয় কৃষি ও ফার্মাসিউটিক্যাল রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৫. **প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত ব্যয়**

- **পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের উচ্চ ব্যয়:** 'ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার' (DAC) এবং গ্রিন হাইড্রোজেনের মতো প্রযুক্তিগুলো বর্তমানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এগুলোর জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ (Way Forward)

- **পরিকাঠামোর বৈচিত্র্যকরণ:** পিরাউস বন্দরে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় ভারতকে বিকল্প হিসেবে থেসালোনিকি বা আলেকজান্দ্রোপোলিস-এর মতো গ্রীক বন্দরগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- **আইএমইসি-র কার্যকরতা:** করিডোরটি দ্রুত চালুর জন্য ডিজিটাল ও ভৌত সমন্বয় বাড়াতে ভারতকে কূটনৈতিক নেতৃত্ব দিতে হবে।
- **প্রতিরক্ষা শিল্প একীকরণ:** যৌথ মহড়া থেকে সরে এসে 'যৌথ উৎপাদন' এবং গ্রীসে ভারতীয় সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ (MRO) হাব তৈরির দিকে নজর দিতে হবে।
- **সবুজ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব:** সৌর জোটকে (ISA) কাজে লাগিয়ে DAC প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রীক জাহাজগুলোকে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির আওতায় আনতে হবে।
- **গতিশীলতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান:** এমএমপিএ (MMPA) দ্রুত কার্যকর করে দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের জন্য গ্রীসের বাজারে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।
- **সফট পাওয়ারের সমন্বয়:** অভিন্ন গান্ধার শিল্পকলা এবং যোগচর্চাকে কেন্দ্র করে পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি করা।

উপসংহার ভারত-গ্রীস অংশীদারিত্ব হলো **'বিকশিত ভারত @২০৪৭'**-এর একটি ভিত্তিপ্রস্তর, যা ভূমধ্যসাগরকে ভারতের আকাঙ্ক্ষার এক 'সামুদ্রিক সেতুতে' রূপান্তরিত করবে। আইএমইসি-র সাথে গ্রীক লজিস্টিকস এবং গ্রিন হাইড্রোজেন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে উভয় দেশ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি রূপান্তরের নেতৃত্ব দিতে পারে, যা ভারতকে এক 'বিশ্ব বন্ধু' এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন: *ভারত-গ্রীস সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে, এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিগুলো গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করুন এবং ভারতের ইউরোপীয় ও ইন্দো-প্যাসিফিক প্রসারের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বের কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ২৫০ শব্দ*

2.2.4. ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

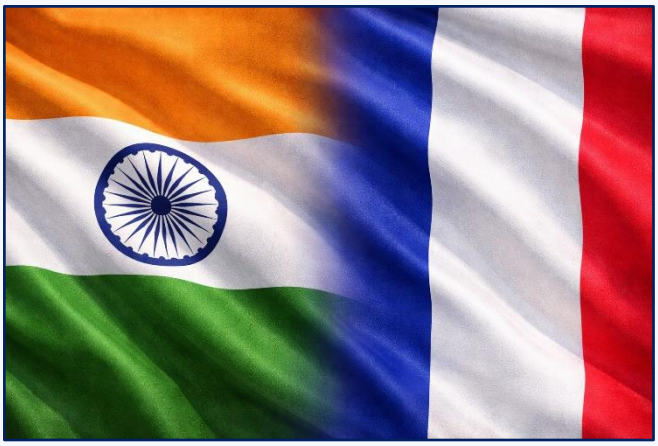

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে "Special Global Strategic Partnership" (বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব)-এ উন্নীত করা হয়েছে। এটি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের এক নতুন যুগের সূচনা।

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের ঐতিহাসিক পটভূমি

১. **স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রারম্ভিক পর্যায় (১৯৪৭-১৯৬২)**

- **শান্তিপূর্ণ উপনিবেশ ত্যাগ:** গোয়ায় পর্তুগিজদের মতো নয়, **ফ্রান্স** কূটনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের ভারতের অন্তর্গত অঞ্চলগুলি (**পুদুচেরি, কারাইক্যাল, মাহে এবং ইয়ানাম**)

হস্তান্তর করার পথ বেছে নেয়। **চুক্তিপত্র (Treaty of Cession)** ১৯৫৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৬২ সালে তা অনুমোদিত হয়।

- **প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সূচনা:** ১৯৫৩ সালেই সহযোগিতা শুরু হয়, যখন **ডাসো আওরাগাঁ (Dassault Ouragan – তুফানি)** বিমান ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

২. **শীতল যুদ্ধের যুগ: "বিশ্বস্ত বিকল্প"**

- ভারত যখন **অ-জোট নিরপেক্ষ নীতি (Non-Alignment)** অনুসরণ করছিল, তখন **ফ্রান্স** একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়, যারা যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো "শর্তসাপেক্ষ" সহযোগিতা আরোপ করেনি।
- **মহাকাশ সহযোগিতা (১৯৬০-৭০-এর দশক):** ফ্রান্স **ইসরো (ISRO)**-কে **শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র** প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ রকেট ইঞ্জিন প্রযুক্তি ভাগ করে। **ভাইকিং (Viking) ইঞ্জিন** ভারতের **বিকাস (Vikas) ইঞ্জিন**-এর ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **পারমাণবিক সহায়তা (১৯৮০-এর দশক):** ১৯৮৪ সালে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের অভ্যন্তরীণ আইনের কারণে **তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র**-এর জন্য জ্বালানি সরবরাহ থেকে সরে দাঁড়ায়। তখন **ফ্রান্স** এগিয়ে এসে জ্বালানি সরবরাহ করে, যা ভারতের **জ্বালানি নিরাপত্তা** নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. **১৯৯৮ সালের মোড় পরিবর্তন (কৌশলগত অংশীদারিত্ব)**

- **প্রথম কৌশলগত অংশীদার:** ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে **ফ্রান্স** ভারতের সঙ্গে **কৌশলগত অংশীদারিত্ব (Strategic Partnership)** স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ হয়।
- **পোখরান-II-এর পর সমর্থন:** ১৯৯৮ সালে ভারতের পারমাণবিক পরীক্ষার পর যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও, **ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি**। বরং তারা উচ্চপর্যায়ের **"কৌশলগত সংলাপ" (Strategic Dialogue)** শুরু করে। এর ফলে নয়াদিল্লির কাছে ফ্রান্স দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাস অর্জন করে।

৪. **২০০০-এর পরবর্তী সময়: বৈশ্বিক সমন্বয়ের গভীরতা বৃদ্ধি**

- **নাগরিক পারমাণবিক চুক্তি (২০০৮):** NSG **ছাড়পত্র (waiver)** পাওয়ার পর, ফ্রান্সই ছিল প্রথম দেশ যারা ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নাগরিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে।
- **জলবায়ু নেতৃত্ব (২০১৫):** প্যারিসে COP21 **সম্মেলন**-এ যৌথভাবে **আন্তর্জাতিক সৌর জোট (International Solar Alliance – ISA)** চালু করা হয়। এর মাধ্যমে সম্পর্ক কেবল দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে **বৈশ্বিক নেতৃত্বের স্তরে** উন্নীত হয়।
- **ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল (২০১৮): "ভারত-ফ্রান্স ভারত মহাসাগর অঞ্চলে যৌথ কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি"** গ্রহণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স ভারতের প্রধান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহযোগিতার প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. **নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব স্তম্ভ**

এই স্তম্ভটির মূল লক্ষ্য হলো ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। বর্তমানে সম্পর্কের ধরন **"ক্রেতা-বিক্রেতা"** থেকে পরিবর্তিত হয়ে **"যৌথ উন্নয়ন ও যৌথ উৎপাদন"**-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

- **প্রতিরক্ষা শিল্প রোডম্যাপ (২০২৬-২০৩৬):** একটি ১০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য হলো ১০০% প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) নিশ্চিত করা।
  - **আকাশপথ:** ভারতের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান (AMCA)-এর জন্য ১১০ কিলোনিউটন ইঞ্জিনের যৌথ উন্নয়নে Safran-HAL অংশীদারিত্ব; কর্ণাটকের ভেমাগালে H125 **হেলিকপ্টার অ্যাসেম্বলি লাইন** (Tata-Airbus যৌথ উদ্যোগ) স্থাপন—যা ভারতের প্রথম বেসরকারি হেলিকপ্টার কারখানা।
  - **নৌপথ:** ভারতীয় নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে ২৬টি Rafale-M যুদ্ধবিমান এবং ৩টি অতিরিক্ত Scorpene শ্রেণির সাবমেরিন ক্রয়ের চুক্তি।

- **মিসাইল:** HAMMER নামক আকাশ-থেকে-ভূমি মিসাইল ভারতে তৈরির জন্য BEL-Safran যৌথ উদ্যোগ।
- **মহাকাশ:** জলবায়ু পর্যবেক্ষণের জন্য TRISHNA মিশন এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নজরদারির জন্য স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ব্যবস্থা।
- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy):** দুই দেশই আমেরিকা-চীন দ্বিমেরু রাজনীতির বাইরে একটি "তৃতীয় বিকল্প" হিসেবে কাজ করে।

২. **প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন স্তম্ভ (নতুন ডিজিটাল যুগ)**

২০২৬ সালকে **"ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বছর"** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI):** ২০২৬ সালে নয়াদিল্লিতে **'AI Impact Summit'** আয়োজন; যেখানে প্রধান লক্ষ্য হলো "জনকল্যাণে এআই" (AI for Global Good)।
- **স্বাস্থ্য খাতে এআই:** উন্নত রোগ নির্ণয় পদ্ধতির জন্য AIIMS **নয়াদিল্লিতে** ইন্দো-ফ্রেঞ্চ সেন্টার স্থাপন।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামো:** ফ্রান্সে UPI পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রসার এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে যুক্ত করতে Indo-French Innovation Network চালু।
- **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals):** লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং রেয়ার আর্থ মেটালের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ করতে ২০২৬ সালের যৌথ ঘোষণা, যা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রূপান্তরের জন্য জরুরি।

৩. **পৃথিবী ও বৈশ্বিক সমস্যা স্তম্ভ**

- **সিভিল নিউক্লিয়ার ২.০:** জয়তাপুর প্রকল্পের পাশাপাশি এখন Small Modular Reactors (SMRs) এবং অ্যাডভান্সড মডুলার রিঅ্যাক্টর তৈরির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।
- **আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ISA):** বিশ্বজুড়ে সৌরশক্তির প্রসারে দুই দেশের যৌথ নেতৃত্ব।
- **ব্লু ইকোনমি:** টেকসই মৎস্য চাষ এবং **"ইকো-পোর্ট"** বা পরিবেশবান্ধব বন্দর পরিকাঠামো তৈরির রোডম্যাপ।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** ভারতকে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের বৈশ্বিক হাবে পরিণত করতে কৌশলগত অংশীদারিত্ব।

৪. **জনগণের জন্য অংশীদারিত্ব**

- **শিক্ষা:** ২০৩০ সালের মধ্যে **৩০,০০০ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে** ফ্রান্সে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা।
- **যাতায়াত সুবিধা (Mobility):** ২০২৬ সালে দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি (DTAA) সংশোধন করা হয়েছে যাতে পেশাদারদের যাতায়াত ও কর্মসংস্থান সহজ হয়।
- **সংস্কৃতি:** নয়াদিল্লিতে ভারতের **জাতীয় জাদুঘর** প্রকল্পে ফ্রান্স একটি প্রধান অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

৫. **ভূ-রাজনীতি: ইন্দো-প্যাসিফিক ও বহুমুখিতা**

- **সম্মেলনের সমন্বয়:** ২০২৬ সালে ফ্রান্স (জি-৭ সভাপতি) এবং ভারত (ব্রিকস সভাপতি) বৈশ্বিক ঋণ, জলবায়ু অর্থায়ন এবং এআই পরিচালনার বিষয়ে একযোগে কাজ করছে।
- **ত্রিমুখী সহযোগিতা:** প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ দেশগুলোকে সহায়তা করতে **"Indo-Pacific Triangular Development Fund"** গঠন।
- **IMEC করিডোর:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে একটি শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি।

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **পারমাণবিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত অচলাবস্থা (জয়তাপুর)**

- **সমস্যা:** ২০০৮ সালে প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও ১০,৩৮০ মেগাওয়াট সম্পন্ন **জয়তাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প** এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

- **বাধা:** ভারতের **বেসামরিক পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইন (২০১০)** অনুযায়ী দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরঞ্জামের সরবরাহকারী সংস্থা দায়ী থাকে। ফরাসি কোম্পানি EDF এই আর্থিক ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। ফলে বর্তমানে বড় প্রকল্পের বদলে ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টরের (SMR) দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

২. **বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা**

- **সমস্যা:** দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার) জার্মানি বা আমেরিকার তুলনায় অনেক কম।
- **বাধা:** ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মধ্যে কোনো **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** নেই। এছাড়া শ্রমমান, পরিবেশগত নিয়ম এবং ডেটা প্রাইভেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনি কড়াকড়ির কারণে বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৩. **বৈশ্বিক দ্বন্দ্বে কৌশলগত "অসামঞ্জস্যতা"**

- **রাশিয়া-ইউক্রেন:** ফ্রান্স ন্যাটো (NATO)-র সদস্য হিসেবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলেও ভারত একটি নিরপেক্ষ বা সূক্ষ্ম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখে। এর ফলে মাঝে মাঝে যৌথ বিবৃতিতে কূটনৈতিক অস্বস্তি তৈরি হয়।
- **চীন বিতর্ক:** চীনে ফ্রান্সের বিশাল অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। ভারত অনেক সময় উদ্বিগ্ন থাকে যে ফ্রান্সের **"ইউরোপীয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন"** নীতি হয়তো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের আগ্রাসনের প্রতি কিছুটা নমনীয় হতে পারে।

৪. **প্রযুক্তি হস্তান্তরের (ToT) প্রতিবন্ধকতা**

- **সমস্যা:** "মেক ইন ইন্ডিয়া" রোডম্যাপ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও প্রযুক্তির গভীরতা হস্তান্তরের বিষয়টি এখনো আলোচনার পর্যায়ে।
- **বাধা:** ফরাসি কোম্পানিগুলো প্রায়ই তাদের অত্যন্ত গোপনীয় বা "ব্ল্যাক-বক্স" প্রযুক্তি (যেমন জেট ইঞ্জিনের সোর্স কোড) শেয়ার করতে চায় না। শুধুমাত্র যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানো (Assembly) থেকে সম্পূর্ণ মেধা স্বত্ব (Intellectual Property) শেয়ার করার প্রক্রিয়াটি বেশ ধীরগতিসম্পন্ন।

৫. **আঞ্চলিক অস্থিরতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা**

- **IMEC চ্যালেঞ্জ:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরটি পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা (যেমন লোহিত সাগরের সংকট) এবং নিরাপত্তার ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এটি প্রকল্পের বাণিজ্যিক সফলতাকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

১. **কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক সমন্বয়**

- **IMEC-কে কার্যকর করা:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে (IMEC) একটি স্বপ্ন থেকে বাস্তব ও নিরাপদ বাণিজ্যিক পথে রূপান্তর করতে ২০২৬ সালের প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **UNSC ও বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা:** রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য ফ্রান্সের উচিত যৌথ তৎপরতা বাড়ানো। একবিংশ শতাব্দীর বহুমুখী বৈশ্বিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করতে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ লাভের দাবিতে ফ্রান্সকে আরও সক্রিয় ও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে।
- **আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা:** ২০২৬ সালের **নাইরোবি সম্মেলন** (আফ্রিকা-ফ্রান্স-ভারত)-কে কাজে লাগিয়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং সৌরবিদ্যুৎ খাতে যৌথ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

২. **প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব**

- **ক্রয় প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে:** ২০২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Joint Advanced Technology Development Group-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম শুধু কেনা নয়, বরং যৌথ উন্নয়নে পুরোপুরি মনোনিবেশ করা। এর মাধ্যমে জটিল অ্যারো-ইঞ্জিন (Safran-HAL) এবং আন্ডারওয়াটার ড্রোন বা জলের নিচের ড্রোনের ১০০% মেধা স্বত্ব বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি (IP) শেয়ারিং নিশ্চিত করা।
- **রপ্তানি হাব (Export Hub):** কর্ণাটকে সদ্য উদ্বোধন হওয়া H125 **হেলিকপ্টার অ্যাসেম্বলি লাইন**-কে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে ফরাসি প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা সরঞ্জামগুলো ভারতে তৈরি করে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রপ্তানির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করা।

৩. **জ্বালানি ও পারমাণবিক জট নিরসন**

- **SMR-কে অগ্রাধিকার:** জয়তাপুর প্রকল্পের আইনি জটিলতার কথা মাথায় রেখে ভারত-ফ্রান্স SMR (Small Modular Reactor) অংশীদারিত্বকে দ্রুত এগিয়ে নেওয়া। এই ছোট রিয়্যাক্টরগুলো কারখানায় তৈরি করা যায়, এতে ঝুঁকি কম এবং অর্থায়ন সহজ। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতের ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এটি একটি বাস্তবসম্মত পথ।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেম:** ভারতের গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনকে ফ্রান্সের শিল্প চাহিদার সাথে যুক্ত করতে একটি অভিন্ন মানদণ্ড ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪. **ডিজিটাল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব**

- **AI-এর গণতান্ত্রিকীকরণ:** ২০২৬ সালের 'AI Impact Summit'-এর ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের "ডিজিটাল বিভাজন" দূর করা। ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি এআই (AI) টুলগুলো যেন 'ওপেন সোর্স' হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- **DPI কূটনীতি:** ফ্রান্সে (আইফেল টাওয়ার ও গ্যালারী লাফায়েত) UPI-এর সাফল্যকে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে ভারত-ফ্রান্সের ডিজিটাল সহযোগিতাকে বৈশ্বিক ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের (DPI) একটি আদর্শ মডেল হিসেবে তুলে ধরা।

উপসংহার

"ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব এখন আর কেবল একে অপরের স্বার্থ রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন **বৈশ্বিক সার্বভৌমত্বের যৌথ রূপরেখা** (Co-designing Global Sovereignty) তৈরির একটি মাধ্যম। SMR-এর মাধ্যমে পারমাণবিক দায়বদ্ধতার জটিলতা সমাধান করে এবং Triangular Development Fund-এর মাধ্যমে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলকে সমন্বিত করে, ভারত ও ফ্রান্স এই অস্থির বিশ্বে দুটি 'স্থিতিশীল মেরু' হিসেবে কাজ করতে পারে।"

প্রশ্ন: *"ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব একটি ক্রেতা-বিক্রেতা প্রতিরক্ষা সম্পর্ক থেকে একটি ব্যাপক প্রযুক্তি-কৌশলগত (techno-strategic) সহযোগিতায় বিবর্তিত হয়েছে।" সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

2.2.5. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির অস্পষ্টতা

প্রেক্ষাপট:

- ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত **অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি** দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
- এর মূল লক্ষ্য হলো সাম্প্রতিক **বাণিজ্যিক উত্তেজনা** প্রশমিত করা এবং বৃহত্তর পরিসরে বাণিজ্য আলোচনা পুনরায় শুরু করা।
- তবে **শুল্ক ছাড়**, কৃষিক্ষেত্রে সুরক্ষা কবচ, **নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স (NTBs)** এবং নীতি নির্ধারণের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এখনো উদ্বেগ রয়ে গেছে।

পটভূমি:

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের পর, দুই দেশ একটি **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির** লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছে। ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের **উচ্চ শুল্ক আরোপ** এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের ফলে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই **অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির** মূল লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কিছু শুল্ক হ্রাস করা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সমাধান করা।

চুক্তিটির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ভারতের নির্দিষ্ট কিছু রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের **শুল্ক হ্রাস**।
- যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্প ও কৃষি পণ্যের ওপর **শুল্ক এবং নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স** (NTBs) কমানোর বিষয়ে ভারতের অঙ্গীকার।
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের **জ্বালানি ও বিমান** কেনার পরিমাণ বাড়ানোর ইঙ্গিত।

এই সমঝোতাকে একটি বৃহত্তর ও **পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য চুক্তির** পথে একটি 'বিশ্বাস গড়ার পদক্ষেপ' হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির গুরুত্ব:

১. **দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক কাঠামোর শক্তিশালীকরণ:** এই চুক্তি ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক স্তম্ভকে আরও সুদৃঢ় করবে। এটি প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, **সেমিকন্ডাক্টর** এবং গুরুত্বপূর্ণ **সরবরাহ শৃঙ্খল** (Supply Chain) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও পূর্ণতা দেবে।

২. **সরবরাহ শৃঙ্খলের বৈচিত্র্যকরণ:** বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠনের এই সময়ে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে এবং নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর **অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা** কমাতে সাহায্য করবে।

৩. **রপ্তানি-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। সেখানে বাজারের সহজলভ্যতা বাড়লে **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**-র মতো উদ্যোগের অধীনে ভারতের উৎপাদন শিল্প প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সহজ হবে।

৪. **ভূ-রাজনৈতিক বার্তা:** জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতির মধ্যেও এই চুক্তিটি বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর সাথে ভারতের সক্রিয় বাণিজ্যিক সম্পৃক্ততার একটি শক্তিশালী **ভূ-রাজনৈতিক সংকেত** দেয়।

৫. **পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) পূর্বসূরি:** এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাটি ভবিষ্যতে আরও গভীর **বাণিজ্যিক উদারীকরণের** একটি পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করতে পারে।

ভারতের জন্য সম্ভাব্য ইতিবাচক দিকসমূহ

১. **বাজারের উন্নত সুযোগ:** যুক্তরাষ্ট্রের **শুল্ক হ্রাস** ভারতের শ্রমনিবিড় খাতগুলো, যেমন— **বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে** ব্যাপকভাবে উপকৃত করতে পারে। মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার সহজ হলে রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি **কর্মসংস্থানের সুযোগ** তৈরি হবে।

২. **বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা:** এই চুক্তি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এর ফলে রপ্তানিকারক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি **পূর্বাভাসযোগ্য** (Predictability) বাণিজ্যিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

৩. **কৌশলগত অর্থনৈতিক ঐক্য:** ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক **কৌশলগত অংশীদারিত্বকে** আরও সুদৃঢ় করবে। এটি প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং **সরবরাহ শৃঙ্খল** (Supply Chains) ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অস্পষ্টতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ:

১. **কৃষিক্ষেত্রে সুরক্ষা কবচ:** ভারতের কৃষিখাত অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ার কারণগুলো হলো:
   - ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আধিপত্য।
   - পণ্যের **মূল্য স্থিতিশীলতা** এবং জীবনজীবিকার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ।
   - অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিতে দানাশস্যের মতো সংবেদনশীল ফসলের জন্য **শুল্ক সুরক্ষার** বিষয়টি স্পষ্ট নয়, যা আগের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে (FTAs) বজায় ছিল।
   - স্পষ্টতার অভাবে মার্কিন কৃষি প্রতিযোগিতার মুখে পড়ার অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

২. **নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার্স (NTBs) এবং জিএম (GM) আমদানি:**

- জেনেটিক্যালি মডিফাইড বা **জিএম (GM) খাদ্য** আমদানিতে ভারতের বিধিনিষেধকে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যিক বাধা হিসেবে গণ্য করে আসছে।
- চুক্তিতে "দীর্ঘদিনের উদ্বেগ" নিরসনের কথা বলা হলেও, জিএম পণ্যের বিষয়ে ভারতের **নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো (Regulatory Framework)** পরিবর্তন করা হবে কি না, তা এখনো অস্পষ্ট।

৩. **শুল্কের অসমতা:**

- ভারত তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক পণ্যের ওপর শুল্ক এবং অ-শুল্ক বাধা (NTBs) কমাতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।
- অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কিছু শর্তে পুনরায় শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা ধরে রাখছে।
- যেহেতু মার্কিন শুল্ক এমনিতেই কম, তাই ভারতের পক্ষ থেকে বড় ধরনের **শুল্ক হ্রাস** চুক্তির ন্যায্যতা ও আনুপাতিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

৪. **শর্তাধীন বাণিজ্যিক চাপ:**

- বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত (যেমন—নির্দিষ্ট দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি) নিয়ন্ত্রণ করতে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় শুল্ক আরোপের চাপ দিতে পারে।
- যদি বাণিজ্যকে **নীতি নির্ধারণী স্বায়ত্তশাসন (Policy Autonomy)** প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা উদ্বেগের বিষয়।

৫. **কৃষক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব:** ভারতের কর্মশক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষিনির্ভর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমাত্রায় যান্ত্রিক ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের সাথে প্রতিযোগিতার ফলে:

- দেশীয় বাজারে পণ্যের দাম কমে যেতে পারে।
- **আয়ের স্থিতিশীলতা** ব্যাহত হতে পারে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংকট বাড়তে পারে।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি দিক:** যুক্তরাষ্ট্রের কিছু শুল্ক ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দেশেই আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এই ধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপের বিপরীতে ছাড় দেওয়া ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা তৈরি করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন:

- বাণিজ্যিক আলোচনায় **আইনি সতর্কতা**।
- অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং **সংসদীয় তদারকি**।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

১. **সংবেদনশীল খাতের জন্য সুস্পষ্ট সুরক্ষা:** ভারতকে অবশ্যই শুল্ক কোটা (Tariff Rate Quotas), সুরক্ষা কবচ (Safeguard Clauses) এবং পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবেদনশীল কৃষি পণ্যগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

২. **অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কেবল শুল্ক সুরক্ষার ওপর নির্ভর না করে ভারতকে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এজন্য ভ্যালু চেইন, উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও লজিস্টিকসে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

৩. **স্বচ্ছ আলোচনা:** বাণিজ্যিক অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সুশৃঙ্খল **সংসদীয় তদারকি** নিশ্চিত করলে দায়বদ্ধতা ও জনবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

৪. **নিয়ন্ত্রণমূলক স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা:** খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়ম মেনে নিজস্ব আইন ও নিয়ম প্রয়োগের অধিকার ভারতকে বজায় রাখতে হবে।

৫. **বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্যকরণ:** কোনো নির্দিষ্ট বাজারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে ইইউ (EU), আসিয়ান (ASEAN) এবং আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করতে হবে, যা ভারতের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়াবে।

৬. **কৌশলগত সমন্বয়:** বাণিজ্য নীতিকে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক লক্ষ্য যেমন— **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**, **'আত্মনির্ভর ভারত'** এবং টেকসই কৃষির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উপসংহার:

ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিটি বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে স্থিতিশীল করলেও কৃষিখাতের সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণমূলক স্বায়ত্তশাসন এবং ভারসাম্যপূর্ণ ছাড়ের বিষয়ে কিছু উদ্বেগ রয়ে গেছে। ভারতকে অবশ্যই স্বচ্ছ আলোচনা নিশ্চিত করতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক ও কৌশলগত স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংবেদনশীল খাতগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

প্রশ্ন: *ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য সুফল এবং উদ্বেগজনক দিকগুলো পর্যালোচনা করুন। ভারত কীভাবে বাণিজ্যিক উদারীকরণ এবং সংবেদনশীল বা দুর্বল খাতগুলোর সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে? (১৫০ শব্দ)*

2.2.6. বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির বিবর্তনীয় রূপ

প্রেক্ষাপট

বিশ্ব বাণিজ্য বর্তমানে **WTO-চালিত বহুপাক্ষিকতা** থেকে সরে গিয়ে **দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** এবং সাম্রাজ্যবাদী **পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির (ART)** দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে বৈষম্যহীন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেয়ে একতরফা স্বার্থ এবং ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির তিনটি ধরন

১. বহুপাক্ষিকতা (WTO যুগ)

এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থার **"স্বর্ণমান"** হিসেবে পরিচিত, যা **বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)** এবং **শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি (GATT)** দ্বারা পরিচালিত হয়।

- **মূল নীতি: মোস্ট-ফেভারড-নেশন (MFN)** নিয়ম। অর্থাৎ, একটি দেশ যদি অন্য কোনো সদস্য দেশকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেয় (যেমন ৫% শুল্ক হ্রাস), তবে সেই সুবিধা অন্য সব (১৬০টিরও বেশি) সদস্য দেশকে তাৎক্ষণিকভাবে দিতে হবে।
- **লক্ষ্য:** একটি বৈষম্যহীন ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে ছোট-বড় সব দেশ একই নিয়ম মেনে চলবে।
- **পরিধি:** এটি পণ্য, পরিষেবা (GATS) এবং মেধা সম্পদ (TRIPS) নিয়ন্ত্রণ করে।
- **গণতান্ত্রিক ক্ষমতা:** এখানে **"এক দেশ, এক ভোট"** নীতি অনুসরণ করা হয়, যার ফলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো জোটবদ্ধ হয়ে উন্নত দেশগুলোর সাথে দরকষাকষি করতে পারে।

২. অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য (FTA এবং কাস্টমস ইউনিয়ন)

WTO বৈষম্যহীনতার কথা বললেও, **GATT-এর ২৪ নম্বর ধারা** সদস্যদের নির্দিষ্ট অংশীদারদের সাথে বিশেষ চুক্তি করার সুযোগ দেয়।

- **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA):** স্বাক্ষরকারী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে শুল্ক **বর্জন** করে কিন্তু বিশ্বের বাকি দেশগুলোর জন্য নিজস্ব শুল্ক বজায় রাখে (যেমন: ভারত-ইউএই CEPA, RCEP)।

- **কাস্টমস ইউনিয়ন (CU):** সদস্যরা নিজেদের মধ্যে শুল্ক বর্জন করার পাশাপাশি বাইরের দেশগুলোর জন্য একটি **অভিন্ন শুল্ক নীতি** গ্রহণ করে (যেমন: ইউরোপীয় ইউনিয়ন)।
- **"WTO-Plus" বৈশিষ্ট্য:** আধুনিক FTA-গুলোতে পরিবেশগত মান, শ্রম আইন এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের মতো বিষয় থাকে যা সাধারণত WTO-র আওতায় নেই।

৩. পারস্পরিক বাণিজ্য (ART মডেল)

এটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং বিতর্কিত ধরন, যা **ট্রাম্প প্রশাসন** শুরু করেছিল এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে জনপ্রিয় হচ্ছে।

- **দর্শন:** এটি উদার বাণিজ্যের বদলে **"কঠোর পারস্পরিকতা"** বা "যেমন কর্ম তেমন ফল" নীতিতে বিশ্বাসী। যেমন— "যদি আমাদের গাড়ির ওপর আপনার শুল্ক ২০% হয়, তবে আপনার গাড়ির ওপর আমাদের শুল্কও ২০% হবে।"
- **আইনি মর্যাদা:** এগুলো প্রায়ই WTO-র নিয়মের বাইরে স্বাক্ষর করা হয়। ফলে এগুলোতে স্বচ্ছতার অভাব থাকে এবং অন্য দেশগুলো এগুলো পরীক্ষা করতে পারে না।
- **"সাম্রাজ্যবাদী" প্রকৃতি:** এই চুক্তিতে একতরফা শর্ত থাকতে পারে। যেমন— অংশীদার দেশকে শক্তিশালী দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নীতি মেনে চলতে বাধ্য করা বা **ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব** (যেমন নেটফ্লিক্স বা গুগলের ওপর কর আরোপের অধিকার) বিসর্জন দিতে বাধ্য করা।
- **প্রভাবের রাজনীতি:** ART প্রায়ই একতরফা উচ্চ শুল্কের ভয় দেখিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা নিয়ম-ভিত্তিক হওয়ার বদলে **ক্ষমতা-ভিত্তিক** হয়ে দাঁড়ায়।

বাণিজ্যিক গতিশীলতার মূল পরিবর্তনসমূহ

১. ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠন

চিরাচরিত বাণিজ্য মডেল **"তুলনামূলক সুবিধা"** (যেখানে উৎপাদন সস্তা সেখানে উৎপাদন করা) এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। আজ "দক্ষতা"র বদলে **"স্থিতিস্থাপকতা"** এবং **"নিরাপত্তা"** বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

- **ফ্রেন্ড-শোরিং (Friend-shoring):** ঝুঁকি এড়াতে দেশগুলো এখন "রাজনৈতিকভাবে বন্ধুপ্রতীম" দেশগুলোর দিকে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা ঘুরিয়ে দিচ্ছে।
- **ডিকাপলিং এবং ডি-রিস্কিং:** আমেরিকা ও ইউরোপ বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর, বিরল খনিজ এবং সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে চীনের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে।
- **বাণিজ্য পথ পরিবর্তন:** শুল্ক এড়াতে চীনের পণ্য অন্য দেশের (যেমন আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো) মাধ্যমে ঘুরে পশ্চিমা বাজারে প্রবেশ করছে।

২. শুল্ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার

শুল্ক এখন আর কেবল দেশীয় শিল্পকে রক্ষার অর্থনৈতিক হাতিয়ার নয়; এটি এখন **কৌশলগত অস্ত্রে** পরিণত হয়েছে।

- **একতরফা নীতি:** ২০২৪–২০২৬ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে শুল্কের ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা গেছে, যা মূলত বড় অর্থনীতির দেশগুলোর পারস্পরিক শুল্ক নীতি দ্বারা প্রভাবিত।
- **উদারীকরণের বদলে পারস্পরিকতা:** ART চুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে বাণিজ্যের "উভয় পক্ষের জয়" (win-win) ধারণাটি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী দেশগুলো অন্যদের শুল্ক কমাতে বাধ্য করলেও নিজেরা সংরক্ষণবাদী নীতি বজায় রাখছে।

৩. ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব বনাম তথ্য প্রবাহ

বিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্য ছিল পণ্যের কন্টেইনার নিয়ে; একবিংশ শতাব্দীতে এটি **ডেটা বা তথ্যের** ওপর ভিত্তি করে চলছে।

- **ই-কমার্স মোরাটোরিয়াম:** ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো ইলেকট্রনিক লেনদেনের ওপর শুল্ক না বসানোর WTO নিয়মের বিরোধিতা করছে, কারণ এতে তাদের বিশাল রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

- **Restrictive Digital Clauses:** নতুন ART-গুলো প্রায়ই দেশগুলোকে **ডেটা লোকালাইজেশন** (স্থানীয়ভাবে তথ্য জমা রাখা) করতে বাধা দেয় এবং ডিজিটাল ট্যাক্স নিষিদ্ধ করে। এটি দেশগুলোর নিজস্ব ডিজিটাল বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা **ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব** কেড়ে নেয়।

৪. "সবুজ" সংরক্ষণবাদ

জলবায়ু পরিবর্তন এখন বাণিজ্যের নতুন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- **CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism):** ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই কার্বন ট্যাক্স নিশ্চিত করে যে পরিবেশ বান্ধব পণ্যের বাজার যেন সস্তা কিন্তু "দূষণকারী" আমদানিকৃত পণ্যের কারণে নষ্ট না হয়।
- **সাসটেইনেবিলিটি স্ট্যান্ডার্ড:** বাণিজ্য চুক্তিতে এখন কঠোর শ্রম এবং পরিবেশগত মান মানার শর্ত থাকে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রায়ই **"অ-শুল্ক বাধা"** (non-tariff barriers) হিসেবে দেখে।

ভারতের জন্য কৌশলগত গুরুত্ব

১. "দ্বিমুখী অক্ষ" কৌশল: ইউরোপীয় ইউনিয়ন বনাম আমেরিকা

ভারত দুটি ভিন্ন বাণিজ্য দর্শনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখছে:

- **ইইউ অক্ষ (প্রথাগত বহু-মেরুকরণ): ভারত-ইইউ FTA** নিয়ম-ভিত্তিক বাণিজ্যের ওপর জোর দেয়। এটি **৯৬% পণ্যের ওপর শুল্ক বর্জন** করে চীনের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে।
- **ইউএস অক্ষ (লেনদেনমূলক পারস্পরিকতা):** আমেরিকার সাথে ভারত একটি অপেক্ষাকৃত ছোট **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA)** বেছে নিয়েছে। এটি গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বিবাদ (যেমন স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম শুল্ক) মেটানো এবং জ্বালানি নিরাপত্তা (LNG ও অপরিশোধিত তেল) নিশ্চিত করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

২. ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব: "লক্ষণ রেখা"

ভারত তার ডিজিটাল সীমানা রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর অবস্থান বজায় রাখছে:

- **"ডেটা ফ্রি ফ্লো" প্রত্যাখ্যান:** ভারত বাণিজ্য চুক্তির (বিশেষ করে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে) এমন সব শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে যা **ডেটা লোকালাইজেশন** বা স্থানীয়ভাবে তথ্য জমা রাখাকে নিষিদ্ধ করে। এটি দেশের তথ্যের ওপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।
- **দিল্লি ঘোষণা (২০২৬):** ২০২৬ সালের এআই (AI) ইমপ্যাক্ট সামিটে ভারত **"এআই এক্সট্রাক্টিভিজম" (AI Extractivism)**-এর বিরোধিতা করেছে। বিদেশি সংস্থাগুলো যাতে ভারতের স্থানীয় তথ্য হাতিয়ে নিয়ে নিজেদের লাভের জন্য ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য ভারত তথ্যের ওপর নিজস্ব সার্বভৌমত্বের দাবি জানিয়েছে।

৩. ফ্রেন্ড-শোরিং এবং চীনের ঝুঁকি কমানো

ভারত নিজেকে চীনের বিকল্প হিসেবে বিশ্ববাজারে একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরছে:

- **নির্ভরযোগ্য উৎস কৌশল (Trusted Source Strategy): ক্রিটিক্যাল মিনারেলস মিনিস্টেরিয়াল**-এ যোগ দেওয়ার মাধ্যমে ভারত ইলেকট্রিক ভেহিকল (EV) এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিশ্চিত করছে। এতে চীনের ওপর ৭০%-এর বেশি নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
- **নির্বাচিত একীকরণ (Selective Integration):** চীন-চালিত RCEP জোট থেকে দূরে থাকা এবং "গণতান্ত্রিক অংশীদারদের" (ব্রিটেন, ইইউ, সংযুক্ত আরব আমিরাত) সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া ভারতের "মূল্যবোধ-ভিত্তিক বিশ্বায়ন" নীতিরই প্রতিফলন।

৪. অভ্যন্তরীণ নীতিতে প্রভাব: আত্মনির্ভর ভারত ২.০

বাণিজ্যিক আলোচনাগুলো এখন সরাসরি দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নীতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে:

- **PLI স্কিমের সমন্বয়:** ভারতের বাণিজ্য আলোচকরা নিশ্চিত করছেন যেন শুল্ক কমানোর ফলে দেশের **উৎপাদন ভিত্তিক ইনসেনটিভ (PLI)** খাতগুলো (যেমন সোলার মডিউল, ইলেকট্রনিক্স) ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- **বিরল খনিজ করিডোর: ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে** খনিজ করিডোর তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে সরাসরি দেশের উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর সাথে যুক্ত করবে।

উপসংহার

ভারতের **কৌশলগত বাস্তববাদ (Strategic Pragmatism)**-এর দিকে এই যাত্রা দেশের ডিজিটাল এবং জ্বালানি সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করছে। একটি খণ্ডিত বিশ্ব ব্যবস্থায় উচ্চমান এবং মূল্যবোধ-ভিত্তিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভারত নিজেকে একটি স্থিতিস্থাপক ও নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

প্রশ্ন: *"বিশ্ব বাণিজ্যের কাঠামো নিয়ম-ভিত্তিক বহুপাক্ষিকতা (multilateralism) থেকে ক্ষমতা-চালিত দ্বিপাক্ষিকতার (bilateralism) দিকে ঝুঁকে পড়ছে। WTO, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এবং পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির (ART) প্রেক্ষাপটে এই পরিবর্তনটি পরীক্ষা করুন। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এর প্রভাব আলোচনা করুন।" (২৫০ শব্দ)*

2.2.7. ভারত-ব্রাজিল সম্পর্ক

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট **লুলা**-র ভারত সফরের সময়, ভারত ও ব্রাজিল **গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals)** এবং **বিরল খনিজ (Rare-earth)** সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের কৌশলগত সম্পর্ক আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছে। উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য **২০ বিলিয়ন ডলারের** উপরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা **গ্লোবাল সাউথ** সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ভারত-ব্রাজিল সম্পর্ক

- **১৯৪৮:** দুই দেশের মধ্যে **কূটনৈতিক সম্পর্ক** স্থাপিত হয়। ব্রাজিল যখন পর্তুগাল থেকে স্বাধীনতা পায়, তখন ভারত ছিল অন্যতম প্রথম দেশ যারা ব্রাজিলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
- **উপনিবেশবাদ বিরোধী যুগ:** উভয় দেশই **জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)** এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।
- **শীতল যুদ্ধ পরবর্তী পরিবর্তন:** ১৯৯০-এর দশকে যখন উভয় দেশ তাদের অর্থনীতি উদারীকরণ করে এবং বিশ্ব প্রশাসনে নিজেদের ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করে, তখন সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে থাকে।
- **২০০৩ (IBSA):** দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে **ভারত-ব্রাজিল-দক্ষিণ আফ্রিকা (IBSA)** ফোরাম গঠিত হয়।
- **২০০৬ (কৌশলগত অংশীদারিত্ব):** মহাকাশ, প্রতিরক্ষা এবং পারমাণবিক শক্তি খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে **"কৌশলগত অংশীদারিত্ব"** বা Strategic Partnership আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।
- **বহুপাক্ষিক জোট:** উভয় দেশই BRICS (২০০৯) এবং G4 (জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বা UNSC সংস্কারের দাবিদার) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আঞ্চলিক নেতা হিসেবে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে।

ভারত-ব্রাজিল সম্পর্কের সহযোগিতার প্রধান স্তম্ভসমূহ

১. ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদীয়মান প্রযুক্তি

এটি বর্তমান সম্পর্কের সবচেয়ে গতিশীল স্তম্ভ, যাকে বলা হচ্ছে **"ডিজিটাল সুপারপাওয়ার (ভারত) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সুপারপাওয়ারের (ব্রাজিল) মিলন"**।

- **ভবিষ্যতের জন্য ডিজিটাল অংশীদারিত্ব:** ২০২৬ সালে প্রেসিডেন্ট লুলার সফরের সময় একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সই হয়। এর মাধ্যমে ভারত তার **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)** (যেমন- UPI, **আধার**) ব্রাজিলের সাথে শেয়ার করবে যাতে তারা তাদের দেশের ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে পারে।
- **AI জোট: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)** পরিচালনা এবং নৈতিকতা নিয়ে সহযোগিতা, যা মূলত গ্লোবাল সাউথের জন্য "অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি" তৈরির ওপর জোর দেবে।
- **ওপেন প্ল্যানেটারি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক (OPIN):** টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু রক্ষার কাজে ডিজিটাল টুল ব্যবহার করার জন্য এটি চালু করা হয়েছে।

২. জ্বালানি রূপান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তন

উভয় দেশই **গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স (GBA)** এর মাধ্যমে বিশ্বের সবুজ জ্বালানি কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছে।

- **বায়োফুয়েল এবং SAF:** ইথানল মিশ্রণের বৈশ্বিক মান নির্ধারণ এবং **টেকসই বিমান জ্বালানি (Sustainable Aviation Fuel - SAF)** করিডোর তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া।
- **বেলেম ৪ গুণ অঙ্গীকার (Belém 4x Pledge):** ২০৩৫ সালের মধ্যে টেকসই জ্বালানির ব্যবহার চার গুণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি।
- **গ্রিন হাইড্রোজেন:** গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং সঞ্চয় করার প্রযুক্তি নিয়ে যৌথ গবেষণা।

৩. প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা

প্রতিরক্ষা সম্পর্ক এখন শুধু কেনা-বেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং যৌথ **নকশা এবং উৎপাদনে (Co-design and Co-production)** রূপান্তরিত হয়েছে।

- **অ্যারোস্পেস (মহাকাশ ও বিমান):** ২০২৬ সালে ভারতে আঞ্চলিক জেট তৈরির জন্য **আদানি গ্রুপ** এবং ব্রাজিলের **এমব্রায়ার (Embraer)** এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- **নৌ-সহযোগিতা: স্করপেন-শ্রেণির সাবমেরিনের** রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তার জন্য মাজাগন ডক লিমিটেডের সাথে অংশীদারিত্ব।
- **সাইবার নিরাপত্তা:** আন্তঃদেশীয় সাইবার অপরাধ মোকাবিলা এবং তথ্য সুরক্ষার জন্য ২০২৫ সালে **ভারত-ব্রাজিল সাইবার ডায়ালগ** শুরু হয়েছে।

৪. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা

- **জেনেটিক সহযোগিতা:** পশুপালনে সহযোগিতা, বিশেষ করে ভারতের **গির (Gir)** এবং **কাঙ্কেজ (Kankrej)** গরুর মাধ্যমে ব্রাজিলে দুধের উৎপাদন বাড়ানো।
- **কৃষি-রাসায়নিক:** ভারত ব্রাজিলের বিশাল কৃষি খাতে বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি **কৃষি-রাসায়নিক** সরবরাহ করে।
- **টেকসই কৃষি:** সূক্ষ্ম কৃষি (Precision farming) এবং জলবায়ু সহনশীল শস্যের জাত নিয়ে যৌথ গবেষণা।

৫. শিল্প অংশীদারিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ

- **২০২৬ খনিজ চুক্তি (Critical Minerals Accord):** ব্রাজিলের বিশাল **লিথিয়াম, নিওবিয়াম** এবং বিরল খনিজ ভাণ্ডারে ভারতের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার একটি কৌশলগত চুক্তি। এটি ভারতের **ইভি (EV)** এবং সেমিকন্ডাক্টর মিশনের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ভারত-ব্রাজিল সম্পর্কের গুরুত্ব

- **গ্লোবাল সাউথ নেতৃত্ব:** দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে মিলে (IBSA), তারা জলবায়ু ন্যায়বিচার, ঋণ সংকট এবং খাদ্য নিরাপত্তার মতো বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর হয়ে কথা বলে।
- **বহুপাক্ষিক সংস্কার:** G4 এবং BRICS-এর মাধ্যমে তারা একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ করছে।

- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** ব্রাজিল ভারতের ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এবং অপরিশোধিত তেলের উৎস হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **অর্থনৈতিক পরিপূরকতা:** এটি এমন এক সম্পর্ক যেখানে **"বিশ্বের ওষুধাগার (ভারত)"** এবং **"বিশ্বের শস্যাগার (ব্রাজিল)"** একে অপরের পরিপূরক। ২০২৫ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য **১৫.২১ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে।
- **ফুটবল সহযোগিতা:** ২০২৫ সালে চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত **ফুটবল+ সামিটের** মাধ্যমে ফুটবল সম্পর্ক আরও মজবুত করা হয়েছে, যা তৃণমূল স্তরের প্রতিভা বিকাশ এবং কারিগরি সহযোগিতায় সাহায্য করছে।

ভারত-ব্রাজিল সম্পর্কের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **ভৌগোলিক দূরত্ব ও লজিস্টিকস:** সরাসরি আকাশপথ বা সমুদ্রপথের অভাবের কারণে পণ্য পরিবহনে অনেক বেশি খরচ এবং সময় লাগে।
- **বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা:** বাণিজ্য মূলত **প্রাথমিক পণ্যের** (যেমন- তেল, সোয়া, ওষুধ) ওপর নির্ভরশীল। বাণিজ্যের বৈচিত্র্য কম থাকায় এটি বাজারের ওঠানামার ওপর বেশি নির্ভরশীল।
- **'চীন ফ্যাক্টর':** চীন ব্রাজিলের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। চীনের এই আধিপত্যের কারণে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য ব্রাজিলের বাজারে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
- **WTO চিনি বিরোধ:** ভারতের **আখ চাষে ভর্তুকি** নিয়ে ব্রাজিলের দীর্ঘদিনের অভিযোগ রয়েছে। ২০২৬ সালেও এর স্থায়ী সমাধান মেলেনি।
- **কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিন্নতা:** মাঝেমধ্যে বৈশ্বিক রাজনীতিতে দুজনের অবস্থান আলাদা হয়। যেমন- ব্রাজিল অনেক সময় চীনের নেতৃত্বাধীন BRICS উদ্যোগগুলোতে বেশি আগ্রহ দেখায়, যেখানে ভারত কিছুটা সতর্ক থাকে।

উত্তরণের পথ

- **বাণিজ্য ঝুড়ি সম্প্রসারণ:** ভারত-মেরকোসুর (India-MERCOSUR) বাণিজ্য চুক্তিকে আরও বড় করা এবং আইটি ও অটোমোবাইল সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- **যোগাযোগ বৃদ্ধি:** মুম্বাই/দিল্লি এবং সাও পাওলোর মধ্যে **সরাসরি সমুদ্রপথ** এবং বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা।
- **খনিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** ২০২৬ সালের খনিজ চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করে খনি থেকে খনিজ উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াকরণে একসাথে কাজ করা।
- **ডিজিটাল সমন্বয়:** ব্রাজিলের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতের **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)** মডেল সেখানে পৌঁছে দেওয়া।
- **প্রাতিষ্ঠানিক কূটনীতি:** আইনি লড়াইয়ের বদলে আলোচনার মাধ্যমে (যেমন- ইথানল প্রযুক্তির বিনিময়) চিনির ভর্তুকি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান করা।

উপসংহার

ভারত-ব্রাজিল অংশীদারিত্ব হলো একটি বহুমুখী বিশ্বের জন্য এক **কৌশলগত সমন্বয় (Strategic Synergy)**। ভারতের ডিজিটাল নেতৃত্ব এবং ব্রাজিলের প্রাকৃতিক সম্পদের মেলবন্ধন সবুজ শক্তি এবং খনিজ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে **গ্লোবাল সাউথকে** নেতৃত্ব দিতে বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন: *"গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals), গ্লোবাল সাউথ (Global South) সহযোগিতা এবং বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারত-ব্রাজিল সম্পর্ক এক নতুন গতিবেগ পেয়েছে। ভারত-ব্রাজিল কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রধান স্তম্ভগুলো পরীক্ষা করুন। এই সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলো আলোচনা করুন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দিন।" (২৫০ শব্দ)*

2.2.8. আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইন (International Law) কী?

আন্তর্জাতিক আইন হলো এমন কিছু নিয়ম, নীতি এবং আদর্শের সমষ্টি, যা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

- **প্রকৃতি:** অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় আইনের মতো এটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি **সম্মতিভিত্তিক**। বিশ্বে কোনো "একক সরকার" নেই; তার বদলে এটি রাষ্ট্রগুলোর **সার্বভৌম সমতা** (জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ২.১) নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ

ICJ (আন্তর্জাতিক আদালত) স্ট্যাটিউটের অনুচ্ছেদ ৩৮(১) অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক আইনের উৎসগুলো হলো:

১. **প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):**

- **চুক্তি বা কনভেনশন (Treaties/Conventions):** রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত লিখিত চুক্তি।
  - **উদাহরণ:** UNCLOS (সমুদ্র আইন) বা **প্যারিস চুক্তি** (জলবায়ু পরিবর্তন)।
- **আন্তর্জাতিক প্রথা (International Custom):** দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভ্যাস যা আইন হিসেবে স্বীকৃত (Opinio Juris)।
  - **উদাহরণ:** কোনো চুক্তিতে লিপিবদ্ধ হওয়ার অনেক আগে থেকেই **কূটনৈতিক দায়মুক্তি** (Diplomatic Immunity) একটি প্রথা হিসেবে প্রচলিত ছিল।
- **সাধারণ নীতিমালা (General Principles):** সভ্য দেশগুলো দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক আইনি নীতি (যেমন- সদিচ্ছা বা Good Faith)।
  - **উদাহরণ:** Res Judicata (একই বিষয়ে একবার চূড়ান্ত রায় হয়ে গেলে তা নিয়ে পুনরায় মামলা করা যায় না) অথবা **শুনানির অধিকার** (Right to be Heard)।

২. **সহায়ক উৎস (Subsidiary Sources):**

- বিভিন্ন আদালতের রায় (আন্তর্জাতিক বা দেশীয় আদালত) এবং প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা বা মতামত।
  - **উদাহরণ: কুলভূষণ যাদব মামলা (২০১৯)**, যা কনসুলার অ্যাক্সেস বা কূটনৈতিক সহায়তার অধিকারকে ব্যাখ্যা করেছে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা

১. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা**

একটি আইনি কাঠামো না থাকলে বিশ্ব ব্যবস্থা "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতে ফিরে যাবে।

- **সংঘাত সীমাবদ্ধ করা:** এটি যুদ্ধের সঠিক সময় (Jus ad Bellum) এবং যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম (Jus in Bello) নির্ধারণ করে।
- **বিরোধ নিষ্পত্তি:** এটি **আন্তর্জাতিক আদালত (ICJ)** এবং **পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশন (PCA)**-এর মতো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে, যার মাধ্যমে সীমান্ত বা সমুদ্রসীমা বিরোধ শক্তির বদলে যুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা যায় (যেমন- ছাগোস দ্বীপপুঞ্জ বা দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধ)।

২. "গ্লোবাল কমন্স" বা বৈশ্বিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা

- **উন্মুক্ত সমুদ্র:** এটি UNCLOS দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সমুদ্রপথে চলাচলের স্বাধীনতা এবং গভীর সমুদ্রের খনিজ সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।
- **মহাকাশ: মহাকাশ চুক্তি (Outer Space Treaty)** মহাকাশে অস্ত্রায়ন রোধ করে এবং নিশ্চিত করে যে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানি বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হতে পারবে না।
- **বায়ুমণ্ডল: প্যারিস চুক্তি** কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ "দূষণ কোনো সীমানা মানে না।"

৩. বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সহজ করা

- **মানদণ্ড নির্ধারণ: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)** একটি নিয়মভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রদান করে যা খামখেয়ালি শুল্ক আরোপ বা বাণিজ্য যুদ্ধ রোধ করে।
- **বিনিয়োগ সুরক্ষা:** দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তিগুলো (BITs) সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। যদি কোনো রাষ্ট্র অবৈধভাবে কোনো কোম্পানির সম্পদ দখল করে, তবে ওই কোম্পানি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ পায়।
- **কার্যকরী প্রয়োজন:** আন্তর্জাতিক ডাক সেবা (UPU), বিমানের রুট (ICAO), এবং আন্তঃসীমান্ত ব্যাংকিং (SWIFT/Basel III) পুরোপুরি আন্তর্জাতিক আইনি প্রোটোকলের ওপর নির্ভরশীল।

৪. মৌলিক মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করা

- **মানবাধিকার: মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR)** এবং পরবর্তী চুক্তিগুলো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের একটি ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে।
- **অপরাধের জবাবদিহিতা:** এটি নিশ্চিত করে যে গণহত্যা বা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা "সার্বভৌমত্বের" দোহাই দিয়ে পার পাবে না (যেমন- **আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত** বা ICC-এর ভূমিকা)।
- **শরণার্থী সুরক্ষা:** এটি নিপীড়নের হাত থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নির্ধারণ করে, যা মানবিক বিপর্যয়কে আঞ্চলিক অস্থিরতায় রূপ নিতে বাধা দেয়।

আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি

১. বিষয়ের সম্প্রসারণ (কার ওপর আইনটি কার্যকর হয়?)

আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি এখন কেবল সার্বভৌম রাষ্ট্রের "ওয়েস্টফালিয়ান" (Westphalian) মডেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

- **সার্বভৌম রাষ্ট্র:** এটি এখনও আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান বিষয় (যেমন- ভারতের সমুদ্রসীমা)।
- **আন্তর্জাতিক সংস্থা:** UN (জাতিসংঘ), WTO এবং WHO-এর মতো সংস্থাগুলোর এখন নিজস্ব আইনি সত্তা রয়েছে; তারা মামলা করতে পারে বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে।
- **ব্যক্তিবর্গ:** আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন (ICC) এবং মানবাধিকার আইনের অধীনে ব্যক্তিদেরও অধিকার ও দায়বদ্ধতা রয়েছে (যেমন- যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার)।
- **রাষ্ট্রবহির্ভূত পক্ষ:** বহুজাতিক কর্পোরেশন (MNCs) এবং এনজিওগুলোও (NGOs) পরিবেশ ও শ্রম মানদণ্ড সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নিয়মের অধীনে চলে আসছে।

২. বস্তুগত পরিধির সম্প্রসারণ (কী কী বিষয় পরিচালিত হয়?)

আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়বস্তু এখন কেবল কূটনীতি থেকে জটিল প্রযুক্তিগত ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত হয়েছে।

ক. সহাবস্থানের আইন (ঐতিহ্যগত):

- **কূটনৈতিক সম্পর্ক:** কূটনীতিক এবং দূতাবাসের সুরক্ষা ও দায়মুক্তি।
- **আঞ্চলিক অখণ্ডতা:** স্থল সীমানা এবং আকাশসীমা সংক্রান্ত নিয়ম।

- **যুদ্ধ ও নিরপেক্ষতা:** যুদ্ধের আইন (**জেনেভা কনভেনশন**), যা যুদ্ধ পরিচালনার নিয়ম নির্ধারণ করে।

খ. সহযোগিতার আইন (আধুনিক):

- **অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য আইন:** WTO এবং IMF-এর মাধ্যমে বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণ।
- **পরিবেশ আইন:** এটি সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র, যার মধ্যে রয়েছে **প্যারিস চুক্তি** এবং নতুন **গ্লোবাল প্লাস্টিক চুক্তি (২০২৫)**।
- **মানবাধিকার:** নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের ওপর আন্তর্জাতিক নজরদারি।

গ. উদীয়মান ক্ষেত্রসমূহ (Frontiers):

- **মহাকাশ আইন:** স্যাটেলাইট ট্রাফিক এবং চাঁদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ (যেমন- **আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**)।
- **সাইবার স্পেস এবং AI:** ২০২৬ সালের পরিধিতে এখন "অ্যালগরিদমিক সার্বভৌমত্ব" এবং আন্তঃসীমান্ত সাইবার আক্রমণ প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত।
- **বায়ো-এথিক্স:** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (CRISPR) এবং মানব ক্লোনিংয়ের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ।

৩. ভৌগোলিক পরিধি (কোথায় কার্যকর হয়?)

- **স্থল ও আকাশ:** সার্বভৌম ভূখণ্ড এবং আন্তর্জাতিক বিমান পথ (ICAO)।
- **সমুদ্র:** উপকূলীয় জলসীমা থেকে শুরু করে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত (UNCLOS)।
- **মেরু অঞ্চল: অ্যান্টার্কটিক চুক্তি ব্যবস্থা**, যা এই মহাদেশকে নিরস্ত্রীকরণ করে রাখে।
- **পৃথিবীর বাইরে:** চাঁদ এবং অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তু।

আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ

- **সার্বভৌম সমতা ও হস্তক্ষেপ না করা:** জাতিসংঘ সনদের **অনুচ্ছেদ ২** অনুযায়ী, সকল রাষ্ট্রের সমান ভোটাধিকার রয়েছে এবং কেউ অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
- **শক্তির ব্যবহার (Jus ad Bellum):** জাতিসংঘ সনদের **অনুচ্ছেদ ২(৪)** অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এর মাত্র দুটি ব্যতিক্রম আছে: **আত্মরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৫১)** এবং **জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন**।
- **কূটনৈতিক অলঙ্ঘনীয়তা (১৯৬১/১৯৬৩): ভিয়েনা কনভেনশন** অনুযায়ী দূতাবাসগুলোতে স্থানীয় পুলিশ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারে না, কূটনীতিকদের আইনি দায়মুক্তি থাকে এবং নাগরিকদের **কনসুলার অ্যাক্সেস** বা কূটনৈতিক সহায়তার অধিকার থাকে (যেমন- **কুলভূষণ যাদব মামলা**)।
- **চুক্তি সংক্রান্ত আইন:** এটি ১৯৬৯ সালের **ভিয়েনা কনভেনশন** দ্বারা পরিচালিত। এর প্রধান নীতি হলো: Pacta Sunt Servanda (চুক্তি অবশ্যই পালন করতে হবে)।
- **সীমানার আইনি নিয়ন্ত্রণ:** গভীর সমুদ্র (UNCLOS), আকাশসীমা (**শিকাগো কনভেনশন**) এবং সাইবার স্পেস (২০২৬ সালের **জাতিসংঘ সাইবার ক্রাইম চুক্তি**) যাতে বিরোধ সৃষ্টি না হয়, তার জন্য সীমানা নির্ধারণ করে।
- **বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি:** জাতিসংঘ সনদের **অনুচ্ছেদ ৩৩** অনুযায়ী, রাষ্ট্রগুলো আলোচনার মাধ্যমে বা আইনি রায়ের (ICJ বা **আর্বিট্রেশন**) মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ মেটাতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান শাখাসমূহ

শাখা	প্রধান ক্ষেত্র	মূল দলিল/প্রতিষ্ঠান
সমুদ্র আইন	সামুদ্রিক অঞ্চল, ইইজেড (EEZ), গভীর সমুদ্র।	UNCLOS **(১৯৮২)**

মানবিক আইন (IHL)	যুদ্ধের নিয়ম; বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা।	**জেনেভা কনভেনশন (১৯৪৯)**
পরিবেশ আইন	জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য।	**প্যারিস চুক্তি, ICJ ক্লাইমেট অ্যাডভাইজরি**
মহাকাশ আইন	মহাকাশ "মানবজাতির সম্পদ"; গ্রহ-নক্ষত্রের মালিকানা না নেওয়া; ধ্বংসাবশেষের দায়বদ্ধতা।	**মহাকাশ চুক্তি (১৯৬৭), আর্টেমিস অ্যাকর্ডস**
ফৌজদারি আইন	গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।	**আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)**
বাণিজ্য ও অর্থনীতি	বাণিজ্যে বৈষম্যহীনতা (MFN মর্যাদা); বিনিয়োগকারী-রাষ্ট্র বিরোধ নিষ্পত্তি (ISDS); মেধাস্বত্ব (TRIPS)।	**বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)**

আন্তর্জাতিক আইনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রয়োগের অভাব ("নখদন্তহীন বাঘ"):** অভ্যন্তরীণ আইনের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো বৈশ্বিক পুলিশ বাহিনী নেই। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর **খামখেয়ালি আনুগত্য** (পছন্দমতো নিয়ম মানা), **জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থবিরতা** (পি-৫ দেশগুলোর ভেটো ক্ষমতা) এবং আইসিজে-র (ICJ) বিচারের জন্য **রাষ্ট্রের সম্মতির বাধ্যবাধকতা** এর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে।

২. **সার্বভৌমত্ব বনাম মানবাধিকার:** "ওয়েস্টফালিয়ান ট্র্যাপ"-এর কারণে রাষ্ট্রগুলো **হস্তক্ষেপ না করার** নীতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ শোষণ চালিয়ে যায়। যদিও **'রক্ষার দায়িত্ব' (R2P)** নীতি রয়েছে, তবে এর প্রয়োগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩. **আইনি বিভাজন:** সাইবার, মহাকাশ বা বাণিজ্যের মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্র বৃদ্ধির ফলে **একাধিক বিচারিক এখতিয়ারের** সৃষ্টি হয়। একই বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং পরিবেশ ট্রাইব্যুনাল স্থায়িত্বের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রায় দিতে পারে, যা আইনি অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

৪. **গণতান্ত্রিক ঘাটতি ও ইউরো-কেন্দ্রিকতা:** আন্তর্জাতিক আইনের অনেক নিয়ম ঔপনিবেশিক যুগে পশ্চিমা শক্তিগুলো দ্বারা তৈরি। **গ্লোবাল সাউথ** বা উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রায়ই TRIPS বা সার্বভৌম ঋণের নিয়মগুলোকে বৈষম্যমূলক মনে করে। তাই জাতিসংঘ ও ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিকীকরণের দাবি জোরালো হচ্ছে।

৫. **প্রযুক্তির "ধূসর এলাকা":** আইন উদ্ভাবনের চেয়ে পিছিয়ে আছে। **সাইবার হামলা** কি অনুচ্ছেদ ৫১-এর অধীনে "সশস্ত্র আক্রমণ" হিসেবে গণ্য হবে? **ঘাতক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র (AI)** ব্যবহারের আইনি দায় কার? এছাড়া **জলবায়ু দায়বদ্ধতা** ও ক্ষতিপূরণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা কারণ খুঁজে বের করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC) সংস্কার:** পরিষদের বৈধতা বাড়াতে ভারত, ব্রাজিল এবং আফ্রিকান দেশগুলোর মতো 'গ্লোবাল সাউথ'-এর দেশগুলোকে স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- **বাধ্যতামূলক বিচারিক এখতিয়ার:** পরিবেশ বা বাণিজ্যের মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ICJ-এর রায় মেনে নেয়, এমন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া।
- **এআই (AI) শাসন:** যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক সীমা নির্ধারণে **'গ্লোবাল ডিজিটাল কম্প্যাক্ট'** চূড়ান্ত করা।
- **যৌথ দায়িত্ব:** শরণার্থী সংকট এবং পরিবেশ রক্ষায় ভারতের **"যৌথ দায়িত্ব"**-এর অবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া—যাতে দায়ভার কেবল ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর না পড়ে পুরো বিশ্বের ওপর ভাগ করে দেওয়া হয়।

- **রাষ্ট্রবহির্ভূত পক্ষ ও জবাবদিহিতা:** কর্পোরেশন, বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং বেসরকারি সাইবার অপরাধীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য নতুন আইনি প্রতিকার ব্যবস্থা তৈরি করা।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক আইনকে অবশ্যই "রাষ্ট্রের আইন" থেকে **"মানবতার আইনে"** রূপান্তরিত হতে হবে। ২০২৬ সালের স্থিতিশীল বিশ্ব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এতে এআই (AI) নীতিশাস্ত্র, জলবায়ু দায়বদ্ধতা এবং মহাকাশ শাসনের মতো বিষয়গুলোকে একীভূত করতে হবে।

প্রশ্ন: *"আন্তর্জাতিক আইনের উৎস এবং প্রধান শাখাগুলি আলোচনা করুন। সমসাময়িক বিশ্ব ব্যবস্থায় এই আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি পরীক্ষা করুন। ভারতের জন্য এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।" (২৫০ শব্দ)*

2.2.9. ভারত-ইসরায়েল কৌশলগত অংশীদারিত্ব

প্রেক্ষাপট

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান অস্থিতিশীল ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে—যেখানে পারস্য উপসাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং গাজায় একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি বিদ্যমান—ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলে একটি উচ্চ-পর্যায়ের **'স্ট্যান্ডঅ্যালোন'** (Standalone) বা একক সফর করছেন। এই সফর ভারতের **"ডি-হাইফেনেশন"** (De-hyphenation) নীতিকে আরও সুদৃঢ় করছে। ২০১৭ সালের ঐতিহাসিক সফরের পর এটি কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় ইসরায়েল সফর।

ইসরায়েলের প্রতি ভারতের 'ডি-হাইফেনেশন' নীতি

১. **ঐতিহাসিক পটভূমি**

- **ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন:** ১৯৪৭ সালে 'বেলফোর ঘোষণা'র পর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের বিভাজন পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি পৃথক রাষ্ট্র—ইহুদিদের জন্য ইসরায়েল এবং আরবদের জন্য ফিলিস্তিন গঠনের কথা থাকলেও, এর ফলে ফিলিস্তিনিরা বাস্তুচ্যুত হয় এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে।
- **ভারতের প্রাথমিক 'হাইফেনেটেড' নীতি:** আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে ভারত শুরুতে **'হাইফেনেটেড ওয়েস্ট এশিয়া পলিসি'** অনুসরণ করত। এর অর্থ হলো, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে পররাষ্ট্রনীতির একটি একক ব্লক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৫০ সালে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও ভারত নিম্নোক্ত অবস্থান বজায় রেখেছিল:
  - কয়েক দশক ধরে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলা।
  - ফিলিস্তিনি দাবির প্রতি জোরালো সমর্থন এবং ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান।
  - এই নীতির মূল সমস্যা ছিল—ইসরায়েলের সাথে ঘনিষ্ঠতা মানেই ফিলিস্তিনকে পরিত্যাগ করা হিসেবে গণ্য হতো।

২. **ডি-হাইফেনেশনের আগে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মাইলফলক**

- **২০০০ সাল:** কার্গিল যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের সমর্থনের পর বাজপেয়ী সরকার প্রথমবারের মতো উচ্চ-পর্যায়ের মন্ত্রীদলকে ইসরায়েলে পাঠায় (যশবন্ত সিং এবং এল.কে. আদভানি)।
- **২০০৩ সাল:** এরিয়েল শ্যারন প্রথম ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারত সফর করেন।
- **২০১৫ সাল:** রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এই অঞ্চলে সফর করেন, তবে তিনি ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন—উভয় দেশই সফর করেন, যা পূর্বের 'হাইফেনেটেড' পদ্ধতির ধারাবাহিকতা ছিল।

৩. **'ডি-হাইফেনেশন' (De-Hyphenation) নীতি কী?**

এর অর্থ হলো—ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের সাথে সম্পর্ককে দুটি **সম্পূর্ণ পৃথক পথে** চালিত করা। এই পদ্ধতিতে:

- ইসরায়েল থেকে **প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি** সংগ্রহ করা যাবে।
- একইসাথে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা যাবে।
- গাজায় মানবিক সহায়তা পাঠানো সম্ভব হবে।
- **সহজ কথায়:** একটির সাথে সম্পর্ক অন্যটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। ২০১৭ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম একক ইসরায়েল সফর এই কূটনৈতিক প্রথার ভাঙন ঘটায়।

৪. ভারত-ইসরায়েল সম্পর্কের বিবর্তন

এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

১. **'নিষিদ্ধ' পর্যায় (১৯৫০ – ১৯৮০-এর দশক):** শীতল যুদ্ধ এবং আরব দেশগুলোর সাথে সংহতির কারণে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্বকে একপ্রকার 'সামাজিক বাধা' বা Taboo মনে করা হতো।

২. **'সতর্ক অবস্থান' (১৯৯২):** 'অসলো চুক্তি'র মাধ্যমে আরব-ইসরায়েল শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে ভারত ইসরায়েলের সাথে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

৩. **'কৌশলগত মাত্রা' (২০১৪ – বর্তমান):** সম্পর্কটি এখন প্রকাশ্যে **কৌশলগত** রূপ নিয়েছে। ২০২৬ সালের এই সফর ভারতের এই দৃঢ় অবস্থানেরই প্রতিফলন।

৫. সহযোগিতার আধুনিক মাত্রা

- **অস্ত্র থেকে জল (Weapons to Water):** ভারত বর্তমানে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বৃহত্তম ক্রেতা (ইসরায়েলের মোট রপ্তানির ৩৪%)। প্রতিরক্ষার পাশাপাশি উন্নত কৃষি এবং জল ব্যবস্থাপনার জন্য ভারতে **৩৫টি 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'** স্থাপিত হয়েছে।
- **জাতিসংঘে ভোটদানের পরিবর্তন:** অতীতে ভারত সব সময় ইসরায়েলের বিপক্ষে ভোট দিত। বর্তমানে ভারত নির্দিষ্ট কিছু ভোটে (যেমন হামাসের নিন্দা না জানানো যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব) **অনুপস্থিত (Abstain)** থাকছে। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট: ফিলিস্তিনকে সমর্থন করা হবে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতের কাছে ইসরায়েল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১. **সংকটকালীন প্রতিরক্ষা সহায়তা:** কার্গিল যুদ্ধের সময় যখন ভারত আন্তর্জাতিক নানা বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন ইসরায়েল একটি নির্ভরযোগ্য **কৌশলগত অংশীদার** হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

- **লেজার-গাইডেড বোমা (LGBs):** দুর্গম পাহাড়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদে সহায়তার জন্য এগুলো সরবরাহ করেছিল।
- **ড্রোন (UAVs):** রিয়েল-টাইম নজরদারির জন্য 'সার্চার' ও 'হেরন' ড্রোন প্রদান করেছিল।
- অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় ইসরায়েল সংকটের মুহূর্তে ভারতকে যেভাবে সহায়তা করেছে, তা দেশটিকে একটি বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. **উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও যৌথ উন্নয়ন:** ভারত ইসরায়েলের অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান গন্তব্য। উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো হলো:

- **বারাক-৮ / MRSAM:** ডিআরডিও (DRDO)-র সাথে যৌথভাবে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা।
- **ফ্যালকন (Phalcon) AWACS:** ভারতীয় বিমানে বসানো উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা।
- **স্পাইক (Spike):** ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী গাইডেড মিসাইল।
- এই প্রযুক্তিগুলো ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রের সচেতনতা এবং আঘাত হানার ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩. **সন্ত্রাসবাদ দমন ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা:** সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসরায়েলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিশেষভাবে সহায়ক:

- **গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান** এবং নগর যুদ্ধ (Urban warfare) কৌশল।
- **সীমান্ত ব্যবস্থাপনা** এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা।
- নজরদারি ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার এবং সাইবার নিরাপত্তা সরঞ্জাম ভারতের সীমান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর।

৪. **কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি:** প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ইসরায়েল ভারতের খাদ্য ও জল নিরাপত্তা নিশ্চিতে বড় ভূমিকা রাখছে:

- **ড্রিপ ইরিগেশন** এবং ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা।
- মরু-অঞ্চলে কৃষিকাজ এবং জল পুনর্ব্যবহার ও লবণাক্ততা দূরীকরণ (Desalination) প্রযুক্তি।
- ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ৩০টিরও বেশি **ইন্দো-ইসরায়েল 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স'** বর্তমানে উদ্যানপালন ও শুষ্ক জমিতে চাষাবাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

৫. অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক ভিত্তি: প্রতিরক্ষার বাইরেও এই সম্পর্ক ভারতের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত:

- **জল ও কৃষি:** ইসরায়েলের 'মাশাভ' (MASHAV) সংস্থার সহায়তায় রাজস্থান ও হরিয়ানার মতো জলসংকটে থাকা রাজ্যে ড্রিপ ইরিগেশন ও জল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
- **বাণিজ্য ও বিনিয়োগ:** ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত **দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি** এবং চলমান **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA)** লক্ষ্য হলো ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং সবুজ জ্বালানিতে বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।
- **আইমেক (IMEC) করিডোর:** ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোরকে পুনরুজ্জীবিত করা ভারতের একটি লক্ষ্য। সুয়েজ খালের বিকল্প হিসেবে ইসরায়েলের **হাইফা বন্দরকে** কেন্দ্র করে ইউরোপে ভারতীয় পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে এই করিডোর একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং "হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স" (Hexagonal Alliance) প্রস্তাব

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই অঞ্চলের "উগ্র অক্ষ" (Radical axes) মোকাবিলায় ভারত, গ্রিস, সাইপ্রাস এবং আরব দেশগুলোকে নিয়ে একটি ছয়-পক্ষীয় জোট বা **"হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স"**-এর প্রস্তাব দিয়েছেন। এটি ভারতের জন্য একটি জটিল কূটনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ

পশ্চিম এশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিল জাল মোকাবিলা করা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ:

- **ইরান সংকট:** ইরান ইসরায়েলের ঘোর বিরোধী এবং ফিলিস্তিনিদের কট্টর সমর্থক। ভারতের জন্য মধ্য এশিয়ায় পৌঁছাতে **চাবাহার বন্দর** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসরায়েলের প্রস্তাবিত এই জোটে যোগ দিলে তেহরানের সাথে ভারতের সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- **তুরস্ক ফ্যাক্টর:** মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্ব বজায় রাখতে তুরস্ক ইসরায়েলের বিরোধিতা করে। আবার কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্ক পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারতকে এই পথ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলতে হয়।
- **উদারপন্থী আরব দেশ:** বর্তমানে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানের সাথে ভারতের বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। I2U2 কাঠামোর পর এই দেশগুলো ভারতের সাথে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠতাকে এখন স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করছে।
- **মার্কিন ফ্যাক্টর:** অতীতে ভারত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার উপস্থিতির বিরোধিতা করলেও, বর্তমানে ভারত ও আমেরিকা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনতে এবং I2U2 ও IMEC বাণিজ্য পথের মতো অংশীদারিত্বে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

ভবিষ্যতের পথ: "নীতিগত বাস্তববাদ" (Principled Pragmatism)

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের ভবিষ্যৎ গতিপথ জাতীয় স্বার্থ এবং নৈতিক কূটনীতির ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত:

- **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy) বজায় রাখা:** নেতানিয়াহুর প্রস্তাবিত "হেক্সাগোনাল অ্যালায়েন্স" বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তৃতীয় কোনো দেশের বিরুদ্ধে সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার দীর্ঘস্থায়ী নীতি ভারতকে আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে দূরে রাখে।
- **উন্নয়নমূলক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার:** ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ককে মূলত অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি (**মিশন সুদর্শন চক্র**), উন্নত কৃষি এবং জল ব্যবস্থাপনার মতো ভারতের অভ্যন্তরীণ লক্ষ্যগুলো পূরণে ব্যবহার করা উচিত।
- **আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার পক্ষে সওয়াল:** ইসরায়েল এবং আরব বিশ্ব—উভয়ের বন্ধু হিসেবে ভারত তার অনন্য অবস্থান ব্যবহার করে একটি শান্তিপূর্ণ **'দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান'** (Two-state solution)-এর পক্ষে কথা বলতে পারে। IMEC করিডোরের মতো অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য এই স্থিতিশীলতা জরুরি।
- **গ্লোবাল সাউথ-এর নেতৃত্ব:** তেল আবিবের সাথে সম্পর্ক গভীর করার পাশাপাশি গাজায় মানবিক স্থিতিশীলতার পক্ষে ভারতের সোচ্চার থাকা উচিত, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে ভারতের নৈতিক অবস্থান অটুট থাকে।

উপসংহার

এই সফর ভারত ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি পরিপক্ক ও স্বার্থ-চালিত অংশীদারিত্বের প্রতিফলন। প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্কের মূলে থাকলেও এখন তা প্রযুক্তি, কৃষি, উদ্ভাবন এবং সংযোগ (Connectivity) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে পশ্চিম এশিয়ার জটিল ভূ-রাজনীতিতে এই সম্পৃক্ততা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বজায় রাখতে হবে।

"নীতিগত বাস্তববাদ"—অর্থাৎ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং শান্তির প্রতি অঙ্গীকারের সমন্বয়—ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় গঠনমূলক অবদান রাখতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন: *ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসরায়েলের কৌশলগত গুরুত্ব আলোচনা করুন। ভারত-ইসরায়েল সম্পর্ক কীভাবে 'সতর্ক সংযোগ' থেকে একটি 'উন্মুক্ত কৌশলগত অংশীদারিত্বে' রূপান্তরিত হয়েছে? (২৫০ শব্দ)*

2.3. সামাজিক ন্যায়বিচার

2.3.1. ভারতে বন্ধকী শ্রম

প্রেক্ষাপট

২০২৬ সালটি **১৯৭৬ সালের বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন**-এর **৫০ বছর** পূর্ণ করছে। যদিও 'প্রথাগত' সামন্ততান্ত্রিক দাসত্ব হ্রাস পেয়েছে, তবে বর্তমানে অসংগঠিত অর্থনীতিতে এর নতুন নতুন রূপ দেখা দিচ্ছে।

বন্ধকী শ্রম কী?

বন্ধকী শ্রম (যাকে ঋণ দাসত্ব বা **বন্ধুয়া মজদুরি** বলা হয়) হলো আধুনিক দাসত্বের একটি রূপ। এখানে একজন ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ঋণ পরিশোধের জন্য শোষণমূলক শর্তে কাজ করতে বাধ্য হন। প্রায়ই তাদের খুব সামান্য বা কোনো মজুরি ছাড়াই কাজ করতে হয় এবং ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজ ছেড়ে যেতে পারেন না।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **ঋণ ও শ্রমের বন্ধন:** ঋণের বিনিময়ে শ্রম প্রদান।
- **স্বাধীনতাহীনতা:** নিয়োগকর্তা পরিবর্তন বা অবাধে চলাফেরা করার অধিকার থাকে না।
- **বংশপরম্পরায় শোষণ:** ঋণের বোঝা অনেক সময় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়।

সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

১. **সাংবিধানিক বিধান**

- **ধারা ২৩:** জোরপূর্বক শ্রম বা **'বেগার'** খাটালে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।
- **ধারা ২১:** সুপ্রিম কোর্টের মতে, বন্ধকী শ্রম **মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার**-এর পরিপন্থী।
- **ধারা ২৪:** শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে।
- **নির্দেশমূলক নীতি (DPSP):** ধারা ৩৯ এবং ৪২ অনুযায়ী রাষ্ট্র শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং মানবিক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ।

২. **আইনি কাঠামো**

- **বন্ধকী শ্রম ব্যবস্থা (বিলোপ) আইন, ১৯৭৬:** এটি এই প্রথাকে বিলুপ্ত করে এবং সমস্ত বিদ্যমান ঋণ মকুব করে দেয়। **জেলা ম্যাজিস্ট্রেট** (DM)-কে উদ্ধার ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- **ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩:** এর **১৪৩ নম্বর ধারা** অনুযায়ী জোরপূর্বক শ্রম এবং পাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯:** যেহেতু অধিকাংশ ভুক্তভাগী প্রান্তিক সমাজের, তাই এই আইন অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে।

৩. **সাম্প্রতিক বিচার বিভাগীয় মাইলফলক (২০২৬)**

- **কেরালা হাইকোর্টের রায়:** কোনো কর্মীকে পদত্যাগ করতে বাধা দেওয়া বা বেতন আটকে রেখে কাজ করতে বাধ্য করা **বন্ধকী শ্রম** হিসেবে গণ্য হবে।

বন্ধকী শ্রমের কারণসমূহ

১. **অর্থনৈতিক কারণসমূহ**

- **দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা:** চরম দারিদ্র্যের কারণে পরিবারগুলো চিকিৎসা, বিয়ে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো জরুরি প্রয়োজনে 'ব্রিজ লোন' বা স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিতে বাধ্য হয়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব:** প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে বন্ধক রাখার মতো কোনো সম্পদ (Collateral) থাকে না। ফলে তারা স্থানীয় শোষক মহাজন বা জমিদারদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
- **অসংগঠিত ক্ষেত্র:** ভারতের শ্রমশক্তির **৯০%**-এর বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রে (যেমন: ইটভাটা, পাথর খাদান, কৃষি) কাজ করে, যেখানে শ্রম আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না।

২. **আর্থ-সামাজিক কারণসমূহ**

- **জাতিভেদ প্রথা:** বন্ধকী শ্রম প্রথা ভারতের বর্ণপ্রথার গভীরে প্রোথিত। ভুক্তভোগীদের প্রায় **৮০-৯০%** তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST) বা ওবিসি (OBC) সম্প্রদায়ের।
- **নিরক্ষরতা:** শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা চুক্তির শর্তাবলী বা ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে তাদের আইনি অধিকার বুঝতে পারেন না।

৩. **প্রশাসনিক ও আইনি ফাঁকফোকর**

- **শনাক্তকরণে ত্রুটি:** বন্ধকী শ্রম এখন 'প্রথাগত সামন্ততন্ত্র' থেকে সরে এসে 'লুকানো বাণিজ্যিক দাসত্বে' পরিণত হয়েছে, যা চিহ্নিত করা প্রশাসনের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

- **নিষ্ক্রিয় নজরদারি কমিটি:** আইন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের নজরদারি কমিটিগুলোর (Vigilance Committees) নিয়মিত তদারকি করার কথা থাকলেও, সেগুলো প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে বা তহবিলের অভাবে ভোগে।
- **শাস্তির নিম্ন হার:** শ্রমিকদের উদ্ধার করা হলেও BNS (২০২৩) বা **১৯৭৬ সালের আইনের** অধীনে নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে খুব কমই মামলা হয়। ফলে শোষকদের মধ্যে কোনো ভয় কাজ করে না।

৪. **আধুনিক কারণসমূহ**

- **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:** প্রতিকূল আবহাওয়ার (যেমন **২০২৫-২৬ সালের খরা**) ফলে কৃষি সংকটে পড়ে মানুষ বাধ্য হয়ে পরিযান (Migration) করে এবং শ্রম ঠিকাদারদের ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

- **কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন প্রকল্প (২০২১):**
  - **আর্থিক সহায়তা:** প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য **১ লক্ষ টাকা**, মহিলা ও শিশুদের জন্য **২ লক্ষ টাকা** এবং বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন: তৃতীয় লিঙ্গ বা যৌন শোষণ) **৩ লক্ষ টাকা** সাহায্য দেওয়া হয়।
  - **পুনর্বাসন তহবিল:** তাৎক্ষণিক ত্রাণের জন্য জেলা পর্যায়ে **১০ লক্ষ টাকার** একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- **প্রমিত কার্যপ্রণালী (SOP):** দ্রুত শনাক্তকরণ ও উদ্ধারের জন্য কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলো নিজস্ব SOP তৈরি করেছে।
- **আন্তর্জাতিক সংহতি:** ভারত ILO **কনভেনশন ১৮২** (শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম রূপ) অনুমোদন করেছে এবং **২০৩০ সালের মধ্যে** আধুনিক দাসত্ব নির্মূল করতে (SDG ৮.৭) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- **শ্রম বিধি (২০২০/২০২৫):** মজুরি বিধি এবং সামাজিক সুরক্ষা বিধির লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থানকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা।

অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সমন্বয়

- MGNREGA: পুনরায় ঋণের ফাঁদে পড়া আটকাতে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া।
- **পিএম-আবাস যোজনা (PM-Awas Yojana):** উদ্ধারকৃত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঘর দেওয়া।
- **সমগ্র শিক্ষা অভিযান:** উদ্ধারকৃত শিশুশ্রমিকদের মূলধারার স্কুলে ফিরিয়ে আনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবিকভাবে এই প্রথা নির্মূল করতে বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

১. **শক্তিশালী শাসন ও আইন প্রয়োগ:**

- **সক্রিয় নজরদারি কমিটি:** জেলা কমিটিগুলো যাতে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করে এবং শপিং মল বা কল সেন্টারের মতো নতুন ক্ষেত্রগুলোতে নজরদারি চালায় তা নিশ্চিত করা।
- **সংক্ষিপ্ত বিচার:** নিয়োগকর্তাদের মনে ভয় তৈরি করতে BNS ২০২৩-এর অধীনে তিন মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

২. **ব্যাপক পুনর্বাসন ব্যবস্থা:**

- **ডিজিটাল সমন্বয়:** উদ্ধারকৃত শ্রমিকরা যাতে আবার ঋণের ফাঁদে না পড়েন, সেজন্য **ই-শ্রম (e-Shram) পোর্টালের** সাথে পুনর্বাসন প্রকল্পের যোগসূত্র তৈরি করা।
- **স্বচ্ছতা:** উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে **৩০,০০০ টাকার** তাৎক্ষণিক সহায়তা নিশ্চিত করা।

৩. **প্রতিরোধমূলক ও কাঠামোগত সংস্কার:**

- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:** মহাজনদের ওপর নির্ভরতা কমাতে ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে (যেমন: বলাঙ্গির, কালাহান্ডি) ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা।

- **সামাজিক সচেতনতা:** তৃণমূল স্তরে আইনি সচেতনতা শিবির করা যাতে শ্রমিকরা তাদের ঋণ মকুবের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারেন।

৪. **আন্তঃরাজ্য সমন্বয়:**

- পরিযায়ী শ্রমিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে একটি **কেন্দ্রীয় ট্র্যাকিং সিস্টেম** তৈরি করা (বিশেষ করে উড়িষ্যা বা বিহার থেকে পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ু যাওয়া শ্রমিকদের জন্য)

উপসংহার

১৯৭৬ সালের আইনের ৫০ বছর পর, **বন্ধকী শ্রম** নির্মূল করার জন্য কেবল উদ্ধার করলেই হবে না, প্রয়োজন সামগ্রিক পুনর্বাসন। জেলা নজরদারি বৃদ্ধি, সময়মতো আর্থিক সহায়তা এবং BNS ২০২৩-এর কঠোর প্রয়োগই পারে এই দারিদ্র্য ও ঋণের চক্র ভেঙে SDG ৮.৭ অর্জন করতে।

প্রশ্ন: *ভারতে **বন্ধকী শ্রম** প্রথা নির্মূল করার জন্য সাংবিধানিক এবং আইনি কাঠামোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন। এর বাস্তবায়ন এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

2.3.2. বিমুক্ত জাতিদের (Denotified Tribes) জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণিবিভাগ

প্রেক্ষাপট

- কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক সম্প্রতি **বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs)** নেতাদের আশ্বাস দিয়েছে যে, ২০২৭ সালের জনশুমারির দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের সম্প্রদায়ের তথ্য গণনা করা হবে।
- দশকের পর দশক ধরে প্রায় **১০ কোটিরও বেশি মানুষের** 'পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা' দূর করতে একটি "স্বতন্ত্র সেন্সাস কলাম" বা পৃথক তালিকার যে দাবি ছিল, এই পদক্ষেপ তারই প্রতিফলন।
- এর মূল লক্ষ্য হলো SC, ST এবং OBC-দের মতো এদেরও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করে ঐতিহাসিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো।
- ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তর নীতিগতভাবে এতে সম্মত হলেও, এই সম্প্রদায়গুলোর জন্য একটি **সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক বিভাগ** না থাকা এখনও একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

ভারতের বিমুক্ত জাতি (DNTs) কারা?

- **বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs):** এই সম্প্রদায়গুলোকে ব্রিটিশ শাসনামলে "অপরাধী জাতি" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসকদের ধারণা ছিল যে, নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায় জন্মগতভাবেই অপরাধপ্রবণ।
- **যাযাবর উপজাতি (NTs):** এই সম্প্রদায়গুলো যাযাবর জীবনযাপন করে। জীবিকা নির্বাহের জন্য (যেমন: পশুপালন, ব্যবসা বা ঐতিহ্যগত পরিষেবা) এরা স্থায়ী বসতি ছাড়াই নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্থান পরিবর্তন করে (উদা: বাঞ্জারা, রাবারি)।
- **আধা-যাযাবর উপজাতি (SNTs):** এই গোষ্ঠীগুলো আংশিক বসতি ও ঋতুভিত্তিক পরিযানের সমন্বয় ঘটায়। পশুপালনের প্রয়োজনে এরা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে গবাদি পশু নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে (উদা: গাড্ডি, মালধারি)।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ভারতে বিমুক্ত জাতিদের বিবর্তন

১. **ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট (CTA), ১৮৭১:** ১৮৭১ সালে প্রণীত এই আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়কে "অপরাধী উপজাতি" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তাদের ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসকরা অপরাধকে জাতপ্রথার সাথে যুক্ত করে একে "বংশগত" বলে প্রচার করত।

২. **স্বাধীনতার পর বিমুক্তি (১৯৫২):** আয়ঙ্গার কমিটির (১৯৪৯) সুপারিশে ভারত সরকার ১৯৫২ সালে এই বৈষম্যমূলক আইনটি বাতিল করে। আগে তালিকাভুক্ত (Notified) গোষ্ঠীগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে "বিমুক্ত" (Denotified) হয়, যার ফলে **'Denotified Tribes'** শব্দটির উৎপত্তি।

৩. **হ্যাবিচুয়াল অফেন্ডার আইন (Habitual Offender Laws):** আইনটি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু রাজ্য ১৯৫২ সালে **'অভ্যাসগত অপরাধী আইন'** কার্যকর করে। যদিও এতে "বংশগত অপরাধী" তকমা সরিয়ে দেওয়া হয়, তবুও এই সম্প্রদায়গুলোর ওপর পুলিশি নজরদারি ও টার্গেট করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

৪. **ক্রমাগত প্রান্তিককরণ:** আইনিভাবে **"অপরাধী জাতি"** তকমা ঘুচে গেলেও স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও এদের ওপর সামাজিক কলঙ্ক, পুলিশি পক্ষপাতিত্ব এবং সামাজিক বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে।

ভারতে বিমুক্ত জাতি (DNTs) গণনার ইতিহাস

- **প্রাথমিক জনশুমারি শ্রেণিবিভাগ (১৮৭১–১৯৩১):** যদিও ১৮৭১ সালের 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট' (CTA) এবং আধুনিক জনশুমারি একই সাথে শুরু হয়েছিল, তবে ১৯১১ সাল থেকে এই সম্প্রদায়গুলোকে স্পষ্টভাবে **"অপরাধী উপজাতি"** (Criminal Tribes) হিসেবে নথিবদ্ধ করা শুরু হয়। ১৯১১ এবং ১৯৩১ সালের জনশুমারিতে তাদের আলাদাভাবে গণনা করা হয়েছিল; ১৯৩১ সালই ছিল এই ধরনের শেষ জনশুমারি।
- **স্বাধীনতা-পরবর্তী স্থবিরতা (১৯৫২):** CTA বাতিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে **'বিমুক্তি'** (Denotification)-র পর এদের পৃথকভাবে গণনা করা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীন ভারত এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, জাতিভিত্তিক গণনা শুধুমাত্র **তফসিলি জাতি (SC)** এবং **তফসিলি উপজাতি (ST)**-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ফলে বিমুক্ত জাতিগুলো (DNTs) কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত স্বীকৃতি পায়নি।
- **প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ (১৯৪৯ থেকে): আয়ঙ্গার কমিশন (১৯৪৯)** প্রথম এই জাতিগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে। ১৯৫২ সালের পর, বেশ কিছু সম্প্রদায়কে অনগ্রসর শ্রেণির অধীনে **"বিমুক্ত জাতি" (Vimukt Jatis)** হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। সময়ের সাথে সাথে এদের বেশিরভাগই SC, ST বা OBC বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- **লোকুর কমিটি (১৯৬৫):** এই কমিটি লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়নের খাতিরে বিমুক্ত ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে একটি **স্বতন্ত্র বিভাগ** হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেছিল।
- **নাগরিক সমাজ ও কমিশন (১৯৯৮ থেকে):** ১৯৯৮ সালে **মহাশ্বেতা দেবী** এবং **জি. এন. দেবী** 'বিমুক্ত, যাযাবর ও আধা-যাযাবর উপজাতি অধিকার রক্ষা গ্রুপ' (DNT-RAG) গঠন করেন। এর ফলে একটি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ এবং পরবর্তীতে **বি.এস. রেঙ্কে**-র সভাপতিত্বে প্রথম **'ন্যাশনাল কমিশন ফর ডিএনটি'** (২০০৮) গঠিত হয়। **ভিকু রামজি ইদাতে**-র অধীনে দ্বিতীয় কমিশন ২০১৭ সালে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। উভয় কমিশনই সঠিক শনাক্তকরণের জন্য একটি **বিশেষ জনশুমারির** ওপর জোর দেয়।
- **নীতি আয়োগের ঝুলে থাকা গবেষণা:** অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে নীতি আয়োগ একটি গবেষণার নির্দেশ দিয়েছিল, যা এই গোষ্ঠীগুলোর শ্রেণিবিভাগের সুপারিশ করে। তবে সেই রিপোর্টটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

বিমুক্ত জাতি (DNTs) সংক্রান্ত ইদাত (Idate) কমিশনের মূল সুপারিশসমূহ:

ভিকু রামজি ইদাত কমিশন বিমুক্ত জাতিগুলোর সামাজিক ও আইনি অবস্থান পর্যালোচনার জন্য গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান সুপারিশগুলো হলো:

১. **সম্প্রদায় শনাক্তকরণ:** প্রায় ১,২০০টি সম্প্রদায়কে বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি (DNTs, NTs, SNTs) হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। এর মধ্যে প্রায় **২৬৭–২৬৮টি সম্প্রদায়কে** কোনো সাংবিধানিক বিভাগের (SC/ST/OBC) বাইরে পাওয়া গেছে।

২. **সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব:** SC এবং ST-এর পাশাপাশি **"তফসিলি বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতি"** নামে একটি **তৃতীয় তফসিল (Third Schedule)** প্রবর্তনের সুপারিশ, যাতে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

৩. **স্থায়ী জাতীয় কমিশন:** সাময়িক ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি **স্থায়ী জাতীয় কমিশন** গঠনের প্রস্তাব, যা এদের জন্য গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম তদারকি করবে।

৪. **অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট (PoA Act)-এর সম্প্রসারণ:** তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (**অত্যাচার প্রতিরোধ**) আইনটি এই সম্প্রদায়গুলোর জন্যও কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা জাতিগত সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা পায়।

৫. **অভ্যন্তরীণ উপ-শ্রেণিবিভাগ (Sub-Classification):** সংরক্ষিত শ্রেণিগুলোর অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিভাগ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যাযাবর ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে **"স্তরবিন্যাসিত অনগ্রসরতা" (Graded Backwardness)** দূর করতে উপ-শ্রেণিবিভাগের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিমুক্ত জাতিগুলোর (DNTs) জন্য পৃথক শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

- **তথ্যাদির ঘাটতি পূরণ:** একটি নির্দিষ্ট জনশুমারি তালিকা দীর্ঘদিনের **'পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা'** দূর করবে। এর ফলে সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অঞ্চল-ভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।
- **শক্তিশালী আইনি ভিত্তি:** সুনির্দিষ্ট **সাংবিধানিক স্বীকৃতি** এই সম্প্রদায়গুলোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপ (Affirmative Action), বৃত্তি, কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং সুরক্ষামূলক আইনি ব্যবস্থার ভিত আরও মজবুত করবে।
- **অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকার নির্ধারণ:** বিমুক্ত জাতিগুলোর মধ্যে **উপ-শ্রেণিবিভাগ** করা হলে সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত যাযাবর ও আধা-যাযাবর গোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করা সহজ হবে। এটি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত **'স্তরবিন্যাসিত অনগ্রসরতা'**-র ধারণাকেই প্রতিফলিত করে।
- **সুশাসনের প্রতিফলন:** আনুষ্ঠানিক শ্রেণিবিভাগ সংশয়মুক্ত শংসাপত্র (Certification) প্রদান প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে, নীতি তদারকি বাড়াবে এবং স্বচ্ছ ও প্রয়োজন-ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করবে।

বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের (DNTs) প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ঔপনিবেশিক আমলের কলঙ্কজনক তকমাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে গেলেও, ভারতের উন্নয়নের মূলধারা থেকে এই সম্প্রদায়গুলো আজও অনেক দূরে। তারা একাধারে ঐতিহাসিক, আইনি এবং সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন:

১. **আর্থ-সামাজিক প্রান্তিককরণ এবং সম্পদের অভাব:**

- **প্রজন্মগত দারিদ্র্য:** কাঠামোগত বঞ্চনার ফলে এদের মধ্যে সাক্ষরতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থায়ী বাসস্থানের তীব্র অভাব রয়েছে। বংশপরম্পরায় এদের কোনো সম্পদ বা ভূ-সম্পত্তি নেই বললেই চলে।
- **নথিগত অদৃশ্যতা:** যাযাবর জীবনযাপনের কারণে এদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা থাকে না। ফলে রেশন কার্ড, ভোটার আইডি বা জাতিগত শংসাপত্রের মতো প্রয়োজনীয় **পরিচয়পত্র** সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটি তাদের রাষ্ট্রীয় কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

২. **সামাজিক কলঙ্কের 'দ্বৈত বোঝা':**

- **পদ্ধতিগত প্রোফাইলিং:** ১৯৫২ সালে আইন বাতিলের দীর্ঘ সময় পরেও প্রশাসনিক মানসিকতায় এদের প্রতি **"অপরাধপ্রবণতার কলঙ্ক"** আজও রয়ে গেছে।
- **জীবনযাত্রার অপরাধীকরণ:** তাদের ঐতিহ্যগত যাযাবর যাতায়াত ও পেশাকে প্রায়ই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের **'অভ্যাসগত অপরাধী আইন'** (Habitual Offenders Acts)-এর অধীনে তারা প্রায়ই পুলিশি হয়রানির শিকার হয়, যা আসলে ঔপনিবেশিক আমলের নজরদারিরই এক আধুনিক রূপ।

৩. **অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ও অস্পষ্টতা:**

- **সুবিধা বণ্টন ও বিচ্যুতি:** অধিকাংশ বিমুক্ত জাতি বর্তমানে SC, ST বা OBC তালিকার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর ফলে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়ে কোনো একক নীতিমালা তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ে।

- **'ক্রমোচ্চ অসমতা'র ফাঁদ:** সংরক্ষিত শ্রেণির বড় তালিকাগুলোর মধ্যে এই ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সামাজিকভাবে উন্নত গোষ্ঠীগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। ফলে সংরক্ষিত কোটার সুবিধাগুলো প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর কাছেই রয়ে যায়।

৪. **প্রশাসনিক ও আইনি অনিশ্চয়তা:**

- **শ্রেণিবিভাগের অনুপস্থিতি:** প্রায় **২৬৮টি বিমুক্ত সম্প্রদায়** এখনও পর্যন্ত কোনো SC, ST বা OBC তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই শ্রেণিবিভাগের অভাবে তারা সংবিধানের **১৫(৪) ও ১৬(৪)** অনুচ্ছেদের সুরক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা তাদের কোনো প্রকার সাংবিধানিক বা আইনি রক্ষাকবচ ছাড়াই চরম অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিচ্ছে।

সরকারি উদ্যোগ: সিড (SEED) প্রকল্প

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক কর্তৃক প্রবর্তিত SEED (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) প্রকল্পটি বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের জীবিকা, শিক্ষা, আবাসন এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমন্বিত সহায়তা প্রদান করে।

- **আর্থিক বরাদ্দ ও কার্যপদ্ধতি:** ২০২০-২৫ অর্থবর্ষের জন্য **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি NRLM, ফ্রি কোচিং, আবাসন প্রকল্প এবং ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির মতো বিদ্যমান পরিকাঠামোগুলোর মাধ্যমেই পরিচালিত হয়।
- **SEED প্রকল্পের সমস্যাসমূহ:**
  - **DNT শংসাপত্রের বাধ্যবাধকতা:** প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার প্রধান শর্ত হলো রাজ্য সরকার প্রদত্ত **DNT শংসাপত্র**। এটি SC/ST/OBC পরিচয়ের পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র পরিচয় হিসেবে থাকতে হবে।
  - **শংসাপত্র প্রাপ্তিতে বাধা:** বাস্তবে দেখা যায় কেবল হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যের কিছু জেলায় এই শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ সত্ত্বেও অনেক রাজ্য এটি দিতে দেরি করছে বা অস্বীকার করছে।
  - **তহবিলের অপব্যবহার:** প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম, যা প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের প্রভাবকে সীমিত করে দিচ্ছে।
  - **নোডাল অথরিটির অভাব:** প্রকল্পের কাজ বিভিন্ন সংস্থার (NRLM, স্বাস্থ্য দপ্তর ইত্যাদি) মধ্যে বিভক্ত। ফলে নির্দিষ্ট কোনো একক প্রতিষ্ঠান নেই যারা বিমুক্ত জাতিদের সার্বিক ফলের জন্য জবাবদিহি করবে।

আগামীর পথ: কৌশলগত নীতি ও প্রশাসনিক সংস্কার:

ঔপনিবেশিক আমলের সন্দেহভাজন তকমা থেকে বেরিয়ে এসে সাংবিধানিক সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সংস্কারগুলো অত্যন্ত জরুরি:

১. **২০২৭ সালের জনশুমারির মাধ্যমে তথ্যনির্ভর শাসন:**

- **নির্দিষ্ট শনাক্তকরণ:** পরিসংখ্যানগত অদৃশ্যতা কাটাতে রেজিস্ট্রার জেনারেলের দপ্তরকে অবশ্যই DNT/NT/SNT-দের জন্য একটি **পৃথক কলাম বা কোড** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **মানসম্মত প্রোটোকল:** যাযাবর জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখে স্ব-শনাক্তকরণের স্পষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, যাতে কোনো উপ-গোষ্ঠী বাদ না পড়ে।

২. **সাংবিধানিক ও আইনি ক্ষমতায়ন:**

- **স্বতন্ত্র তফসিল:** ইদাত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিমুক্ত জাতিদের একটি স্বতন্ত্র আইনি পরিচয় দিতে **সাংবিধানিক সংশোধনী**র মাধ্যমে একটি পৃথক তফসিল তৈরি করতে হবে।
- **অত্যাচার প্রতিরোধ:** সামাজিক প্রোফাইলিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক হয়রানি থেকে রক্ষা করতে এদের **SC/ST (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন**-এর সমতুল্য আইনি সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

৩. **প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক শক্তিশালীকরণ:**

- **স্থায়ী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা:** বিমুক্ত জাতিদের অধিকার রক্ষা এবং কল্যাণমূলক কাজ তদারকির জন্য আইনি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি **স্থায়ী জাতীয় কমিশন** গঠন করতে হবে।
- **একীভূত শংসাপত্র প্রক্রিয়া:** শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত ও ডিজিটাল করতে হবে যাতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এটি অভিন্নভাবে পাওয়া যায়।

৪. **জনকল্যাণমূলক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ (SEED প্রকল্প):**

- **সরাসরি বাস্তবায়ন:** প্রকল্পের তহবিল ব্যবহারের গতি বাড়াতে এবং প্রশাসনিক বিলম্ব কমাতে একটি বিশেষায়িত **DNT কল্যাণ বোর্ড**-এর মাধ্যমে সরাসরি এটি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা:** যাযাবর পরিবারগুলো যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, তখন যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ এনরোলমেন্ট ইউনিট এবং ডিজিটাল রেকর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

বিমুক্ত, যাযাবর এবং আধা-যাযাবর উপজাতিরা আজও ভারতের **"প্রান্তিকদের মধ্যেও অতি-প্রান্তিক"** হিসেবে রয়ে গেছে। ২০২৭ সালের জনশুমারিতে এদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ; তবে একে সফল করতে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো এবং স্বতন্ত্র **সাংবিধানিক পরিচয়** নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, এই সম্প্রদায়গুলো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য এবং সামাজিকভাবে বহিষ্কৃত অবস্থাতেই থেকে যাবে।

প্রশ্ন: *ভারতের বিমুক্ত (Denotified), যাযাবর (Nomadic) এবং আধা-যাযাবর উপজাতিদের (Semi-Nomadic Tribes) আর্থ-সামাজিক ও আইনি চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করুন। এই সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত পদক্ষেপের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

2.3.3. আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন

প্রেক্ষাপট

- আদিবাসী সম্প্রদায়ের **নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের** বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। অধিকাংশ **আদিবাসী প্রথাগত আইন** নারীদের সম্পত্তির ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করে না।
- তাছাড়া, **হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬**, যা কন্যাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেয়, সেটি **তফসিলি উপজাতিদের** (Scheduled Tribes) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর ফলে আদিবাসী নারীরা এই আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন।
- তবে সাম্প্রতিককালে, **ভারতের** সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় দ্বিধা বিভক্ত অবস্থান নিয়েছে। কখনও **'হিন্দুকরণ'** (Hinduisation)-এর ভিত্তিতে অধিকার দেওয়া হয়েছে, আবার কখনও **সংবিধিবদ্ধ ছাড়ের** (Statutory Exemptions) দোহাই দিয়ে অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট: হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও আদিবাসী বঞ্চনা

আদিবাসী নারীদের আইনি লড়াইয়ের প্রধান বাধা হলো **হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA), ১৯৫৬**-এর গঠনগত সীমাবদ্ধতা:

- **ধারা ২(১)-এর পরিধি:** এই ধারা অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীরা এই আইনের আওতাভুক্ত। অতীতে আদালত অনেক সময় আদিবাসীদের 'হিন্দু রীতিনীতি' পালনের ভিত্তিতে এই আইনের অধীনে নিয়ে আসত, যাকে **'হিন্দুকরণ'** বলা হয়।
- **ধারা ২(২)-এর বাধা:** এটি একটি বিশেষ ধারা যা স্পষ্ট করে দেয় যে, ধারা ২(১)-এ যা-ই থাকুক না কেন, **তফসিলি উপজাতিদের (ST)** ওপর এই আইন কার্যকর হবে না (যদি না কেন্দ্র সরকার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে)।
- **২০০৫ সালের সংশোধনীর প্রভাব:** ২০০৫ সালে পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যাদের সমানাধিকার দেওয়া হলেও ধারা ২(২)-এর কারণে আদিবাসী নারীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যান।

- **বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি:** এর ফলে একই অঞ্চলের একজন অ-আদিবাসী নারী আইনি সুরক্ষা পেলেও, একজন আদিবাসী নারী কেবল প্রথাগত আইনের ওপর নির্ভরশীল থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই **প্রথাগত আইন** পুরুষতান্ত্রিক, যা জমি কেবল পুরুষ বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।

'হিন্দু'র সংজ্ঞা ও 'হিন্দুকরণ'-এর সমালোচনা

'হিন্দু' শব্দের কোনো নির্দিষ্ট বা কঠোর সংজ্ঞা না থাকায় আদিবাসীদের আইনি অবস্থান জটিল হয়ে পড়েছে:

- **আদালতের ব্যাখ্যা:** ১৯৬৬ সালের একটি ঐতিহাসিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট হিন্দু ধর্মকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বদলে **'জীবনযাপনের পদ্ধতি'** (Way of life) হিসেবে বর্ণনা করেছে।
- **পরিচয়ের সংকট:** কোনো আদিবাসী ব্যক্তি যদি দীর্ঘকাল ধরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ত্যাগ করে হিন্দু রীতিনীতি পালন করেন, তবেই তাকে হিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়।
- **আদিবাসীদের ওপর প্রভাব:** এর ফলে আদিবাসী নারীদের সামনে একটি কঠিন শর্ত দাঁড়িয়ে যায়—হয় অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য নিজের **জাতিগত পরিচয় ত্যাগ করে** 'হিন্দু' হতে হবে, অথবা নিজের পরিচয় বজায় রেখে **ভূমিহীন** থাকতে হবে।

বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ: দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সাম্প্রতিক রায়গুলোতে 'রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা' (Transformative Constitutionalism)-এর মাধ্যমে আদিবাসী প্রথাগত আইনের সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **সাম্যের নীতি (রাম চরণ বনাম সুখরাম, ২০২৫):** আদালত স্বীকার করেছে যে, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কন্যাদের বঞ্চিত করা **ধারা ১৪** (সাম্যের অধিকার) এবং **ধারা ১৫(১)** (বৈষম্যহীনতা)-এর পরিপন্থী। কোনো নির্দিষ্ট আইন না থাকলে 'ন্যায়বিচার, সাম্য এবং শুদ্ধ বিবেক'-এর ভিত্তিতে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- **আদালতের এক্তিয়ার পুনর্নির্ধারণ (নওয়াং বনাম বাহাদুর, ২০২৫):** সুপ্রিম কোর্ট হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের একটি রায় বাতিল করে স্পষ্ট জানায় যে, আদিবাসীদের ওপর জোর করে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA) চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের নেই; এই দায়িত্ব কেবল **সংসদের** (Parliament)।
- **নিজস্ব সত্তার সুরক্ষা:** আদালত নিশ্চিত করেছে যে, কেন্দ্র সরকার নতুন কোনো নিয়ম জারি না করা পর্যন্ত আদিবাসীদের উত্তরাধিকার তাদের নিজস্ব **প্রথাগত রীতিনীতি** অনুসারেই চলবে। এর ফলে 'হিন্দুকরণ'-এর মাধ্যমে অধিকার পাওয়ার অনিশ্চিত প্রথাটির অবসান ঘটেছে।

এর কৌশলগত গুরুত্ব: কেন এটি জরুরি?

আদিবাসী উত্তরাধিকার আইনের এই পুনর্মূল্যায়ন কেবল আইনি বিষয় নয়, এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী:

- **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:** সম্পত্তির অধিকার থাকলে আদিবাসী নারীরা ঋণের জন্য বন্ধক রাখার সুযোগ পাবেন, যা তাঁদের **উদ্যোক্তা হওয়া এবং আর্থিক স্বনির্ভরতায়** সাহায্য করবে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনে একটি সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।
- **সামাজিক ন্যায়বিচার:** এই আইনি সংস্কার আদিবাসী নারীদের "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক" হিসেবে গণ্য হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে এবং সংবিধান প্রদত্ত **প্রকৃত সাম্য** (Substantive Equality) নিশ্চিত করবে।
- **স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন:** আদিবাসীদের ওপর জোর করে হিন্দু আইন না চাপিয়ে বরং তাদের জন্য **পৃথক আইন** তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। এর ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে।

বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ: সংস্কারের পথে বাধা

বিচারবিভাগীয় তৎপরতা সত্ত্বেও আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে:

- **ভূমি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়** (Land Alienation): পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকায় অনেক সম্প্রদায় আশঙ্কা করে যে, ভিন্ন জাতে বিয়ের মাধ্যমে জমি অ-আদিবাসীদের হাতে চলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, **ছোটনাগপুর প্রথা** (CNTSP Act, 1908) অনুযায়ী জমি কেবল পুরুষ বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

- **অলিখিত আইন ও অনিশ্চয়তা:** অলিখিত **প্রথাগত আইন** অনেক সময় পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবশালীদের দ্বারা অপব্যাখ্যার শিকার হয়। যেমন, নাগাল্যান্ডের **ধারা ৩৭১এ** অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা থাকতে পারে, যা প্রমাণ করা নারীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
- **পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা:** জমিকে কেবল 'পুরুষের সম্পত্তি' হিসেবে দেখার প্রবণতা এতটাই প্রবল যে, অনেক সময় আদালত থেকে অধিকার পেলেও সামাজিক চাপে নারীরা তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এটি সংবিধানের **ধারা ২১** (মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার)-এর পরিপন্থী।
- **আইনি শূন্যতা (Legal Limbo):** ২০২৫ সালের রায়গুলোতে আদালত সাম্যের কথা বললেও সরাসরি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (HSA) আদিবাসীদের ওপর প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছে। ফলে সংসদ নতুন আইন না করা পর্যন্ত আদিবাসী নারীরা এক ধরণের আইনি শূন্যতার মধ্যে রয়েছেন।
- **বাস্তবায়নের বৈষম্য:** শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে গোণ্ড (Gond) বা ওরাওঁ (Oraon) সম্প্রদায়ের মতো এলাকাগুলোতে **PESA বা গ্রামসভার** মাধ্যমেও নারীদের অধিকার সঠিকভবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

উত্তরণের পথ: বৈষম্য দূর করার উপায়

সাংবিধানিক নৈতিকতা এবং আদিবাসী স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সমন্বয় আনতে একটি বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

- **মিজোরাম মডেল অনুসরণ:** ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা বা ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলো মিজোরামের মতো নিজস্ব উত্তরাধিকার আইন তৈরি করতে পারে। যেখানে কন্যাদের অংশ দেওয়া হয়, আবার জমি যাতে অ-আদিবাসীদের হাতে না যায় তার সুরক্ষাকবচও থাকে।
- **সংসদীয় হস্তক্ষেপ:** যেহেতু আদালত সরাসরি আইন প্রয়োগ করতে পারে না, তাই সংসদের উচিত **'আদিবাসী উত্তরাধিকার আইন' (Tribal Succession Act)** প্রণয়ন করা। এটি ২০০৫ সালের হিন্দু আইনের সাম্য বজায় রাখবে কিন্তু আদিবাসীদের ভূমি মালিকানার ধরণকে (যেমন- FRA, 2006) শ্রদ্ধা জানাবে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি: জাতীয় তফসিলি উপজাতি কমিশন (NCST)** এবং আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত ন্যায়বিচারের জন্য 'ফাস্ট-ট্র্যাক ট্রাইবাল কোর্ট' তৈরি করা প্রয়োজন।
- **নীতিগত সমন্বয়:** বন অধিকার আইন (FRA) এবং PESA-র অধীনে জমি বণ্টনের সময় বাধ্যতামূলকভাবে 'জেন্ডার অডিট' বা লিঙ্গভিত্তিক নিরীক্ষা করতে হবে যাতে নারীদের নাম নথিপত্রে থাকে।

উপসংহার

আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের পুনর্মূল্যায়ন হলো **প্রকৃত সাম্য (Substantive Equality)** অর্জনের একটি ধাপ। আদিবাসীদের জোর করে 'হিন্দু' হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং সংবিধানের **ধারা ১৪ ও ১৫**-কে তাদের প্রথাগত জীবনের সাথে যুক্ত করাই মূল লক্ষ্য। প্রকৃত ক্ষমতায়ন তখনই আসবে, যখন একজন আদিবাসী নারীকে তার পৈতৃক অধিকার পাওয়ার জন্য নিজের **জাতিগত পরিচয় বিসর্জন দিতে হবে না**।

প্রশ্ন: *রূপান্তরমূলক সাংবিধানিকতা (Transformative Constitutionalism) মৌলিক অধিকারের সাথে প্রথাগত রীতিনীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে। আদিবাসী নারীদের উত্তরাধিকার অধিকারের প্রেক্ষিতে এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to attempt more questions...

সাধারণ স্টাডিজ ৩

3.1. অর্থনীতি

3.1.1. কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এর সারসংক্ষেপ

প্রসঙ্গ

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এটি **'কর্তব্য ভবন'**-এ (সাবেক নর্থ ব্লক ও সংলগ্ন এলাকা) প্রস্তুত প্রথম বাজেট। এই বাজেটটি মূলত তিনটি **'কর্তব্য'**-এর ওপর ভিত্তি করে রচিত, যা ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' হিসেবে গড়ে তোলার পথপ্রদর্শক।

বাজেট প্রাক্কলন (Budget Estimates)

- **মোট ব্যয় ও আয়:** মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে **৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা** এবং ঋণ-বহির্ভূত মোট প্রাপ্তি ধরা হয়েছে **৩৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা**।
- **কর সংগ্রহ:** কেন্দ্রের নিট কর প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে **২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা**।
- **ঋণ গ্রহণ:** মোট বাজার ঋণ ধরা হয়েছে **১৭.২ লক্ষ কোটি টাকা** এবং তারিখযুক্ত সিকিউরিটিজ থেকে নিট বাজার ঋণ **১১.৭ লক্ষ কোটি টাকা**।
- **সংশোধিত প্রাক্কলন (RE 2025-26):** ২০২৫-২৬-এর সংশোধিত মোট ব্যয় ৪৯.৬ লক্ষ কোটি টাকা, যার মধ্যে মূলধনী ব্যয় (CapEx) প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা।
- **রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit):** ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা GDP-র **৪.৩%**। ২০২৫-২৬-এর সংশোধিত প্রাক্কলনে এটি ৪.৪% রাখা হয়েছিল।
- **ঋণ-জিডিপি অনুপাত:** ২০২৬-২৭-এ এটি ধরা হয়েছে **৫৫.৬%**, যা আগের বছরের (৫৬.১%) তুলনায় কম।

I. প্রথম কর্তব্য: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা

এই লক্ষ্যে ৬টি প্রধান পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে:

১. কৌশলগত ও ফ্রন্টিয়ার সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি

- **বায়োফার্মা শক্তি (Biopharma SHAKTI):** ভারতকে বৈশ্বিক বায়োফার্মা হাবে পরিণত করতে ৫ বছরে **১০,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ। ৩টি নতুন NIPER তৈরি এবং ৭টি বর্তমান প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ হবে। ১০০০টিরও বেশি স্বীকৃত ক্লিনিকাল ট্রায়াল সাইট তৈরি হবে।
- **সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ (ISM 2.0):** দেশীয় প্রযুক্তিতে চিপ তৈরির সরঞ্জাম, মেটেরিয়াল এবং ভারতীয় IP (Intellectual Property) তৈরির ওপর জোর।
- **ইলেকট্রনিক্স:** ইলেকট্রনিক্স উপাদান উৎপাদন প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়িয়ে **৪০,০০০ কোটি টাকা** করা হয়েছে।
- **রেয়ার আর্থ করিডোর (Rare Earth Corridors):** ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে খনিজ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ বাড়াতে এই বিশেষ করিডোর তৈরি হবে।
- **রাসায়নিক পার্ক:** ৩টি ডেডিকেটেড কেমিক্যাল পার্ক 'চ্যালেঞ্জ মোড'-এ তৈরি হবে।

২. মূলধনী পণ্য (Capital Goods) ও টেক্সটাইল

- **হাই-টেক টুল রুম:** CPSE-গুলির মাধ্যমে উচ্চ-মানের যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য ডিজিটাল অটোমেটেড সার্ভিস ব্যুরো স্থাপন।

- **কন্টেইনার উৎপাদন:** ৫ বছরে **১০,০০০ কোটি টাকা** ব্যয়ে বিশ্বমানের কন্টেইনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম তৈরি।
- **ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল প্রোগ্রাম:**
  - **ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম:** রেশম, পশম, পাট এবং নতুন যুগের তন্তুর উৎপাদন বাড়ানো।
  - **মেগা টেক্সটাইল পার্ক:** টেকনিক্যাল টেক্সটাইল এবং ভ্যালু এডিশনের ওপর জোর।
  - **মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ:** খাদি ও হস্তশিল্পকে বিশ্ববাজারের সাথে যুক্ত করা।

৩. চ্যাম্পিয়ন SME ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ

- **SME গ্রোথ ফান্ড:** ভবিষ্যৎ 'চ্যাম্পিয়ন' শিল্প তৈরি করতে **১০,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ।
- **কর্পোরেট মিত্র:** Tier-II ও Tier-III শহরে ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়তার জন্য আইসিএআই (ICSI), আইসিএসআই (ICSAI)-এর মাধ্যমে বিশেষ পেশাদার ক্যাডার তৈরি।

৪. পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ

- **পাবলিক ক্যাপেক্স:** ২০২৬-২৭-এ বাড়িয়ে **১২.২ লক্ষ কোটি টাকা** করা হয়েছে।
- **ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড:** বেসরকারি বিনিয়োগের ঝুঁকি কমাতে এই তহবিল গঠন।
- **লজিস্টিকস:**
  - **ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর:** ডানকুনি (পূর্ব) থেকে সুরাট (পশ্চিম) পর্যন্ত সংযোগ।
  - **জলপথ:** ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ (NW) সচল করা। শুরুতে ওড়িশার খনিজ এলাকা সংযোগকারী **NW-5** অগ্রাধিকার পাবে। বারানসী ও পাটনায় জাহাজ মেরামতির ব্যবস্থা।
  - **উপকূলীয় কার্গো:** অভ্যন্তরীণ জলপথের শেয়ার ৬% থেকে বাড়িয়ে ২০৪৭ সালের মধ্যে ১২% করার লক্ষ্য।

৫. শক্তি নিরাপত্তা ও সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন (CER)

- **কার্বন ক্যাপচার (CCUS):** ৫ বছরে **২০,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ।
- **হাই-স্পিড রেল:** ৭টি করিডোর (মুম্বাই-পুনে, পুনে-হায়দরাবাদ, দিল্লি-বারানসী, **বারানসী-শিলিগুড়ি** ইত্যাদি) উন্নয়ন।
- **মিউনিসিপ্যাল বন্ড:** ১০০০ কোটি টাকার বেশি বন্ড ইস্যু করলে ১০০ কোটি টাকার ইনসেনটিভ।

II. দ্বিতীয় কর্তব্য: আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও মানবসম্পদ বৃদ্ধি

- **স্বাস্থ্য:** ১ লক্ষ নতুন অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল (AHP) তৈরি। ৫টি রিজিওনাল মেডিকেল হাব তৈরি করে চিকিৎসা পর্যটন বাড়ানো।
- **আয়ুষ:** ৩টি নতুন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ।
- **শিক্ষা ও দক্ষতা:**
  - প্রতিটি জেলায় একটি করে **মেয়েদের হোস্টেল**।
  - শিল্প করিডোরের কাছে ৫টি **ইউনিভার্সিটি টাউনশিপ**।
  - ১০,০০০ গাইডকে আইআইএম-এর (IIM) সহায়তায় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- **অরেঞ্জ ইকোনমি (AVGC):** ১৫,০০০ স্কুলে এবং ৫০০ কলেজে গেমিং ও কমিক্স (AVGC) ল্যাব স্থাপন।
- **ঐতিহ্যবাহী পর্যটন:** লোথাল, ধোলাভিরা, সারনাথ সহ ১৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটের সামগ্রিক উন্নয়ন।

III. তৃতীয় কর্তব্য: সবকা সাথ, সবকা বিকাশ (অন্তর্ভুক্তি)

- **কৃষি:** ৫০০টি জলাধার ও অমৃত সরোবরের উন্নয়ন। উপকূলীয় এলাকায় নারিকেল, চন্দন, কোকো এবং কাজু চাষে জোর। **ভারত-বিস্তার (Bharat-VISTAAR)** নামক AI টুল কৃষকদের গবেষণাগারের তথ্য পৌঁছে দেবে।
- **দিব্যাঙ্গজন:** আইটি এবং হসপিটালিটি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প।
- **মানসিক স্বাস্থ্য:** উত্তর ভারতে **NIMHANS-2** স্থাপন। রাঁচি ও তেজপুরের ইনস্টিটিউটগুলোর উন্নয়ন।
- **পূর্বোদয় ও উত্তর-পূর্ব:**

- **দুর্গাপুরে** নতুন সংযোগকারী নোড সহ পূর্ব উপকূল শিল্প করিডোর।
- অরুণাচল, সিকিম, অসম, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় **বৌদ্ধ সার্কিট** উন্নয়ন।
- পূর্বোদয় রাজ্যগুলোতে ৫টি পর্যটন কেন্দ্র ও ৪,০০০ ই-বাস।

- **আর্থিক ফেডারেলিজম:** ১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলিকে **১.৪ লক্ষ কোটি টাকা** অনুদান।

আর্থিক ফেডারেলিজম (যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো)

১৬তম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে **১.৪ লক্ষ কোটি টাকা** 'অর্থ কমিশন অনুদান' (Finance Commission Grants) হিসেবে প্রদান করেছে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

বাজেটের সবল দিকসমূহ (Strengths)

- **আর্থিক শৃঙ্খলার সঙ্গে জোরালো বৃদ্ধির প্রচেষ্টা:** মূলধনী ব্যয় (Capital Expenditure) বাড়িয়ে **১২.২ লক্ষ কোটি টাকা** করা হয়েছে, যেখানে রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit) ২০২৫-২৬-এর ৪.৪% থেকে কমিয়ে GDP-র **৪.৩%**-এ নামিয়ে আনা হয়েছে।
- **উৎপাদন এবং স্বনির্ভরতার ওপর গুরুত্ব:** ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের জন্য **৪০,০০০ কোটি টাকা**, 'বায়োফার্মা শক্তি' (Biopharma SHAKTI)-র জন্য **১০,০০০ কোটি টাকা** এবং কন্টেইনার উৎপাদনের জন্য **১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি** বরাদ্দ দেশের শিল্প পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।
- **পরিকাঠামো-ভিত্তিক 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট':** লজিস্টিক দক্ষতা বাড়াতে মালবাহী করিডোর, ২০টি জাতীয় জলপথ এবং হাই-স্পিড রেলে বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে মোট **৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা** ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।
- **MSME এবং উদ্যোক্তাদের সহায়তা:** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য **১০,০০০ কোটি টাকার 'SME গ্রোথ ফান্ড'** এবং 'সেলফ-রিলায়েন্ট ইন্ডিয়া ফান্ড'-এ অতিরিক্ত **২,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ ঝুঁকি-মূলধন (Risk Capital) প্রাপ্তি সহজ করবে।
- **শক্তি এবং স্থায়িত্বের অভিমুখ:** জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন এবং স্টোরেজ (CCUS)-এর জন্য আগামী পাঁচ বছরে **২০,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
- **মানবসম্পদ এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর জোর:** ১,০০,০০০ অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল তৈরি, ১৫,০০০ স্কুল ও ৫০০টি কলেজে AVGC ল্যাব স্থাপন এবং পর্যটন দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে।
- **সুষম আঞ্চলিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ:** 'পুর্বোদয়' ও উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য বিশেষ ব্যয়, কৃষি (৫০০টি জলাধার ও অমৃত সরোবর) এবং রাজ্যগুলিকে **১.৪ লক্ষ কোটি টাকার** অর্থ কমিশন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বাজেটের উদ্বেগের দিকসমূহ

- **বিশাল ঋণের প্রয়োজনীয়তা:** ১৭.২ লক্ষ কোটি টাকার মোট বাজার ঋণ সুদের হারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত (Crowding-out risk) করার ঝুঁকি তৈরি করে।
- **রাজস্ব আদায়ের অতি-আশাবাদী লক্ষ্যমাত্রা:** নিট কর প্রাপ্তি **২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা** ধরা হয়েছে, যা বৈশ্বিক মন্দা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার কারণে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
- **বাস্তবায়নের সক্ষমতা সংক্রান্ত ঝুঁকি:** ২০০টি শিল্প ক্লাস্টার পুনরুজ্জীবন, ২০টি জাতীয় জলপথ এবং ৭টি হাই-স্পিড রেল করিডোরের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অত্যন্ত জোরালো সমন্বয় প্রয়োজন।
- **কৃষকদের জন্য সীমিত প্রত্যক্ষ আয় সহায়তা:** পরিকাঠামো উন্নয়ন (৫০০টি জলাধার, উচ্চ মূল্যের ফসল) সত্ত্বেও কৃষকদের প্রত্যক্ষ নগদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বড় কোনো বৃদ্ধি না ঘটায় স্বল্পমেয়াদী স্বস্তি বিলম্বিত হতে পারে।
- **বেসরকারি বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা:** 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড' ঘোষণা করা হলেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করবে এর কাঠামোগত নকশার ওপর; বেসরকারি মূলধনী ব্যয়ের (Private Capex) প্রতিক্রিয়া এখনও অস্পষ্ট।
- **সামাজিক ক্ষেত্রে বরাদ্দের অস্পষ্টতা:** মানসিক স্বাস্থ্য, দিব্যাঙ্গজন বা দক্ষতা বৃদ্ধির মতো কর্মসূচির ঘোষণা থাকলেও, কিছু নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য স্পষ্ট বাজেটারি বরাদ্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **বাস্তবায়ন জোরদার করা:** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়, ফলাফল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ এবং থার্ড-পার্টি অডিটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- **আর্থিক সংহতি গভীর করা:** করের ভিত্তি বাড়িয়ে, কর পরিপালন উন্নত করে এবং অপ্রয়োজনীয় ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে ঋণ-জিডিপি অনুপাত পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা।
- **বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ (Crowd-in):** বেসরকারি ও বিদেশি পুঁজি সংগ্রহের পথ প্রশস্ত করতে স্পষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিস্ক গ্যারান্টি ফান্ড' কার্যকর করা।
- **কৃষকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি করা:** কাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক আয় সহায়তা, শক্তিশালী কৃষি-ভ্যালু চেইন এবং রপ্তানি সুবিধার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ানো।
- **মানবসম্পদ উন্নয়নে গতি আনা:** পিপিপি (PPP) মডেল এবং জেলা-ভিত্তিক দক্ষতা ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে শিল্প চাহিদার সঙ্গে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য উদ্যোগকে সমন্বিত করা।
- **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** বাজেট প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

উপসংহার

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট মূলত তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে— **আর্থিক শৃঙ্খলা**, **শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি** এবং **মানবসম্পদ উন্নয়ন**। এই তিনের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার মজবুত ভিত্তি।

আধুনিক পরিকাঠামো, প্রযুক্তি-নির্ভর কৃষি, পরিবেশবান্ধব শক্তি এবং প্রতিটি অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে এই বাজেট ভারতের বিপুল জনশক্তিকে বিশ্বমানের টেকসই সমৃদ্ধিতে রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করেছে।

প্রশ্ন: *"কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং রাজস্ব শৃঙ্খলার প্রতি একটি সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে।" ভারতের 'Viksit Bharat 2047' লক্ষ্য-এর প্রেক্ষিতে এই বক্তব্যটি সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.1.2. ভারতের টেক্সটাইল ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ

প্রেক্ষাপট

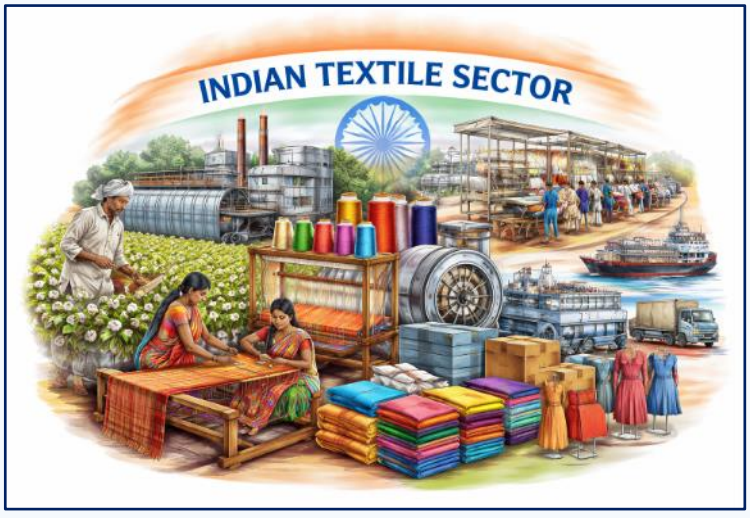

ইউনিয়ন বাজেট ২০২৬-২৭ এ টেক্সটাইল বা বস্ত্র খাতকে ভারতের প্রবৃদ্ধির কৌশলের জন্য একটি **'ফ্রন্টিয়ার সেক্টর'** বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । আগে এই খাতে বিচ্ছিন্নভাবে সাহায্য করা হতো, তবে এখন সরকার **'ফাইবার থেকে ফ্যাশন'** (তন্তু থেকে পোশাক)—এই নীতির মাধ্যমে একটি **সমন্বিত ভ্যালু-চেইন** পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন (ESG কমপ্লায়েন্স) এবং ব্যাপক হারে **কর্মসংস্থান** সৃষ্টি করা ।

ভারতীয় টেক্সটাইল খাতের বর্তমান অবস্থা

- **অর্থনৈতিক অবদান:** ভারতের **জিডিপি (GDP)-তে এই খাতের অবদান প্রায় ২%** ।
- **ম্যানুফ্যাকচারিং জিভিএ (GVA):** উৎপাদন খাতের মোট মূল্যের (GVA) **১১%** আসে এখান থেকে ।
- **রপ্তানি:** ২০২৫ অর্থবর্ষে ভারতের মোট রপ্তানির **৮.৬৩%** ছিল টেক্সটাইল পণ্য ।

- **বিশ্ব দরবারে অবস্থান:** ভারত বর্তমানে বিশ্বের **৬ষ্ঠ বৃহত্তম** টেক্সটাইল ও পোশাক রপ্তানিকারক দেশ (বিশ্ব বাজারের প্রায় ৪% অংশীদার) ।
- **বিশ্ব নেতৃত্বে ভারত:**
  - জমির পরিমাপ অনুযায়ী বিশ্বের **বৃহত্তম তুলা চাষি** ।
  - বিশ্বের **বৃহত্তম পাট উৎপাদক** ।
  - সিল্ক এবং তুলা উৎপাদনে বিশ্বে **২য়** ।
  - ম্যান-মেড ফাইবার (কৃত্রিম তন্তু বা MMF) এর ক্ষেত্রে বিশ্বের **২য় বৃহত্তম হাব** ।
  - পলিয়েস্টার এবং ভিসকস ফাইবার উৎপাদনে বিশ্বে **২য়** ।
- **রপ্তানি সাফল্য:** বিশ্বব্যাপী নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০২৫ অর্থবর্ষে রপ্তানি বেড়ে **৩৭.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে** পৌঁছেছে (যা ২০২৪ অর্থবর্ষে ছিল ৩৫.৮৭ বিলিয়ন ডলার) ।
- **কর্মসংস্থান:** কৃষির পরেই এটি ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম** কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী খাত; যেখানে **৪.৫ কোটিরও বেশি** মানুষ সরাসরি কাজ করছেন । বিশেষ করে নারী এবং গ্রামীণ যুবকদের অংশগ্রহণের হার এখানে অনেক বেশি ।

টেক্সটাইল খাতের গুরুত্ব

1. **অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি:** ভারতের মোট জিডিপিতে প্রায় ২% এবং উৎপাদন খাতের জিভিএ-তে ১১% অবদান রাখে । ২০৩০ সালের মধ্যে এই খাতের বাজার মূল্য **৩৫০ বিলিয়ন ডলারে** নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে ।
2. **সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব:** ৪.৫ কোটিরও বেশি মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে । উচ্চ নারী শ্রমিকের হার গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলেই **নারীর আর্থিক স্বাধীনতা** নিশ্চিত করছে ।
3. **গ্রামীণ জীবিকা:** দেশের **৬০ লক্ষ তুলা চাষী** এবং লক্ষ লক্ষ তাঁত ও হস্তশিল্প কারিগরের সাথে এটি নিবিড়ভাবে যুক্ত ।
4. **কৌশলগত ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব:**
   - **টেকনিক্যাল টেক্সটাইল:** শিল্প, চিকিৎসা (Meditech), প্রতিরক্ষা এবং অবকাঠামো খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতকে প্রযুক্তির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছে ।
   - **ঐতিহ্য রক্ষা:** বারানসি সিল্ক, কাঞ্চিপুরম, চান্দেরির মতো শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যকে **'ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট' (ODOP)** উদ্যোগের মাধ্যমে রক্ষা করা হচ্ছে ।
   - **স্থায়িত্বের নেতৃত্ব: 'টেক্স-ইকো' (Tex-Eco)** উদ্যোগের মাধ্যমে এই খাতটি পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ।
   - **কৌশলগত কেন্দ্র:** বিশ্বজুড়ে কোম্পানিগুলো যখন বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা খুঁজছে, তখন ভারত **'চায়না প্লাস ওয়ান' (China Plus One)** হিসেবে নিজেকে তুলে ধরছে ।

টেক্সটাইল খাতের জন্য সরকারি উদ্যোগ

ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর টেক্সটাইল সেক্টর (বাজেট ২০২৬–২৭)

- ২০২৬-২৭ বাজেটে ঘোষিত এই কর্মসূচিটি একটি সামগ্রিক **"ফাইবার-টু-ফ্যাশন"** বা তন্তু থেকে পোশাক তৈরির কৌশল ।
- **এই কর্মসূচির ৫টি মূল স্তম্ভ:**
  - **ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম (কাঁচামালের নিরাপত্তা):** প্রাকৃতিক তন্তুর (পাট, রেশম, পশম) পাশাপাশি **কৃত্রিম তন্তু (MMF)** এবং **টেকনিক্যাল টেক্সটাইল** উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন ।
  - **টেক্সটাইল সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প:** সুতো কাটা, বয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের আধুনিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে **পরীক্ষাগার ও সার্টিফিকেশন সেন্টার** স্থাপন ।
  - **জাতীয় তাঁত ও হস্তশিল্প কর্মসূচি:** কারিগরদের সহায়তার জন্য বিচ্ছিন্ন প্রকল্পগুলোকে একত্রিত করা এবং **প্রাকৃতিক ও ভেষজ রঙের** ব্যবহার বাড়ানো ।
  - **টেক্স-ইকো (Tex-Eco) উদ্যোগ:** ভারতীয় টেক্সটাইলকে **ইউরোপীয় গ্রিন ডিল** এবং পরিবেশগত মানদণ্ডের (ESG) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যাতে রফতানিতে 'কার্বন বর্ডার ট্যাক্স' বাধা না হয়ে দাঁড়ায় ।

- **সমর্থ ২.০ (Samarth 2.0):** শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ।

বাজেটীয় সমন্বয়: "3S" কৌশল

- **স্কেল (Scale):** পিএম মিত্র (PM MITRA) মেগা টেক্সটাইল পার্কের মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো ।
- **স্থায়িত্ব (Sustainability):** টেক্স-ইকো উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ।
- **গতি (Speed):** TReDS প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এমএসএমই (MSME)-দের দ্রুত নগদ অর্থ প্রদান এবং রফতানি বাধ্যবাধকতার সময়সীমা **৬ থেকে ১২ মাস** করা ।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদক্ষেপ

- **পিএম মিত্র পার্ক:** তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রে ৭টি পার্ক তৈরি হচ্ছে । এতে **৪,৪৪৫ কোটি টাকার** বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ৩ লক্ষ কর্মসংস্থানের আশা করা হচ্ছে ।
- **মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ:** খাদি ও গ্রামোদ্যোগকে বিশ্ব বাজারে ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরা ।
- **PLI স্কিম:** কৃত্রিম তন্তু (MMF) এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল উৎপাদনে বড় কোম্পানিগুলোকে উৎসাহ দেওয়া ।
- **MSME ও লিকুইডিটি:** ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য **১০,০০০ কোটি টাকার SME গ্রোথ ফান্ড** তৈরি করা হয়েছে ।
- **তুলা সংস্কার:** 'কস্তুরী কটন ভারত' ব্র্যান্ড এবং চাষিদের জন্য **'কপাস কিষাণ'** অ্যাপ চালু করা হয়েছে ।

ভারতীয় টেক্সটাইল খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত সমস্যা:** এই শিল্পের **৮০% এর বেশি হলো অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (MSME)** উদ্যোগ, ফলে চীন বা ভিয়েতনামের মতো বড় আকারে উৎপাদন করা কঠিন হয় ।

২. **পুরানো প্রযুক্তি:** অনেক কারখানায় এখনও পুরানো মেশিন ব্যবহার করা হয়, ফলে উৎপাদন কম হয় এবং বিদ্যুৎ খরচ বেশি হয়।

৩. **কাঁচামালের ভারসাম্যহীনতা:** ভারত মূলত তুলা-নির্ভর (৬০%), কিন্তু বিশ্বে এখন কৃত্রিম তন্তুর (MMF) চাহিদা বেশি ।

৪. **পরিবহন খরচ:** ভারতে লজিস্টিক খরচ জিডিপির প্রায় ১৩-১৪%, যা প্রতিযোগী দেশগুলোর (৮%) তুলনায় অনেক বেশি ।

৫. **শুল্ক অসুবিধা:** বাংলাদেশ বা ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো ইউরোপ বা আমেরিকার বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়, যা ভারত পায় না ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

1. **FTA-র সঠিক ব্যবহার:** ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের সাথে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** দ্রুত সম্পন্ন করা যাতে ১০-১২% শুল্ক বৈষম্য দূর হয় ।
2. **বাজার বৈচিত্র্যকরণ:** ইউএই, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো নতুন বাজারের দিকে নজর দেওয়া ।
3. **পণ্যের ধরণে পরিবর্তন:** সুতির পাশাপাশি বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী **পলিয়েস্টার এবং ভিসকস** উৎপাদনে জোর দেওয়া ।
4. **ট্র্যাকযোগ্যতা বা খোঁজ রাখা:** পণ্যের পরিবেশগত মান প্রমাণ করতে **ব্লকচেইন-ভিত্তিক ট্র্যাকিং** ব্যবস্থা চালু করা ।
5. **ই-কমার্স সংযোগ:** গ্রামীণ কারিগরদের সরাসরি বিশ্বব্যাপী অনলাইন বিক্রয় প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করা ।

উপসংহার

২০৩০ সালের মধ্যে **১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা** নিয়ে ২০২৬-২৭ বাজেট এক মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে । গ্রামোদ্যোগ এবং আধুনিক উচ্চপ্রযুক্তির মেলবন্ধনে ভারত বিশ্বের একটি শক্তিশালী টেক্সটাইল হাবে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে ।

(TReDS কি?): TReDS হলো একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীরা (MSME) বড় কোম্পানি বা সরকারি দপ্তরে মাল বিক্রি করার পর তাদের পাওনা টাকা দ্রুত ব্যাংক বা ফিন্যান্সিয়ালের কাছ থেকে ডিসকাউন্টে সংগ্রহ করতে পারে। এতে তাদের নগদ টাকার অভাব হয় না ।

প্রশ্ন: *"ইউনিয়ন বাজেট ২০২৬-২৭ এ ঘোষিত নতুন পদক্ষেপগুলি কীভাবে ভারতের টেক্সটাইল ভ্যালু চেইনকে শক্তিশালী করতে এবং বিশ্ব বাজারে এর প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে—তা সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন।" (২৫০ শব্দ)*

3.1.3. ডিসকম (DISCOMs) এবং আগামীর পথ

প্রেক্ষাপট

ভারতের বিদ্যুৎ খাত দীর্ঘকাল ধরে **"লোকসানের উত্তরাধিকার"** দ্বারা জর্জরিত ছিল, তবে বর্তমানে সেখানে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে, বিদ্যুৎ বন্টনকারী কোম্পানি বা **ডিসকম (DISCOMs)** ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ শৃঙ্খলের সবচেয়ে দুর্বল অংশ, যা বিশাল ঋণ এবং অদক্ষতার জন্য পরিচিত ছিল।

তবে, **২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের** সাম্প্রতিক তথ্য একটি বিশাল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে: ডিসকমগুলো **২,৭০১ কোটি টাকার** নিট মুনাফা (Profit After Tax) অর্জন করেছে, যা এক দশক আগের **৬৭,৯৬২ কোটি টাকার** লোকসানের তুলনায় এক বিশাল সাফল্য।

ডিসকম সম্পর্কে:

১. মূল কাজ

ডিসকমগুলোর দায়িত্ব হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি বা **জেনকো (GENCOs)** থেকে বিদ্যুৎ কেনা এবং তা শেষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

- **সংগ্রহ:** তারা তাপীয়, জলবিদ্যুৎ বা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি (PPA) স্বাক্ষর করে।
- **অবকাঠামো:** তারা বৈদ্যুতিক খুঁটি, ট্রান্সফরমার এবং স্থানীয় তারের নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করে।
- **রাজস্ব:** তারা গ্রাহকদের বিল পাঠায় এবং জেনকো (GENCOs) ও ট্রান্সমিশন কোম্পানিগুলোর (TRANSCOs) পাওনা মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।
- **ঐতিহাসিক অনুমোদন:** মূলত **বিদ্যুৎ (সরবরাহ) আইন, ১৯৪৮**-এর অধীনে গঠিত এই সংস্থাগুলোর আইনিভাবে **৩% মুনাফা** করার কথা ছিল, যা তারা কয়েক দশক ধরে করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২. সংস্থার ধরণ

বর্তমানে ভারতে **৭২টি ডিসকম** কাজ করছে:

- **সরকারি মালিকানাধীন:** অধিকাংশ (৪৪টি), যা সরকারি বিভাগ বা রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন হিসেবে পরিচালিত।
- **বেসরকারি:** ১৬টি সংস্থা (যেমন: দিল্লি বা মুম্বাইয়ের টাটা পাওয়ার, আদানি পাওয়ার)।
- **বিদ্যুৎ বিভাগ:** ১২টি (মূলত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে)।

ডিসকমের আর্থিক অবস্থা:

১. লোকসানের যুগ (২০১৪-এর আগে)

- **তীব্র সংকট:** এই সময়টি ক্রমাগত বাড়তে থাকা লোকসানের জন্য পরিচিত ছিল। **২০১৩-১৪** সালে এই খাতে মোট **৬৭,৯৬২ কোটি টাকার** বিশাল লোকসান হয়েছিল।
- **ঘাটতি:** বিদ্যুৎ সরবরাহের গড় খরচ (ACS) এবং গড় উপার্জনের (ARR) মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল (প্রতি ইউনিটে প্রায় **৭৮ পয়সা**)। অর্থাৎ, প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রিতে ডিসকমের লোকসান হতো।

- **অদক্ষতা:** বিদ্যুৎ চুরি এবং পুরনো অবকাঠামোর কারণে **AT&C (কারিগরি ও বাণিজ্যিক) লোকসান** ২২%-এর বেশি ছিল।

২. সংগ্রামের সময়কাল (২০১৫–২০২১)

- **ক্রমবর্ধমান ঋণ:** উদয় (UDAY) প্রকল্পের মতো বিভিন্ন উদ্ধার পরিকল্পনা সত্ত্বেও ঋণ জমতে থাকে। **২০২০-২১** সালের মধ্যে মোট লোকসান **৫.৫ লাখ কোটি টাকায়** পৌঁছায়।
- **পেমেন্ট সংকট:** ডিসকমগুলো উৎপাদনকারীদের (GENCOs) টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুরো বিদ্যুৎ খাতে ঋণের চক্র তৈরি হয়।
- **কাঠামোগত সমস্যা:** সরকারি ভর্তুকি পেতে দেরি হওয়া এবং বিদ্যুতের সঠিক দাম নির্ধারিত না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

৩. সফল প্রত্যাবর্তন (২০২২–২০২৫)

- **মুনাফা:** কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, **২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে** ডিসকমগুলো **২,৭০১ কোটি টাকা মুনাফা** করেছে।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** AT&C লোকসান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে **১৫.০৪%**-এ নেমে এসেছে।
- **খরচ পুনরুদ্ধার:** প্রতি ইউনিটে খরচ ও আয়ের ব্যবধান ৭৮ পয়সা থেকে কমে মাত্র **০.০৬ পয়সা** হয়েছে।
- **ঋণ পরিশোধ:** ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে বকেয়া পাওনা ছিল **১.৩৯ লাখ কোটি টাকা**, যা **২০২৬ সালের জানুয়ারির** মধ্যে কমে মাত্র **৪,৯২৭ কোটি টাকায়** দাঁড়িয়েছে।

ডিসকম খাতে নীতিগত সংস্কার:

১. **রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS):** ৩ লাখ কোটি টাকার এই প্রকল্পটিতে কাজের ভিত্তিতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ডিসকমগুলো যদি প্রতি বছর লোকসান কমানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে, তবেই তারা স্মার্ট প্রিপেইড মিটার এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য টাকা পায়।

২. **লেট পেমেন্ট সারচার্জ (LPS) রুলস, ২০২২:** এটি বকেয়া পাওনা মেটানোর একটি বাধ্যতামূলক কাঠামো। এর মাধ্যমে পুরনো ঋণ **৪৮টি সুদমুক্ত কিস্তিতে (EMI)** পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে নতুন পাওনা মেটাতে দেরি করলে ডিসকমগুলোকে বিদ্যুৎ বাজার থেকে নিষিদ্ধ করার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. **বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিধি:** এটি আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া **ভর্তুকি অগ্রিম পরিশোধ** করতে হয়, যাতে ডিসকমের খরচ ও আয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

৪. **বাধ্যতামূলক ফিডার সেগ্রিগেশন:** কৃষিকাজের জন্য বিদ্যুতের লাইন এবং ঘরোয়া ব্যবহারের লাইন আলাদা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষিতে প্রকৃত বিদ্যুৎ খরচ মাপা যায় এবং বাণিজ্যিক লোকসানকে কৃষি ব্যবহারের আড়ালে লুকানো বন্ধ হয়।

৫. **ইন্টিগ্রেটেড রেটিং এক্সারসাইজ:** পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (PFC) প্রতি বছর ২৫টিরও বেশি প্যারামিটারের ভিত্তিতে ডিসকমগুলোর মান নির্ধারণ করে। এই **রেটিং** দেখে ব্যাংকগুলো ঋণ দেয়, যা ডিসকমগুলোকে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করে।

ডিসকমের সামনে চ্যালেঞ্জসমূহ:

এত উন্নতি সত্ত্বেও ডিসকমের মুনাফা এখনো ভঙ্গুর: ১. **সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরতা:** অনেক ডিসকমের মুনাফা মূলত কৃত্রিম, কারণ তারা বিশাল **সরকারি ভর্তুকি** পায়। যেমন, তামিলনাড়ুর TNPDCL ৩১,০০০ কোটি টাকা সরকারি সাহায্য পাওয়ার পর ২,০৭৩ কোটি টাকা মুনাফা দেখিয়েছে; এই সাহায্য না পেলে তাদের **১৪,০৩৪ কোটি টাকা লোকসান** হতো।

২. **অস্থায়ী রাজস্ব উদ্বৃত্ত:** বর্তমান মুনাফা চিরস্থায়ী নাও হতে পারে। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান পরিচালন খরচের কারণে ডিসকমগুলো আবারও লোকসানে পড়তে পারে।

৩. **বিদ্যুতের অবাস্তব দাম:** রাজনৈতিক কারণে বিদ্যুতের প্রকৃত খরচের (ACS) সাথে মিলিয়ে দাম নির্ধারণ করতে অনীহা দেখা যায়। ফলে আয়ের তুলনায় খরচ বেশি থেকে যায়।

৪. **কৃষি মিটারের অভাব:** অনেক রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঠিক কোনো মিটার নেই। এর ফলে কতটা বিদ্যুৎ প্রকৃতপক্ষে কৃষিতে যাচ্ছে আর কতটা চুরি হচ্ছে বা কারিগরি কারণে নষ্ট হচ্ছে, তা বোঝা কঠিন হয়।

৫. **বিশাল ঋণ:** পুরনো বকেয়া কমলেও ডিসকমগুলোর মোট ঋণের পরিমাণ এখনো প্রায় **৭.২৬ লাখ কোটি টাকা**। এই ঋণের বোঝা আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আগামীর পথ:

১. **সর্বজনীন ফিডার সেগ্রিগেশন:** সারাদেশে কৃষি ও ঘরোয়া বিদ্যুতের লাইন আলাদা করতে হবে। এতে বিদ্যুতের সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে এবং অপচয় কমবে।

২. **সৌর পাম্পের প্রসার:** নীতি আয়োগের সুপারিশ অনুযায়ী, PM-KUSUM প্রকল্পের মাধ্যমে সৌর পাম্পের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এতে ডিসকমের বিদ্যুৎ কেনার খরচ কমবে এবং ভর্তুকির ওপর চাপ কমবে।

৩. **টার্গেটেড সাবসিডি ও ডিবিটি (DBT):** ঢালাওভাবে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ না দিয়ে কেবল অভাবী মানুষদের জন্য ভর্তুকি দেওয়া উচিত। **ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)**-এর মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহকের কাছে ভর্তুকি পৌঁছে দিলে স্বচ্ছতা বাড়বে।

৪. **প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষতা:** বিলিং-এর ভুল কমাতে এবং সময়মতো টাকা আদায় করতে দ্রুত **স্মার্ট প্রিপেইড মিটার** বসাতে হবে। গ্রিড আধুনিকীকরণ করলে সৌর বিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার সহজ হবে।

৫. **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছা:** ডিসকমগুলোকে লাভজনক করতে সাহসী প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। বিদ্যুতের সঠিক দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করাই দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথ।

উপসংহার:

ভারতের বিদ্যুৎ খাতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ডিসকমগুলোকে ভর্তুকি-নির্ভর থেকে **বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক** প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ওপর। **স্মার্ট-গ্রিড প্রযুক্তি**, **সৌরশক্তির প্রসার** এবং **বিদ্যুতের সঠিক দাম** নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আর্থিক শৃঙ্খলার মাধ্যমেই ডিসকমগুলো ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা পূরণ করতে এবং **নেট জিরো** (Net Zero) লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারবে।

প্রশ্ন: *"সাম্প্রতিক আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও, ভারতের বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলো (DISCOMs) গভীর কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। ডিসকমগুলোর প্রধান সমস্যাগুলো সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ও কার্যকরী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপের পরামর্শ দিন।" (২৫০ শব্দ)*

3.1.4. রেলওয়েনিরাপত্তা: কবচ (Kavach) এবংএআই (AI) ইন্টিগ্রেশন

প্রেক্ষাপট:

ভারতীয় রেল দেশীয় প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (AI) কাজে লাগিয়ে **"শূন্য দুর্ঘটনা"** (Zero Accident) লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রেলের ফোকাস কেবল দুর্ঘটনা-পরবর্তী ব্যবস্থা থেকে সরে এসে **পূর্বাভাসমূলক এবং স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তার** দিকে নিবদ্ধ হয়েছে।

- **পরিসংখ্যানগত অগ্রগতি:** প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলে মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনার সংখ্যা ২০১৪-১৫ সালের ১৩৫টি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ২০২৫-২৬ সালে (নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) মাত্র ১১টিতে সীমাবদ্ধ হয়েছে।
- **আর্থিক প্রতিশ্রুতি:** ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে নিরাপত্তা খাতে ব্যয় প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে **১,১৭,৬৯৩ কোটি টাকায়** পৌঁছেছে।

কবচ (KAVACH): নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (ATP)

কবচ (Kavach) হলো সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যবস্থা, যা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি রাখে। এটি RDSO (Research Designs & Standards Organization) দ্বারা নকশা করা হয়েছে।

ক. প্রযুক্তিগত ভিত্তি

- **সেফটি ইন্টেগ্রিটি লেভেল (SIL-4):** এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা মানদণ্ড হিসেবে প্রত্যয়িত (যেখানে ত্রুটির সম্ভাবনা ১০,০০০ বছরে মাত্র ১ বার)।
- **কার্যপ্রণালী:** এটি ট্র্যাকের উপর **RFID ট্যাগ, UHF রেডিও** (UHF Radio) যোগাযোগ এবং ট্রেনের ভেতরের **অন-বোর্ড কম্পিউটার** ব্যবহার করে কাজ করে।
- **ইন্টারঅপারেবিলিটি** (Interoperability)**:** বিশ্বের অন্যান্য সিস্টেমের তুলনায় কবচ এমনভাবে তৈরি যাতে এটি বিভিন্ন সংস্থার যন্ত্রপাতির সাথে অনায়াসে কাজ করতে পারে, ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সরবরাহকারীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না।

খ. প্রধান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **SPAD প্রতিরোধ:** ট্রেন যাতে লাল সিগন্যাল অতিক্রম না করে (Signal Passing at Danger – SPAD), সেজন্য এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিগন্যালের আগেই ট্রেন থামিয়ে দেয়।
- **সংঘর্ষ এড়ানো** (Collision Avoidance)**:** রিয়েল-টাইম ট্রেন-টু-ট্রেন যোগাযোগের মাধ্যমে **মুখোমুখি** (head-on)**, পেছন থেকে** (rear-end) এবং **পাশ থেকে** (side-on) সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে।
- **স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং** (Automated Braking)**:** এটি গতিসীমা বজায় রাখে; লোকো পাইলট যদি মোড় বা ঢালু পথে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন, তবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করে।
- **ক্যাব সিগন্যালিং** (Cab Signaling)**:** ট্রেনের ইঞ্জিনের ভেতরেই সিগন্যালের অবস্থা এবং দূরত্বের তথ্য পাওয়া যায়—যা **১৬০ কিমি/ঘণ্টা** গতিতে চলার সময় স্পষ্ট দৃশ্যমানতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
- **রোল-ব্যাক/ফরোয়ার্ড প্রোটেকশন:** ট্রেন স্থির থাকা অবস্থায় বা ঢালু পথে যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে গড়িয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করে।
- **SOS ফাংশনালিটি:** লোকো পাইলট বা স্টেশন কর্মীরা জরুরি প্রয়োজনে আশেপাশের সমস্ত ট্রেনে **'এমার্জেন্সি স্টপ'** (Emergency Stop) সিগন্যাল পাঠাতে পারেন।
- **অটো-হুইসলিং** (Auto-Whistling)**:** লেভেল ক্রসিং (LC Gates) গেটের কাছে পৌঁছালে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের হর্ন বাজায়।

গ. বিবর্তিত সংস্করণসমূহ

- **কবচ ৩.২ (ভিত্তি):** এর মাধ্যমে প্রাথমিক ATP প্রোটোকল তৈরি করা হয়েছিল। এটি দক্ষিণ-মধ্য রেলে প্রায় ১,৪৬৫ কিমি পথে সফলভাবে পরীক্ষা ও প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি মূলত সহজ ভৌগোলিক পরিবেশে SPAD এবং পেছন থেকে সংঘর্ষ এড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল।
- **কবচ ৪.০ (বর্তমান মানদণ্ড):** ২০২৪ সালের জুলাই মাসে অনুমোদিত এই সংস্করণটি বর্তমানে দ্রুত গতিতে বসানো হচ্ছে। এটি **জটিল ভূখণ্ড** (complex terrains), উচ্চ ঘনত্বের ট্র্যাফিক এবং ভারতীয় রেলের বিভিন্ন জোনের জন্য উপযোগী করে তৈরি। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসেই রেকর্ড **৪৭২ কিমি** পথে এটি বসানো হয়েছে। এটি বর্তমানে দিল্লি-মুম্বাই এবং দিল্লি-হাওড়া করিডোরসহ পাঁচটি জোনে বিস্তৃত।
- **কবচ ৫.০ (ভবিষ্যৎ / নগর পরিবহন):** এটি **শহরতলি বা শহরতলির** (Suburban) রেল ব্যবস্থার (যেমন মুম্বাই লোকাল) জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এর মূল লক্ষ্য হলো দুই ট্রেনের মাঝের সময় বা **হেডওয়ে কমানো** (Headway Reduction), যাতে প্রতি ঘণ্টায় আরও বেশি ট্রেন চালানো যায়। এটি **বন্দে ভারত ৪.০** (Vande Bharat 4.0) ট্রেনগুলির নিরাপত্তার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

এআই (AI) এবং "ডিপ টেক" (Deep Tech) ইন্টিগ্রেশন

ভারতীয় রেল মানুষের দ্বারা পরিদর্শনের বদলে এখন **মেশিন-ভিশন (Machine-Vision)** এবং **অ্যাকোস্টিক সেন্সিং (Acoustic sensing)** প্রযুক্তি ব্যবহার করছে:

- **অনুপ্রবেশ শনাক্তকরণ:** ট্র্যাকের ওপর হাতি বা অন্য বন্যপ্রাণী শনাক্ত করতে এটি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সেন্সিং (DAS) প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাইলটদের দ্রুত সতর্ক করে দেয়।
- **প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স (Predictive Maintenance):** এআই চালিত মেশিন ভিশন (MVIS) এবং হুইল ইমপ্যাক্ট লোড ডিটেক্টর (WILD) চলন্ত অবস্থাতেই ট্রেনের ত্রুটি বা চাকার ক্ষয় শনাক্ত করে।
- **ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (Electronic Interlocking):** রুট নির্ধারণে মানুষের ভুল কমাতে এটি একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে।
- **ভিডিও অ্যানালিটিক্স (VA):** স্টেশনে নিরাপত্তার জন্য ফেসিয়াল রিকগনিশন (FRS) এবং সন্দেহজনক চলাফেরা শনাক্তকরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়।
- **কুয়াশা নিরাপত্তা ডিভাইস (FSD):** ঘন কুয়াশার মধ্যেও জিপিএস-ভিত্তিক যন্ত্রের মাধ্যমে চালককে সিগন্যাল বা গেটের দূরত্ব জানায়।

অন্যান্য সরকারি উদ্যোগসমূহ

১. **রাষ্ট্রীয় রেল সুরক্ষা কোষ (RRSK):** এটি রেলের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও পরিকাঠামোর জন্য তৈরি একটি নিবেদিত **বিশেষ তহবিল**।

- **মূল লক্ষ্য:** মানহীন বা রক্ষীহীন লেভেল ক্রসিং (Level Crossings) নির্মূল করা, রেললাইন বা ট্র্যাক নবীকরণ এবং পুরনো ব্রিজের সংস্কার করা।
- **বর্তমান অবস্থা:** নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী ব্যয় (CAPEX) বজায় রাখতে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে এটি পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে।

২. **মিশন রাফতার (Mission Raftar):** মালবাহী ট্রেনের গড় গতি দ্বিগুণ করা এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের গতি বাড়িয়ে **১৬০ কিমি/ঘণ্টা** করা।

- **নিরাপত্তা সংযোগ:** উচ্চ গতিতে ট্রেন চালানোর জন্য **কবচ (Kavach – ATP)** বসানো এবং গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল/ডায়াগনাল রুট থেকে সমস্ত লেভেল ক্রসিং তুলে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৩. **রেলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া:** কবচ-যুক্ত প্রতিটি ট্রেনকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে নজরদারি করতে **নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (NMS)** চালু করা।

- **সংযুক্তকরণ:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং উন্নত যোগাযোগের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করতে **অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল (OFC)** নেটওয়ার্কের (৬৭,২৩৩ কিমি) সম্প্রসারণ করা।

৪. **আত্মনির্ভর ভারত (দেশীয় উদ্ভাবন):** অত্যন্ত ব্যয়বহুল ইউরোপীয় ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমের (ETCS) একটি দেশীয় বিকল্প হিসেবে 'কবচ' তৈরি করার জন্য RDSO-কে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা।

৫. **"ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট" এবং গতি শক্তি:** রেল নিরাপত্তাকে **পিএম গতি শক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের** সাথে যুক্ত করা। এর ফলে মাল্টি-মোডাল কানেক্টিভিটি বা বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার সংযোগ ঘটানোর সময় যাতে রেললাইনের অখণ্ডতা বা নিরাপত্তার নিয়ম বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করা যায়।

ভারতে রেল নিরাপত্তার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **বিশাল পরিধি ও বৈচিত্র্যময় ভূগোল:** ভারতের **৬৮,০০০ রুট কিলোমিটারের** বেশি বিস্তৃত রেল নেটওয়ার্ক পাহাড়, উপকূলীয় অঞ্চল এবং মরুভূমির মতো বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে গিয়েছে। এই বিশাল এলাকায় আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কাজ।

২. **অত্যধিক মূলধনী ব্যয়:** রেললাইনের ধারের যন্ত্রপাতির জন্য প্রতি কিলোমিটারে প্রায় **৫০ লক্ষ টাকা** এবং প্রতি ইঞ্জিনে (লোকোমোটিভ) প্রায় **৭০ লক্ষ টাকা** খরচ হয়। পুরো রেল নেটওয়ার্ককে এই ব্যবস্থার আওতায় আনতে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন।

৩. **পুরানো যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ:** হাজার হাজার **পুরানো ইঞ্জিন** এবং যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক 'কবচ ৪.০ বা ৫.০' হার্ডওয়্যার যুক্ত করা প্রযুক্তিগতভাবে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া।

৪. **ব্যান্ডউইথ এবং স্পেকট্রাম:** কবচ ব্যবস্থাটি UHF **(আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি)** রেডিও তরঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। সিগন্যালে অন্য কোনো তরঙ্গের হস্তক্ষেপ (Interference) সামলানো এবং দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ১০০% সিগন্যাল নিশ্চিত করা একটি বড় বাধা।

৫. **সরবরাহ ব্যবস্থা ও সমন্বয়:** বর্তমানে কবচ তৈরির জন্য মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট সার্টিফাইড ভেন্ডর বা বিক্রেতার ওপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি যন্ত্রপাতি যাতে সমস্ত ১৭টি রেলওয়ে জোনে একে অপরের সাথে নিখুঁতভাবে কাজ করে, তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৬. **সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি:** সিগন্যালিং ব্যবস্থা যত বেশি ডিজিটাল এবং রেডিও-ভিত্তিক হচ্ছে, ততই এটি **সাইবার আক্রমণ বা সিগন্যাল জ্যামিং-এর** মতো ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এটি মোকাবিলা করতে অত্যন্ত উন্নত এনক্রিপশন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৭. **মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণ:** দশ লক্ষেরও বেশি রেল কর্মীকে পুরনো আমলের ম্যানুয়াল বা ভিজ্যুয়াল ড্রাইভিং থেকে উচ্চ-প্রযুক্তির **"ক্যাব-সিগন্যালিং"** পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করা এবং তাদের বড় ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন।

আগামীর পথ

- **মানকীকরণ (Standardization):** সমস্ত ১৭টি রেলওয়ে জোনে অভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে 'কবচ ৪.০' থেকে **'কবচ ৫.০'**-তে রূপান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুততর করা।
- **আগ্রাসী বাস্তবায়ন:** উচ্চ-ঘনত্বের নেটওয়ার্কের (HDN) ১০,০০০ কিমি পথকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশের মোট রেল ট্রাফিকের ৯০% অংশ কবচ-এর আওতায় আনা যায়।
- **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP):** রেললাইনের ধারের যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করা, যাতে **রাষ্ট্রীয় রেল সুরক্ষা কোষের (RRSK)** ওপর আর্থিক চাপ কমানো যায়।
- **দেশীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন:** ইউএইচএফ (UHF) রেডিও এবং আরএফআইডি (RFID) ট্যাগের জন্য একটি স্থানীয় সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে প্রতি কিলোমিটার কবচ বসানোর খরচ কমিয়ে আনা যায়।
- **রেলের জন্য ৫জি (5G for Railways):** ইউএইচএফ (UHF) থেকে উৎসর্গীকৃত **৫জি-আর (5G-R)** ব্যান্ডে স্থানান্তরিত হওয়া। এর ফলে উচ্চ ব্যান্ডউইথ পাওয়া যাবে, যা এআই (AI) চালিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিয়েল-টাইম ৪কে (4K) ভিডিও নজরদারিতে সাহায্য করবে।
- **স্যাটেলাইট ব্যাকআপ:** পজিশনিং ডেটার বিকল্প হিসেবে ইসরোর (ISRO) তৈরি **নাভিক (NavIC)** সিস্টেমকে যুক্ত করা। এর ফলে গভীর টানেল বা পাহাড়ি অঞ্চলের মতো 'রেডিও-শ্যাডো' এলাকাতেও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- **আধুনিক প্রশিক্ষণ:** লোকো পাইলটদের জন্য এআই-ভিত্তিক ড্রাইভিং সিমুলেটর চালু করা, যাতে তারা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে **ক্যাব-সিগন্যালিং** এবং স্বয়ংক্রিয় ব্রেকিং ব্যবস্থায় পারদর্শী হতে পারেন।
- **ট্র্যাক বেষ্টনী (Track Fencing):** **'মিশন রাফতার'**-এর অন্তর্গত সমস্ত রুটে (১৬০ কিমি/ঘণ্টা) রেললাইনের চারপাশে বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা। এটি গবাদি পশু বা মানুষের অনুপ্রবেশ রোধ করবে, যা বর্তমানে জরুরি ব্রেকিংয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

উপসংহার

কবচ ৪.০, ৫.০ এবং **এআই-ভিত্তিক রোগ নির্ণয়** পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় রেল একটি নিরাপদ এবং আধুনিক যুগে প্রবেশ করছে। এই ডিজিটাল রূপান্তর কেবল জীবন রক্ষা করবে না, বরং ভারতের পরিবহন ব্যবস্থাকে বিশ্বমানের ও আত্মনির্ভর (Aatmanirbhar) করে তুলবে।

প্রশ্ন: *"অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (ATP) সিস্টেম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রয়োগ কীভাবে ভারতীয় রেলের কার্যক্ষম নিরাপত্তা, নেটওয়ার্ক সক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করছে তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।" (২৫০ শব্দ)*

3.1.5. ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ **বাণিজ্য চুক্তি** ঘোষণা করেছে, যা প্রায় এক বছরের তীব্র **"লেনদেনমূলক কূটনীতির"** অবসান ঘটিয়েছে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং যুক্তরাজ্যের (UK) সাথে বড় ধরনের চুক্তির পর, এই চুক্তিটি ভারতের **"নতুন বাণিজ্য কাঠামো"** -এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ সম্পন্ন করল।
- পারস্পরিক **শুল্ক কমিয়ে ১৮%** করা এবং **৫০০ বিলিয়ন ডলারের ক্রয় প্রতিশ্রুতি** নিশ্চিত করার মাধ্যমে, এই চুক্তিটি দুই দেশের সম্পর্ককে "শুল্ক যুদ্ধ" থেকে বের করে একটি **কৌশলগত অর্থনৈতিক সংহতির** দিকে নিয়ে গেছে।

বাণিজ্য অংশীদারিত্বের একটি ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক

- **বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোর সম্প্রসারণ:** ভারত-মার্কিন এই বাণিজ্য চুক্তিটি ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের একটি অন্যতম প্রধান সাফল্য, যা বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অবস্থানকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে।
- **ইউরোপে উন্নত প্রবেশাধিকার:** ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (EFTA), যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে করা চুক্তিগুলো ভারতকে পুরো ইউরোপীয় বাজারজুড়ে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে।
- **প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পদচিহ্ন শক্তিশালী করা:** অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে করা বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতকে একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- **পশ্চিম এশিয়ার সাথে গভীর যোগাযোগ:** ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (UAE) সাথে হওয়া চুক্তিগুলোর ফলে পশ্চিম এশিয়ার বাজারে ভারতের প্রবেশাধিকার আরও সহজ ও বিস্তৃত হয়েছে।
- **মার্কিন বাজারে ভারতের সুসংহত অবস্থান:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এই সাম্প্রতিক চুক্তিটি আমেরিকার বাজারে ভারতের উপস্থিতিকে আরও দৃঢ় করেছে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে ভারতের **গভীর অর্থনৈতিক সংযোগকে** স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ক

২০২৬ সালের ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির পথটি ছিল গভীর **অর্থনৈতিক একীকরণ** এবং তীব্র **নীতিগত সংঘাতের** একটি সংমিশ্রণ।

- **বিনিয়োগ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের **তৃতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী** দেশ। ২০০০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতে মোট মার্কিন সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে **৭০.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে**।

- **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ফলাফল:** ২০২৫ অর্থবর্ষে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রেকর্ড **১৩২ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছেছে, যা ২০২৪ অর্থবর্ষে ছিল ১১৯.৭১ বিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে ভারতের **৪০.৮২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত** (Trade Surplus) রয়েছে।
- **প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বিশ্বের বৃহত্তম আমদানির বাজার) ভারতের **বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার** হিসেবে বজায় রয়েছে। ভারতের মোট রপ্তানির প্রায় **এক-পঞ্চমাংশ** হয় আমেরিকায়, যার মধ্যে ওষুধ শিল্প (Pharmaceuticals), আইটি পরিষেবা, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং বস্ত্রশিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো অন্তর্ভুক্ত।
  - **যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানি:** ২০২৫ অর্থবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের আমদানিকৃত পণ্যের তালিকায় প্রধান ছিল **খনিজ জ্বালানি ও তেল**, মূল্যবান ও আধা-মূল্যবান পাথর ও ধাতু, পারমাণবিক চুল্লি ও যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।
  - **যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি:** এর বিপরীতে, ২০২৫ অর্থবর্ষে ভারতে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্যের মধ্যে শীর্ষে ছিল **বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি**, মূল্যবান ও আধা-মূল্যবান পাথর ও ধাতু, ওষুধজাত পণ্য, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, খনিজ জ্বালানি এবং লোহা ও ইস্পাতের তৈরি সামগ্রী।
- **সামরিক সহযোগিতা:** ২০২৫ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের (Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology) অধীনে **'মিশন ৫০০'** শুরু করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে **৫০০ বিলিয়ন ডলারে** নিয়ে যাওয়া, যার প্রধান সহায়ক হলো একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA)।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬-এর প্রধান শর্তাবলি

এই চুক্তিটি একদিকে যেমন ভারতের জন্য ব্যাপক **শুল্ক ছাড়ের** সুবিধা নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশাল **বাণিজ্যিক ও জ্বালানি আমদানির** প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

- **ভারতের বর্ধিত আমদানির প্রতিশ্রুতি:** ভারত আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে **১০০ বিলিয়ন ডলার** মূল্যের পণ্য আমদানির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যা ২০২৫ অর্থবর্ষের আমদানির তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।
  - ভারতের এই আমদানির তালিকায় মূলত থাকবে **জ্বালানি পণ্য** (তেল, গ্যাস এবং কয়লা), বিমান ও বিমানের যন্ত্রাংশ, উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের শিল্পজাত পণ্য, মূল্যবান ধাতু, পারমাণবিক সরঞ্জাম এবং বাছাইকৃত কিছু কৃষি পণ্য।
- **যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শুল্কের যৌক্তিকীকরণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ওপর শুল্ক আগেকার সর্বোচ্চ ৫০% থেকে কমিয়ে **১৮% করতে সম্মত হয়েছে**। এর ফলে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্য প্রবেশের সুযোগ বাড়বে এবং বিশেষ করে **ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য**, বস্ত্র ও গাড়ির যন্ত্রাংশের দাম বাজারে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক হবে।
- **সংবেদনশীল দেশীয় খাত রক্ষা:** বাজারের পরিধি বাড়ালেও ভারত তার নিজস্ব সংবেদনশীল খাতগুলোকে কঠোরভাবে সুরক্ষিত রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে **জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) কৃষি পণ্য**, দুগ্ধজাত পণ্য, পোল্ট্রি, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য। এটি কৃষকদের কল্যাণ এবং **খাদ্য নিরাপত্তার** কথা মাথায় রেখে তৈরি ভারতের একটি সুপরিকল্পিত বাণিজ্যিক কৌশল।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬-এর গুরুত্ব

- **বাণিজ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা:** এই চুক্তির লক্ষ্য হলো আমেরিকার সাথে ভারতের ব্যবসার যে ঘাটতি আছে (বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে) তা কমিয়ে আনা। অন্যদিকে, এর ফলে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর **শুল্কের চাপ** কমবে এবং মার্কিন বাজারে ভারতের ব্যবসা আরও সহজ হবে।
- **জ্বালানি নিরাপত্তা:** আমেরিকা থেকে বেশি করে তেল ও গ্যাস আমদানি করার ফলে ভারতের জ্বালানির উৎস আরও বাড়বে। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের মতো অশান্ত অঞ্চলের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমবে এবং দেশের **জ্বালানি নিরাপত্তা** নিশ্চিত হবে।
- **ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব:** শুধু ব্যবসার খাতিরে নয়, এই চুক্তিটি ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। বিশেষ করে চীনের সাথে বাড়তে থাকা প্রতিযোগিতার মুখে ভারত ও আমেরিকার এই **কৌশলগত ঐক্য** খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- **ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা:** শুল্ক কমে **১৮%** হওয়ায় ভারত এখন তার প্রতিযোগী দেশগুলোর (যেমন: ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও চীন) তুলনায় অনেক কম খরচে আমেরিকায় মাল পাঠাতে পারবে। এতে ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে আরও জনপ্রিয় হবে।

- **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লড়াইয়ের ভয় দূর হওয়ায় বাজারে অনিশ্চয়তা কমবে। এর ফলে **টাকার দাম স্থিতিশীল** থাকবে এবং ভারতের কারখানায় বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬-এর কিছু দুশ্চিন্তার দিক

- **নিজস্ব সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা:** এই চুক্তির একটি শর্ত হতে পারে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা কমিয়ে দেওয়া। এতে ভারতের পুরোনো বন্ধু এবং প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ **রাশিয়ার** সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। ভারত সব দেশের সাথেই সুসম্পর্ক রাখতে চায়, কিন্তু এই চুক্তির ফলে সেই ভারসাম্যে টান পড়তে পারে।
- **চীনের পাল্টা ব্যবস্থার ভয়:** ভারত আমেরিকার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়লে চীন ভারতের ওপর **বাণিজ্যিক প্রতিশোধ** নিতে পারে। বিশেষ করে ওষুধের কাঁচামাল এবং দামী খনিজ সম্পদের জন্য ভারত এখনও চীনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।
- **প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া:** বাংলাদেশ বা ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো আমেরিকায় রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুবিধা (GSP) পায়, ভারত তা ২০১৯ সাল থেকে পাচ্ছে না। ফলে ভারতের রপ্তানিকারকরা এখনও কিছুটা প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছেন।
- **দেশীয় অর্থনীতির ওপর প্রভাব:** আমেরিকার দুগ্ধজাত বা পোল্ট্রি পণ্য যদি ভারতের বাজারে অবাধে ঢুকে পড়ে, তবে **ভারতীয় চাষিরা** ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। এছাড়া, রাশিয়ার সস্তা তেলের বদলে আমেরিকার দামী তেল কিনলে ভারতের আমদানির খরচ বেড়ে যেতে পারে।
- **কঠোর নিয়মকানুন:** শুল্ক কমলেও আমেরিকার খাবারের গুণমান পরীক্ষার **কঠোর নিয়ম** ভারতের কৃষি পণ্য রপ্তানিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়া আমেরিকার মতো 'পেটেন্ট' বা মেধা সত্ত্ব আইন মেনে চললে ভারতে ওষুধের দাম বেড়ে যেতে পারে।
- **ইন্টারনেট ও তথ্য সুরক্ষা:** মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ভারতের ভেতরেই রাখা (Data Localisation) নিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এখনও মতবিরোধ রয়েছে। আমেরিকার বড় কোম্পানিগুলো তথ্যের অবাধ চলাচল চায়, যা ভারতের **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার** জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ: 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্ককে কাজে লাগানো

- **জ্বালানি নিরাপত্তার সাথে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা:** ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কের সাথে অর্থনৈতিক বিচক্ষণতার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এর জন্য জ্বালানি আমদানির উৎসগুলোতে বৈচিত্র্য আনা, **'ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন'**-এর গতি বাড়ানো এবং ক্ষুদ্র পারমাণবিক চুল্লি (SMR) সহ পারমাণবিক শক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। সেই সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য এই বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বকে পুরোপুরি কাজে লাগানো প্রয়োজন।
- **বাণিজ্য ও রপ্তানি বাজারে বৈচিত্র্য আনা:** শুধুমাত্র আমেরিকার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে হবে। এর জন্য উপসাগরীয় এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)** দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, যাতে ভারতীয় রপ্তানিকারকরা আরও বিস্তৃত এবং স্থিতিশীল বাজারে পৌঁছাতে পারেন।
- **চাষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে (MSME) সুরক্ষা প্রদান:** আমদানি শুল্ক কমানোর ক্ষেত্রে সতর্ক ও সুপরিকল্পিত হতে হবে। ধাপে ধাপে বাজার উন্মুক্ত করা এবং নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে বিদেশি পণ্যের ধাক্কায় আমাদের দেশের চাষি ও ছোট কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- **বাণিজ্যিক কাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া:** ভারত ও আমেরিকার মধ্যে **দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA)** দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এটি বিভিন্ন আইনি ও প্রযুক্তিগত বাধা দূর করবে, সেমিকন্ডাক্টর ও ওষুধের সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) মজবুত করবে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করবে।
- **উৎপাদন খাতে 'ফ্রেন্ডশোরিং'-এর সুযোগ নেওয়া:** শুল্ক কমে **১৮%** হওয়ার সুবিধা ব্যবহার করে সেইসব বৈশ্বিক কোম্পানিকে ভারতে আকর্ষণ করতে হবে যারা চীন থেকে তাদের ব্যবসা সরিয়ে নিতে চায়। লক্ষ্য হবে ভারতকে কেবল পণ্য জোড়া দেওয়ার কেন্দ্র নয়, বরং **'মেক ইন ইন্ডিয়া'**-র মাধ্যমে বিশ্বের জন্য একটি প্রকৃত উৎপাদন হাবে পরিণত করা।

- **উদ্ভাবন-চালিত প্রবৃদ্ধিতে জোর দেওয়া:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মহাকাশ গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে iCET-এর অধীনে দুই দেশের সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে। জনস্বার্থ বজায় রেখে মেধা সত্ত্ব (IPR) আইনের সমন্বয় ঘটাতে হবে, যাতে ভারত বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা ও উদ্ভাবন (R&D) কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

উপসংহার

২০২৬ সালের ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি একটি ঐতিহাসিক মোড়, যা দুই দেশের বাণিজ্যিক তিক্ততা দূর করে বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে একটি স্থায়ী ও **কৌশলগত অর্থনৈতিক ঐক্য** তৈরি করেছে। প্রয়োজনীয় বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং উন্নত প্রযুক্তিতে সহযোগিতার মাধ্যমে এই চুক্তিটি **'বিকশিত ভারত ২০৪৭'** স্বপ্ন পূরণে একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। এটি ভারতকে একটি আত্মনির্ভরশীল বৈশ্বিক উৎপাদন এবং উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রশ্ন: *বিশ্লেষণ করুন কীভাবে ২০২৬ সালের ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করে এবং একই সাথে এটি ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের সামনে কী কী চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। । (২৫০ শব্দ)*

3.1.6. ভারতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পরবর্তী পর্যায়

প্রেক্ষাপট

- **দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন** (DAY-NRLM)-এর আওতায় প্রায় **১০ কোটি পরিবারকে ৯১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর** (SHG) অধীনে সংগঠিত করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো গ্রাম সংগঠন এবং **ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশন** (CLF)-এর মতো একটি স্তরীভূত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- এখন পর্যন্ত **১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যাংক ঋণ** সংগ্রহ করা হয়েছে এবং **২ কোটিরও বেশি "লখপতি দিদি"** (যাঁরা বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার বেশি আয় করেন) তৈরি হয়েছেন।
- গ্রামীণ অর্থনীতির এই বাস্তুসংস্থান (Ecosystem) এখন তার পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত (২০২৬-২৭ থেকে ২০৩০-৩১), যেখানে মূল লক্ষ্য হবে গোষ্ঠীগত ঋণের পরিবর্তে **ব্যক্তিগত এবং উচ্চ-প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন উদ্যোক্তা** তৈরি করা।

পটভূমি: গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতির ধারা

- **প্রাথমিক পর্যায় – আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion):** শুরুর দিকে মনোযোগ ছিল ক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং **ক্ষুদ্র ঋণের** (Microcredit) ওপর। এর ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের নাগাল পান এবং মহাজনদের ওপর নির্ভরতা হ্রাস পায়।
- **DAY-NRLM-এর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার:** পরবর্তীতে এটি একটি সুগঠিত কাঠামোতে রূপ নেয়, যেখানে বর্তমানে **৯১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী** (SHG), ৫.৩৫ লক্ষ গ্রাম সংগঠন (VO) এবং ৩৩,৫৫৮টি **ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশন** (CLF) রয়েছে। এটি সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সুশাসনের একটি ভিত্তি তৈরি করেছে।
- **অর্জিত অর্থনৈতিক ফলাফল:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো সম্মিলিতভাবে ১১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ ব্যবহার করেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তাদের **অনাদায়ী ঋণের** (NPA) **পরিমাণ মাত্র ১.৭%**, যা তাদের প্রবল আর্থিক শৃঙ্খলা এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা প্রমাণ করে।
- **আয়ের রূপান্তর** (Income Transformation): ২ কোটিরও বেশি **"লখপতি দিদি"**-র উত্থান একটি বড় পরিবর্তন নির্দেশ করে। মহিলারা এখন কেবল টিকে থাকার লড়াই (Subsistence activities) না করে **অর্ধ-বাণিজ্যিক এবং বৈচিত্র্যময় ব্যবসায়িক উদ্যোগের** দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তার পরবর্তী পর্যায়ের গুরুত্ব

ভারতের **৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি** হওয়ার লক্ষ্য পূরণে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের বিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে নিহিত:

- **জীবিকা নির্বাহ থেকে ব্যবসায়িক প্রসারে রূপান্তর (Shift from Livelihood Support to Enterprise Expansion):** পরবর্তী পর্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো কেবল টিকে থাকার লড়াই বা **ভরণপোষণ-ভিত্তিক জীবিকা** থেকে বেরিয়ে এসে **উদ্যোক্তা-চালিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে** প্রবেশ করা। এটি গ্রামীণ মহিলাদের ব্যবসার পরিধি বাড়াতে, আয়ের উৎস বৈচিত্র্যময় করতে এবং **ভ্যালু চেইনে (Value Chain)** ওপরের দিকে উঠতে সাহায্য করবে।
- **কমিউনিটি-চালিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা (Strengthening Community-Owned Institutions): ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশন (CLF)**-গুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে এই পর্যায়টি **প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন এবং নেতৃত্ব** বৃদ্ধি করবে। এর ফলে মহিলারা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক শাসনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন।
- **আর্থিক ক্ষমতায়নের গভীরতা বৃদ্ধি (Deepening Financial Empowerment):** এখন মনোযোগ কেবল ক্ষুদ্র ঋণের (Microcredit) সহজলভ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং প্রকৃত **আর্থিক ক্ষমতায়নের** দিকে সরে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে **বড় অংকের ঋণ (Higher loan dosages)** প্রদান, ব্যক্তিগত **ক্রেডিট হিস্ট্রি** তৈরি এবং উদ্ভাবনী ও মিশ্র অর্থায়নের (Blended finance) প্রবর্তন।
- **আয়ের স্থিতিশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Improving Income Stability and Productivity):** গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড ঋণ, পেশাদার সহায়তা এবং বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের ফলে **এন্টারপ্রাইজ উৎপাদনশীলতা**, আয়ের স্থায়িত্ব এবং গ্রামীণ পরিবারগুলোর **অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা (Economic resilience)** বৃদ্ধি পাবে।
- **নারী-চালিত উদ্যোগের আনুষ্ঠানিকীকরণ (Formalisation of Women-Led Enterprises):** নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক, ক্রেডিট ব্যুরো এবং আনুষ্ঠানিক বাজারের সাথে যুক্ত করার ফলে গ্রামীণ **অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ (Formalisation)** ত্বরান্বিত হবে।
- **উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য (Alignment with Development Goals):** এই পর্যায়টি জাতীয় অগ্রাধিকার যেমন—**অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth)**, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনতাত্ত্বিক লভ্যাংশের (Demographic dividend) ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি জাতিসংঘের **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)** বিশেষ করে SDG-1 (দারিদ্র্য মুক্তি), SDG-5 (লিঙ্গ সমতা) এবং SDG-8 (শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) অর্জনে সহায়ক।

SHG (স্বনির্ভর গোষ্ঠী) আন্দোলনের প্রধান প্রভাবসমূহ

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (DAY-NRLM) গ্রামীণ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক তথ্য ও উন্নয়নের ভিত্তিতে এই আন্দোলনের প্রভাবগুলোকে নিচে ভাগ করা হলো:

১. অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং সম্পদ সৃষ্টি

- **"লখপতি দিদি" তৈরি:** এই মিশন সফলভাবে **২ কোটিরও বেশি** নারীকে বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার আয়ের সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। সরকার বর্তমানে এই লক্ষ্যমাত্রা **৩ কোটি সদস্যে** উন্নীত করার কাজ করছে, যা গ্রামীণ পরিবারগুলোকে কেবল টিকে থাকার লড়াই থেকে উদ্বৃত্ত আয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
- **পুঁজি গঠন (Capital Formation):** গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় "বীজ মূলধন" (Seed Capital) হিসেবে প্রায় **৫৬.৬৯ লক্ষ কোটি টাকা** রিভলভিং ফান্ড এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

- **জীবিকার বৈচিত্র্যকরণ:** প্রচলিত কৃষিকাজের বাইরেও মহিলারা এখন **ড্রোন চালানো (নমো ড্রোন দিদি)**, এলইডি বাল্ব তৈরি এবং সৌর প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণের মতো উচ্চ-মূল্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, যা গ্রামীণ জিডিপিতে (GDP) তাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।

২. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ঋণ শৃঙ্খলা

- **বিপুল ব্যাংক ঋণ (Credit Leverage):** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো **১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি** ব্যাংক ঋণ সংগ্রহ করেছে। এর ফলে মহাজনদের শোষণমূলক ঋণের ওপর নির্ভরতা প্রায় **২০% হ্রাস** পেয়েছে।
- **অনুকরণীয় ঋণ পরিশোধের হার:** কোনো জামানত (Collateral) ছাড়াই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর **অনাদায়ী ঋণের (NPA) হার মাত্র ১.৭%**। এটি প্রমাণ করে যে গ্রামীণ মহিলাদের ঋণের শৃঙ্খলা অনেক ক্ষেত্রে বড় করপোরেট ক্ষেত্রকেও ছাড়িয়ে যায়।
- **দোরগোড়ায় ব্যাংকিং:** ১.৪৪ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য **বিসি সখী (BC Sakshi)** হিসেবে কাজ করছেন, যাঁরা আমানত, পেনশন এবং বিমার মতো জরুরি ব্যাংকিং পরিষেবাগুলো গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন।

৩. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি

- **স্তরভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:** এই আন্দোলন একটি শক্তিশালী ত্রি-স্তরীয় কাঠামো তৈরি করেছে: ভিত্তি স্তরে **৯১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)**, ৫.৩৫ লক্ষ গ্রাম সংগঠন (VO) এবং ৩৩,৫৫৮টি **ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশন (CLF)**। এই কাঠামো প্রান্তিক মহিলাদের অভিযোগ প্রতিকার এবং সম্মিলিত দর কষাকষির একটি প্ল্যাটফর্ম দেয়।
- **কমিউনিটি রিসোর্স পারসন (CRP):** ৬ লক্ষেরও বেশি প্রশিক্ষিত সিআরপি (যেমন—**কৃষি সখী, পশু সখী** ইত্যাদি) কৃষি ও পশুপালনে বিশেষ কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন, যা গ্রামীণ উদ্যোগগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করছে।

৪. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- **রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান:** ১০ কোটি পরিবার সংগঠিত হওয়ার ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা একটি নির্ণায়ক **"ভোট ব্যাংক"** হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এর ফলে রাজ্য সরকারগুলো মহিলাদের জন্য বিভিন্ন **সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT)** প্রকল্প চালু করতে বাধ্য হচ্ছে (যেমন: মধ্যপ্রদেশের লাডলি লক্ষ্মী, ঝাড়খণ্ডের মাইয়া সম্মান, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার এবং মহারাষ্ট্রের লাডকি বহিন যোজনা)।
- **শাসনে অংশগ্রহণ:** এই আন্দোলন নেতৃত্বের নার্সারি হিসেবে কাজ করেছে। অনেক সদস্য সফলভাবে **পঞ্চায়েতি রাজ (PRI)** নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং **ভিপিআরপি (VPRP)**-এর মাধ্যমে গ্রাম স্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

৫. মানব উন্নয়ন সূচকের ওপর প্রভাব

- **মানব পুঁজিতে বিনিয়োগ:** পারিবারিক আয় বাড়ার ফলে সরাসরিভাবে **পুষ্টির মান** উন্নত হয়েছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় **কন্যাশিশুদের ভর্তির হার** বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **সামাজিক সংহতি:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো গ্রাম পর্যায়ে মদ্যপান, পারিবারিক সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর **"চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী" (Pressure Groups)** হিসেবে কাজ করছে।

ভারতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

সাফল্য সত্ত্বেও, উদ্যোক্তা উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কিছু কাঠামোগত বাধা বা Bottlenecks রয়ে গেছে:

- **প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরশীলতা:** অনেক Cluster-Level Federations (CLFs) স্বাধীন ও সম্প্রদায়-চালিত সত্তা হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে এখনও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল।
- **ঋণের সীমা এবং ক্রেডিট হিস্ট্রি:** ব্যক্তিগত পর্যায়ে উদ্যোক্তারা ব্যবসা বড় করতে সমস্যার সম্মুখীন হন, কারণ অতীতে ঋণগুলো দলগত (Group-based) হওয়ায় তাদের নিজস্ব কোনো CIBIL স্কোর বা ক্রেডিট হিস্ট্রি তৈরি হয়নি।
- **অব্যবহৃত পুঁজি এবং দায়বদ্ধতা:** প্রায় **৫৬.৬৯ লক্ষ কোটি টাকার** বিশাল মূলধন সহায়তা (Capitalization Support) হয় অপূর্ণ রয়ে গেছে, অথবা এগুলোর কোনো শক্তিশালী সামাজিক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (Social and Statutory Audit) নেই।

- **বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের অভাব:** উন্নত প্যাকেজিং, মানের ধারাবাহিকতা এবং পেশাদার সরবরাহ চেইনের (Supply Chain) অভাবে গ্রামীণ পণ্যগুলো প্রায়ই শহর বা বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।
- **বিচ্ছিন্ন বাস্তবায়ন:** বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পশুপালন) জীবিকা প্রকল্পগুলো প্রায়ই আলাদাভাবে কাজ করে, যার ফলে কাজে পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং দক্ষতার অপচয় হয়।

গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তায় সরকারি উদ্যোগ

২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এবং সাম্প্রতিক নীতিগত পরিবর্তনে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে:

- **DAY-NRLM-এর উপ-প্রকল্প:** টেকসই কৃষির জন্য **মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা (MKSP)** এবং অ-কৃষিভিত্তিক উদ্যোগের জন্য **স্টার্ট-আপ ভিলেজ এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম (SVEP)**।
- **নারী-কেন্দ্রিক সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT):** বিভিন্ন রাজ্যের প্রকল্প যেমন—**লাডলি লক্ষ্মী, মাইয়া সম্মান, লাডকি বহিন** এবং **মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা** মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াচ্ছে।
- **প্রযুক্তিগত সংহতি:** আয় ট্র্যাকিংয়ের জন্য **লখপতি দিদি মোবাইল অ্যাপ** এবং চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য **VPRP** (গ্রাম সমৃদ্ধি ও স্থিতিস্থাপকতা পরিকল্পনা) ব্যবহার করা হচ্ছে।
- **ব্যক্তিগত ক্রেডিট হিস্ট্রি:** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য **CIBIL স্কোর** তৈরির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা দলীয় ঋণের সীমা পেরিয়ে বড় ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ঋণ পেতে পারেন।
- **বাজার সংযোগ:** SARAS Aajeevika, GeM (Government e-Marketplace) পোর্টাল এবং রাজ্য স্তরের উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ পণ্যের ব্র্যান্ডিং, গুণমান নিশ্চিতকরণ এবং বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে।
- **NRETP (National Rural Economic Transformation Project):** বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই প্রকল্প গ্রামীণ নারীদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং ক্লাস্টার-ভিত্তিক জীবিকা শক্তিশালী করছে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুজ্জীবিতকরণ:** ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশনগুলোকে (CLF) স্বাধীন **বিজনেস হাব** হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেরালা'র **কুদুম্বশ্রী** বা বিহারের **জীবিকা** মডেলের মতো এগুলো প্রশাসনিক হস্তক্ষেপমুক্ত "বিজনেস ক্লিনিক" হিসেবে কাজ করবে।
- **ব্যক্তিগত আর্থিক পরিচয়:** দলগত ঋণ থেকে সরে এসে **ব্যক্তিগত CIBIL স্কোর** চালু করা। এর ফলে "লখপতি দিদিরা" **৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত ঋণ** এবং SIDBI-এর মাধ্যমে **ভেঞ্চার ক্যাপিটাল** বা ইক্যুইটি অর্থায়ন পেতে পারবেন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় (Convergence):** বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য **NITI Aayog-এ একটি কনভারজেন্স সেল** গঠন করা প্রয়োজন, যা গ্রামীণ স্টার্টআপগুলোর জন্য "সিঙ্গেল উইন্ডো" সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করবে।
- **বাজার ও ডিজিটাল একীকরণ:** গ্রামীণ পণ্যগুলোকে একটি অভিন্ন **"রুরাল ব্র্যান্ড"**-এর আওতায় আনার জন্য **SHE Marts** এবং একটি জাতীয় বিপণন বিভাগ তৈরি করা। এছাড়া পণ্যগুলোকে **ONDC (Open Network for Digital Commerce)**-এর সাথে যুক্ত করা যাতে গ্রামের পণ্য সরাসরি শহরের বাজারে পৌঁছাতে পারে।

উপসংহার

ভারতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তার পরবর্তী পর্যায়টি মূলত **ক্ষুদ্র-ঋণ (Micro-finance) থেকে ক্ষুদ্র-পুঁজিবাদের (Micro-capitalism)** দিকে একটি রূপান্তর। ক্লাস্টার-লেভেল ফেডারেশনগুলোকে স্বাধীন অর্থনৈতিক ইঞ্জিন হিসেবে ক্ষমতায়ন এবং দলগত ঋণ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যবর্তী দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলার মাধ্যমে **DAY-NRLM** একটি **"বিকশিত ভারত"** গড়ে তোলার অনুঘটক হতে পারে। এই পর্যায়ের সাফল্য নির্ভর করবে বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়, শক্তিশালী সামাজিক নিরীক্ষা এবং নিরবচ্ছিন্ন বাজার একীকরণের ওপর।

প্রশ্ন: *ভারত ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক বাণিজ্য ধাক্কা এবং ভূ-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। আর্থিক সতর্কতা (Fiscal Prudence), সরকারি বিনিয়োগ এবং ক্ষেত্রভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং মধ্যমেয়াদী প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী করা সম্ভব—তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.1.7. ভারতের পরবর্তী শিল্প বিপ্লব: অণু বনাম ইলেকট্রন

প্রেক্ষাপট

- ২০২৬ সালের শুরুর দিকে, একটি **মৌলিক পরিবর্তন** বিশ্বব্যাপী শিল্প সক্ষমতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, বিশ্বজুড়ে উৎপাদন ব্যবস্থা **"অণু"** (Molecules) অর্থাৎ কয়লা, তেল এবং গ্যাসের দহনের মাধ্যমে তাপ ও গতি তৈরির ওপর নির্ভরশীল ছিল।
- বর্তমানে এই আদর্শটি দ্রুত একটি **"ইলেকট্রন-ভিত্তিক"** (Electron-based) মডেলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে **বৈদ্যুতিক গ্রিডের** মাধ্যমে সরবরাহ করা **স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ** উৎপাদনের প্রাথমিক চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।
- এই রূপান্তরটি এখন আর কেবল জলবায়ু উদ্বেগের কারণে ঘটছে না; এটি **প্রতিযোগিতা সক্ষমতা**, বাণিজ্য সুবিধা, মূলধন বরাদ্দ, **জ্বালানি নিরাপত্তা** এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধারণাগত কাঠামো — অণু বনাম ইলেকট্রন

শিল্পের **কার্বন নিঃসরণ হ্রাস** (Decarbonisation) বোঝার জন্য 'অণু' এবং 'ইলেকট্রন'-এর মধ্যে পার্থক্যটি একটি স্পষ্ট বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে:

- **অণু** (Molecules): কয়লা, তেল, গ্যাস, এলপিজি এবং জৈব জ্বালানি।
  - এগুলো সরাসরি **বয়লার, ফার্নেস এবং ইঞ্জিনে** দহন করা হয়।
  - এর বৈশিষ্ট্য হলো **নিম্ন দক্ষতা**, স্থানীয় দূষণ এবং কার্বন নিঃসরণের দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি (Carbon lock-in)।
- **ইলেকট্রন** (Electrons): বিদ্যুৎ গ্রিডের মাধ্যমে সরবরাহ করা শক্তি।
  - এগুলো **ইলেকট্রিক মোটর**, ডিজিটালভাবে নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে।
  - বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়লে এটি দ্রুত **কার্বন নিঃসরণ কমাতে** সাহায্য করে।
- **বৈদ্যুতিকীকরণের প্রধান সুবিধাসমূহ:**
  - **উচ্চ দক্ষতা** (Higher Efficiency): ইলেকট্রিক মোটর ইনপুট শক্তির **৯০%-এর বেশি** দরকারী কাজে রূপান্তর করতে পারে, যেখানে অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন (Internal Combustion Systems) মাত্র **৩০–৩৫%** রূপান্তর করে।
  - **স্বয়ংক্রিয়করণ এবং নির্ভুলতা:** বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াগুলো উন্নত নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ এবং বর্জ্য কমাতে সাহায্য করে।**কার্বন মুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি:** বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা যত বেশি নবায়নযোগ্য হবে, বৈদ্যুতিক শিল্পগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্বনমুক্ত হতে থাকবে।
  - **জ্বালানি প্রতিস্থাপন প্রভাব:** বৈদ্যুতিকীকরণের প্রতিটি ধাপে আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পায়।

বর্তমান অবস্থা: ভারত বনাম বিশ্ব

পরিমাপ (Metric)	ভারত	চীন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / ইউরোপীয় ইউনিয়ন
শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণ	প্রায় ২৫%	প্রায় ৫০%	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- ৩২%; ইইউ- ৩৪%

সবুজ ইলেকট্রন শেয়ার	৭-৮%	শীর্ষস্থানে	প্রায় ১২%
কৌশলগত ফোকাস	উৎপাদন ক্ষমতা	গ্রিড + ইলেকট্রন-নির্ভর শিল্প	ভোক্তা ও পরিষেবা কেন্দ্রিক

দ্রষ্টব্য: সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্তরে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রায় সমানভাবে (এক-তৃতীয়াংশ) বৈদ্যুতিকীকরণের স্তরে থাকলেও, চীনের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে তাদের **সুনির্দিষ্ট শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণ** (Targeted Industrial Electrification) কৌশলের মধ্যে।

বিদ্যুৎ-চালিত শিল্প কৌশল

চীনের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, কীভাবে বিদ্যুৎ-চালিত ব্যবস্থাকে (Electrification) কেবল জ্বালানি পরিবর্তনের একটি অংশ হিসেবে নয়, বরং সুচিন্তিতভাবে একটি **শিল্প নীতির হাতিয়ার** হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- **শিল্প জ্বালানির গঠন:** চীনের শিল্পের মোট জ্বালানি চাহিদার প্রায় **অর্ধেক বিদ্যুৎ থেকে মেটানো হয়**, যা অন্য যে কোনো বড় অর্থনীতির তুলনায় অনেক বেশি।
- **বিদ্যুৎ সরবরাহের মান:** উচ্চ বৈদ্যুতিকীকরণের পাশাপাশি তারা **সবুজ বিদ্যুতের** (Green Electricity) বৃহত্তম অংশ নিশ্চিত করেছে, যা তাদের কার্বন-মুক্ত উৎপাদন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে।
- **সহায়ক পরিকাঠামো:** বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা, **আল্ট্রা-হাই-ভোল্টেজ ট্রান্সমিশন**, গ্রিড-স্কেল স্টোরেজ এবং নমনীয় সাবস্টেশনে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নিরবচ্ছিন্ন শিল্প বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
- **ইস্পাত খাতের রূপান্তর:** স্ক্র্যাপ রিসাইক্লিং নীতি এবং বিদ্যুতের বিশেষ মূল্যের মাধ্যমে **ইলেক্ট্রিক আর্ক ফার্নেস** (Electric Arc Furnaces)-এর বিস্তারকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।
- **সিমেন্ট খাতের আধুনিকীকরণ:** বৈদ্যুতিক গ্রাইন্ডিং, ডিজিটাল প্রসেস কন্ট্রোল এবং **বর্জ্য-তাপ পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা** (Waste-heat recovery) জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়েছে। এছাড়া অনিবার্য নিঃসরণ কমাতে **কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ** (CCUS) পাইলট প্রকল্পগুলো কাজ করছে।

কৌশলগত তাৎপর্য: ইলেকট্রন-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে রূপান্তর

"অণু-ভিত্তিক" শিল্প কাঠামো থেকে **"ইলেকট্রন-চালিত" অর্থনীতির** দিকে এই পরিবর্তন ভারতের অর্থনৈতিক ও সার্বভৌম প্রেক্ষাপটে একটি মৌলিক পুনর্গঠন নির্দেশ করে।

- **বিশ্বব্যাপী রপ্তানি আধিপত্য:** ইউরোপীয় ইউনিয়নের **CBAM** (Carbon Border Adjustment Mechanism)-এর মতো বাণিজ্য ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে **"সবুজ ইলেকট্রন"** বা গ্রিন ইলেকট্রন হয়ে উঠবে বাণিজ্যের নতুন মুদ্রা। কম কার্বন নির্গত পণ্যগুলো **ভারী কার্বন কর** (Carbon Taxes) এড়াতে পারবে এবং বিশ্ববাজারে **"পছন্দসই সরবরাহকারী"** (Preferred Supplier) হিসেবে মর্যাদা পাবে।
- **জ্বালানি স্বাধীনতা:** শিল্পের তাপ ও গতির উৎসকে বিদ্যুৎ গ্রিডের দিকে সরিয়ে আনলে আমদানিকৃত **অস্থিতিশীল তেল এবং গ্যাসের** ওপর নির্ভরতা কমে আসবে। ভারতের নিজস্ব সৌর, বায়ু এবং পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করে দেশ তার বার্ষিক **জ্বালানি আমদানির খরচ** কমাতে পারবে এবং **ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা** থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে পারবে।
- **শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ** (Industrial Decentralization)**:** বৈদ্যুতিকীকরণ শিল্প প্রবৃদ্ধিকে জ্বালানি পরিবহনের জটিলতা থেকে মুক্ত করে। কয়লা-নির্ভর শিল্পগুলো যেমন খনি বা পাইপলাইনের কাছে থাকতে বাধ্য হয়, **"ইলেকট্রন-ফার্স্ট"** কারখানাগুলো তার বদলে **দক্ষ জনবল** বা **প্রধান বন্দরগুলোর** কাছে স্থাপন করা সম্ভব। এটি সম্পদের সান্নিধ্যের চেয়ে **মানবসম্পদকে** বেশি গুরুত্ব দেয়।
- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** (Macroeconomic Resilience)**:** গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি (যার খরচ দীর্ঘমেয়াদে প্রায় নির্দিষ্ট থাকে), পণ্যের বাজারের ওঠানামা থেকে রক্ষা পেতে একটি **সুরক্ষা কবজ** হিসেবে কাজ করে। এই স্থিতিশীলতা দীর্ঘমেয়াদী করপোরেট পরিকল্পনা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করে।

- **দক্ষতার লভ্যাংশ (The Efficiency Dividend):** বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা জন্মগতভাবেই উন্নত। যেখানে দহন প্রক্রিয়া (Combustion) শক্তির ৩৫%-এর কম কাজে লাগাতে পারে, সেখানে **ইলেকট্রিক মোটর ৯০%-এর বেশি** শক্তিকে কাজে রূপান্তরিত করে। এর ফলে সমপরিমাণ উৎপাদনের জন্য কম শক্তির প্রয়োজন হয়, যা স্বাভাবিকভাবেই ভারতের **জ্বালানি প্রতি জিডিপি (GDP per unit of energy)** বৃদ্ধি করে।

ভারতের শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণ: কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসমূহ

ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি করেছে এবং **বার্ষিক সৌরবিদ্যুৎ সংযোজনে** বিশ্বজুড়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে, তবুও শিল্পের বৈদ্যুতিকীকরণ এখনও সীমিত।

- **বর্তমান শিল্প জ্বালানি চিত্র:** ভারতের শিল্পক্ষেত্রে মোট জ্বালানি ব্যবহারের মাত্র **এক-চতুর্থাংশ বিদ্যুৎ** থেকে আসে। এর মধ্যে **সবুজ বিদ্যুৎ (Green Electricity)** বা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের অংশ অত্যন্ত কম।
- **পুরানো পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা:** অনেক সংস্থা এখনও তাদের কারখানায় সরাসরি **জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের (Fossil-fuel combustion)** ওপর নির্ভরশীল, যা তাদের অণু-ভিত্তিক (Molecule-based) উৎপাদন ব্যবস্থায় আটকে রেখেছে।
- **বিদ্যুতের মানের সীমাবদ্ধতা:** বিদ্যুতের **অস্থিরতা এবং অনির্ভরযোগ্যতা** সংস্থাগুলোকে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-চালিত প্রক্রিয়ায় যেতে নিরুৎসাহিত করে।
- **নীতিগত সীমাবদ্ধতা:** সরকারি নীতিগুলো মূলত **বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির** ওপর বেশি জোর দিয়েছে, কিন্তু শিল্পের বৈদ্যুতিকীকরণের ওপর ততটা গুরুত্ব দেয়নি।
- **উদীয়মান ঝুঁকি:** সঠিক পদক্ষেপ না নিলে, বিশ্বজুড়ে কার্বন নির্গমনের মানদণ্ড কঠোর হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় শিল্পগুলো তাদের **প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (Competitiveness)** হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে।

গ্রিন স্টিল (Green Steel): ভারতের জলবায়ু পরিবর্তনের গতিপথ

ইস্পাত শিল্প এমন একটি কঠিন ক্ষেত্র যেখানে 'ইলেকট্রন-অণু'র এই রূপান্তরটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট।

- **কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের পথ:** ভারত বর্তমানে তার মোট ইস্পাতের প্রায় **৩০% ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস (EAF)** পদ্ধতিতে তৈরি করে। এর তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭০% ইস্পাত এই পদ্ধতিতে তৈরি হয়।
- **গ্রিন স্টিল ট্যাক্সোনমি (শ্রেণিবিন্যাস):** ভারত ইস্পাতের কার্বন নিঃসরণ তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে **স্টার-রেটিং ব্যবস্থা** চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের CBAM-এর মতো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।
- **প্রধান চালিকাশক্তি:** গ্রিন স্টিলে রূপান্তরের জন্য কয়লা-ভিত্তিক DRI (Direct Reduced Iron)-এর পরিবর্তে হাইড্রোজেন-ভিত্তিক DRI অথবা নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত স্ক্র্যাপ-ভিত্তিক EAF পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণে ভারতের ক্ষেত্রভিত্তিক সম্ভাবনা

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভারতের কাছে শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণ ত্বরান্বিত করার কয়েকটি কার্যকর পথ রয়েছে:

- **ইস্পাত খাতের সুযোগ:** যেহেতু এক-তৃতীয়াংশ ইস্পাত উৎপাদন ইতিমধ্যেই **ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস** ব্যবহার করে, তাই উন্নত **স্ক্র্যাপ সংগ্রহ** এবং পরিচ্ছন্ন বিদ্যুতের ওপর বিশেষ সুবিধা দিয়ে এর প্রসার ঘটানো সম্ভব।
- **সিমেন্ট খাতের সুযোগ:** বৈদ্যুতিক কিলন (Kiln), বৃহৎ আকারের **বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার (Waste Heat Recovery - WHR)** এবং কার্বন ক্যাপচার হাব ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দশকে জ্বালানি খরচ অনেকটা কমানো সম্ভব।
- **MSME (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) চ্যালেঞ্জ:** এই শিল্পের মূল বাধা প্রযুক্তি নয়, বরং **সুযোগের অভাব**। কারণ তারা এখনও কয়লা বয়লার এবং ডিজেল জেনারেটরের ওপর নির্ভরশীল।
- **আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা:** MSME-গুলোর বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য **সহজ শর্তে ঋণ (Concessional Finance)** এবং সম্মিলিতভাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি।

- **ডিজিটালাইজেশনের ভূমিকা:** নতুন শিল্প ক্লাস্টারগুলোতে **ডিজিটাল কন্ট্রোল** যুক্ত করলে শক্তির অপচয় কমবে এবং বিশ্ববাজারের জন্য প্রয়োজনীয় **নির্ভুল কার্বন নিঃসরণ তথ্য (Emissions Data)** প্রদান করা সহজ হবে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

ভারত সরকার "ইলেকট্রন গ্যাপ" বা বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে বেশ কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- **গ্রিন স্টিল ট্যাক্সোনমি (২০২৪):** কার্বন নির্গমনের তীব্রতার ওপর ভিত্তি করে ইস্পাতকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা। সর্বনিম্ন নির্গমনের ইস্পাতের জন্য **৫-স্টার রেটিং** প্রদান করা হয়।
- **খসড়া জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি (NEP) ২০২৬:** ২০৩০ সালের মধ্যে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার **২,০০০ kWh**-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা এবং **গ্রিড ডিজিটালাইজেশন** ও SCADA সিস্টেমের ওপর জোর দেওয়া।
- **ইন্ডিয়ান কার্বন মার্কেট (ICM):** ২০২৬ সালের শুরুতে বিজ্ঞাপিত **কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS)** এখন সিমেন্ট, ইস্পাত, রিফাইনারি এবং টেক্সটাইল খাতের ৪৯০টি সংস্থাকে কভার করে।
- **জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন (NGHM):** ব্লাস্ট ফার্নেস এবং DRI উৎপাদনে হাইড্রোজেন ব্যবহারের পরীক্ষা করার জন্য পাঁচটি পাইলট প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা: একটি কৌশলগত রোডম্যাপ

- **শিল্প বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য জাতীয় মিশন:** কারখানায় সরাসরি দহন প্রক্রিয়ার বদলে গ্রিড-ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য একটি নিবেদিত মিশন চালু করা।
- **গ্রিড আধুনিকীকরণ:** নবায়নযোগ্য শক্তির অনিয়মিত লোড সামলানোর জন্য **আল্ট্রা-হাই-ভোল্টেজ (UHV)** ট্রান্সমিশন এবং **গ্রিড-স্কেল স্টোরেজ** (যেমন: পাম্পড স্টোরেজ প্রজেক্ট) বিনিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- **নতুন শিল্প ক্লাস্টারের বৈদ্যুতিকীকরণ:** নতুন সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং SEZ-গুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে **"ইলেকট্রন-ফার্স্ট"** হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে পরিকাঠামো হবে বৈদ্যুতিক হিটিং ও প্রসেসিং উপযোগী।
- **MSME ট্রানজিশন ফিন্যান্স:** কয়লা বয়লারের বদলে ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন ফার্নেস বসাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য একটি **"ট্রানজিশন ফান্ড"** তৈরি করা।
- **সবুজ সরকারি সংগ্রহ (Green Public Procurement - GPP):** ২০২৮ সালের মধ্যে সরকারি পরিকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইস্পাত ও সিমেন্টের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন ২৫%) যেন "গ্রিন স্টার" মানসম্পন্ন হয়, তা বাধ্যতামূলক করা।
- **স্ক্র্যাপ পলিসি আনুষ্ঠানিকীকরণ: ভেহিকল স্ক্র্যাপিং পলিসি** বা পুরনো গাড়ি ধ্বংস করার নীতিকে আরও শক্তিশালী করা, যাতে ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসের (EAF) জন্য প্রয়োজনীয় স্টিল স্ক্র্যাপের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

উপসংহার

একটি **"ইলেকট্রন-ফার্স্ট"** মডেলের দিকে রূপান্তর ভারতের শিল্প সার্বভৌমত্বের জন্য একটি চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণ। এর জন্য কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং উৎপাদনের মূলে **গভীর বৈদ্যুতিকীকরণ (Deep Electrification)** প্রয়োজন। আমদানিকৃত এবং কার্বন-সমৃদ্ধ **"অণু"**-র বদলে দেশীয় **"সবুজ ইলেকট্রন"** ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত একটি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক এবং স্থিতিশীল শিল্প ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এটিই **বিকশিত ভারত @ ২০৪৭**-এর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করবে।

প্রশ্ন: *বিদ্যুৎ-চালিত শিল্প কৌশলের দিকে রূপান্তর কীভাবে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শিল্প বিকেন্দ্রীকরণে অবদান রাখে? ব্যাখ্যা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.1.8. ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তা তখনই বজায় থাকে যখন সব মানুষের কাছে সব সময় সক্রিয় ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত, **নিরাপদ এবং পুষ্টিকর** খাবারের শারীরিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ বা সামর্থ্য থাকে।

- **গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) ২০২৫-২৬:** ১২৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান **১০৫তম**।
- **অর্থনৈতিক রূপান্তর:** ভারত একসময় খাদ্যের জন্য বিদেশের সাহায্যের (PL-480 যুগ) ওপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম **চাল রপ্তানিকারক** (২০২৫ অর্থ বছরে ২০.২ মিলিয়ন টন)।

FAO-এর মতে খাদ্য নিরাপত্তার চারটি প্রধান স্তম্ভ:

১. **সহজলভ্যতা (Availability):** এটি খাদ্যের যোগানের দিক। এর অর্থ হলো দেশে শারীরিকভাবে খাদ্যের উপস্থিতি, যা নিশ্চিত হয়:

- দেশের নিজস্ব **কৃষি উৎপাদন**।
- বাণিজ্যিক **আমদানি**।
- খাদ্য সাহায্য এবং সরকারের কাছে থাকা **খাদ্য মজুত** (যেমন: FCI-এর গুদাম)।

২. **সুযোগ বা নাগাল (Accessibility):** মানুষের খাবার পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষমতা। বাজারে খাবার থাকলেই হবে না, মানুষের নিচের ক্ষমতাগুলো থাকতে হবে:

- **অর্থনৈতিক সুযোগ:** খাবার কেনার মতো পর্যাপ্ত **আয় বা ক্ষমতা**।
- **শারীরিক সুযোগ:** খাবার পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় **অবকাঠামো** (যেমন: রাস্তাঘাট, রেশন দোকান)।

৩. **সাধ্য ও উপযোগিতা (Affordability / Utilization):** খাবারের **পুষ্টিগুণ** এবং শরীর সেটা কতটা গ্রহণ করতে পারছে তার ওপর এটি নির্ভর করে।

- **পুষ্টির মান:** পুষ্টি শোষণের জন্য নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা।
- **খাদ্য সুরক্ষা:** পুষ্টির অভাব বা **'লুকানো ক্ষুধা'** দূর করতে সঠিক রান্নার পদ্ধতি এবং বৈচিত্র্যময় খাবার।

৪. **স্থিতিশীলতা (Stability):** ওপরের তিনটি স্তম্ভের **ধারাবাহিকতা**।

- সাময়িক ধাক্কা (যেমন: ফসল নষ্ট হওয়া)।
- অর্থনৈতিক ধাক্কা (যেমন: হঠাৎ জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া বা বেকারত্ব)।
- রাজনৈতিক বা জলবায়ুগত ধাক্কা (যেমন: যুদ্ধ, বন্যা বা খরা)।

ভারতে খাদ্য নিরাপত্তার কেন প্রয়োজন?

১. **তীব্র অপুষ্টি এবং 'লুকানো ক্ষুধা':** উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত **'পুষ্টির বৈপরীত্যে'** ভুগছে।

NFHS-5 তথ্য অনুযায়ী,

- **অ্যানিমিয়া:** ৫০%-এর বেশি মহিলা ও শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে। পুষ্টির অভাব মেটাতে **ফর্টিফাইড (পুষ্টিসমৃদ্ধ)** খাবার জরুরি।

২. **জনসংখ্যার চাপ:** ১৪০ কোটির বেশি জনসংখ্যার এই দেশে খাবারের নিরবচ্ছিন্ন যোগান প্রয়োজন। যোগানে ঘাটতি হলে **সামাজিক অশান্তি** ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

৩. **জলবায়ু ঝুঁকি:** ভারতীয় কৃষি মূলত **'মৌসুমি বায়ুর ওপর নির্ভরশীল'**।
   - অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ এবং অসময়ে বৃষ্টি ফলন কমিয়ে দিচ্ছে।
   - বিপর্যয়ের সময় সরকারের **খাদ্য মজুত** একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

৪. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** সাধারণ মানুষের ব্যয়ের বড় অংশ খাবারের পেছনে যায়। খাদ্যের দাম বেড়ে গেলে দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় কমে যায় এবং দেশের অর্থনীতিতে **মুদ্রাস্ফীতি** দেখা দেয়।

৫. **মানবসম্পদ উন্নয়ন:** ক্ষুধার্ত শিশু পড়াশোনা করতে পারে না এবং অপুষ্টিতে ভোগা শ্রমিক উৎপাদনশীল হয় না। তাই দেশের উন্নতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রাথমিক শর্ত।

৬. **নৈতিক ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ (বেঁচে থাকার অধিকার)**-এর অংশ হিসেবে **'খাদ্যের অধিকার'**-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে **'ক্ষুধামুক্ত' (SDG 2)** দেশ গড়ার অঙ্গীকার ভারতের রয়েছে।

সরকারি উদ্যোগসমূহ

স্তম্ভ ১: খামার স্তরের স্থিতিস্থাপকতা এবং সঞ্চয়

- **পিএম ধান-ধান্য কৃষি যোজনা (PM-DDKY):** ২০২৫ সালের অক্টোবরে চালু হওয়া এই ৬ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি **১০০টি কম উৎপাদনশীল জেলাকে** লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো টেকসই কৃষি পদ্ধতি এবং শস্য বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে ফলন বাড়ানো।
- **সমবায় খাতে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সঞ্চয় পরিকল্পনা:** প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS) ব্যবহার করে বিকেন্দ্রীকৃত সঞ্চয় ব্যবস্থা তৈরি করা। এটি ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি কমায় এবং কৃষকদের অভাবী বিক্রি (Distress Sale) রোধ করে।
- **ডিজিটাল এগ্রিকালচার মিশন:** কৃষকদের জন্য একটি "ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার" তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে **এগ্রিস্ট্যাক (AgriStack)** (পরিচয়/জমির রেকর্ড), যা নিশ্চিত করে যে PM-KISAN-এর মতো ভর্তুকি যেন কোনো রকম চুরি বা অপচয় ছাড়াই সঠিক মানুষের হাতে পৌঁছায়।

স্তম্ভ ২: পুষ্টি নিরাপত্তা - লুকানো ক্ষুধা দূরীকরণ

- **মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০:** এটি মূলত মা ও শিশুর পুষ্টির ওপর গুরুত্ব দেয়।
- **চালের ফর্টিফিকেশন (Rice Fortification):** রেশনে (PDS), মিড-ডে মিল (PM-POSHAN) এবং ICDS-এর মাধ্যমে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B12 সমৃদ্ধ পুষ্টিগুণসম্পন্ন চাল সরবরাহ বাধ্যতামূলক করা।
- **সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি:** আধুনিক পরিকাঠামো (অডিও-ভিজ্যুয়াল এইড, বিশুদ্ধ জল) সহ ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে উন্নত করা।
- **জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি মিশন (NFSNM):** ২০২৫-২৬ সালে পুরনো NFSM-এর নাম পরিবর্তন করে এটি রাখা হয়েছে। এখানে **পুষ্টিকর শস্য (শ্রী অন্ন/মিলেট)** চাষের জন্য একটি বিশেষ শাখা যুক্ত করা হয়েছে।

স্তম্ভ ৩: মূল্য ও মজুত ব্যবস্থাপনা

- **গমের মজুত সীমা (২০২৫-২৬):** ২০২৬ সালের ফসল কাটার মরসুমে কালোবাজারি এবং অসাধু জল্পনা রোধ করতে ব্যবসায়ী, পাইকারি বিক্রেতা এবং বড় রিটেল চেইনগুলোর ওপর গমের মজুতের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **ডাল ও ভোজ্য তেলে স্বনির্ভরতা মিশন:** অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন এবং ফ্যাটের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আমদানি নির্ভরতা কমানো।

স্তম্ভ ৪: লক্ষ্যভিত্তিক বন্টন ও ভর্তুকি

- **প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY):** এটি জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের (NFSA) সাথে যুক্ত। এটি **৮১.৩৫ কোটি** মানুষকে **বিনামূল্যে খাদ্যশস্য** প্রদান করে। ২০২৫ সালের শেষে এটি আরও ৫ বছরের জন্য (ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত) বাড়ানো হয়েছে, যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা।
- **এক দেশ এক রেশন কার্ড (ONORC):** এটি এখন দেশজুড়ে কার্যকর। এর ফলে পরিযায়ী শ্রমিকরা বায়োমেট্রিক পরিচয় ব্যবহার করে যেকোনো রেশন দোকান (FPS) থেকে তাদের প্রাপ্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
- **ওপেন মার্কেট সেল স্কিম (OMSS):** ২০২৬ সালের শুরুতে খুচরো বাজারে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি গুদাম থেকে গম এবং চাল খোলা বাজারে বিক্রি করা হয়েছে।

বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ

- **ভারত-ইউএই খাদ্য করিডোর:** সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং ভারতকে পশ্চিম এশিয়ার জন্য একটি "খাদ্য ভাণ্ডার" (Food Bowl) হিসেবে গড়ে তোলা।
- **WFP পার্টনারশিপ:** ভারত বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত এলাকাগুলোতে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ করছে, যা ভারতকে কেবল সাহায্য গ্রহীতা নয় বরং একটি "সমাধান দাতা" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- **আন্তর্জাতিক চারণভূমি ও পশুপালক বর্ষ (২০২৬):** জাতিসংঘ ২০২৬ সালকে এই নামে ঘোষণা করেছে যাতে টেকসই গবাদি পশু পালন এবং চারণভূমির ভূমিকা তুলে ধরা যায়।
- **ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে G20 বৈশ্বিক জোট (২০২৫-২৬):** ব্রাজিলের G20 সভাপতিত্বে এটি চালু হয়। এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ কোটি মানুষের কাছে নগদ অর্থ সাহায্য পৌঁছানো এবং ১০ কোটি ক্ষুদ্র কৃষককে স্বাবলম্বী করা।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটিসমূহ

- **শান্তা কুমার কমিটি (২০১৫):** FCI (ভারতের খাদ্য নিগম) পুনর্গঠন এবং রেশনে সরাসরি নগদ সুবিধা (DBT) চালুর সুপারিশ করেন।
- **অশোক ডালওয়াই কমিটি:** কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ওপর গুরুত্ব দেন।
- **নীতি আয়োগ টাস্ক ফোর্স (২০২৫):** রেশনে শুধুমাত্র চাল-গম নয়, বরং ডাল, তেল এবং মিলেট যুক্ত করে একটি "পুষ্টির ঝুড়ি" (Nutrition Basket) তৈরির প্রস্তাব দেয়।

ভারতে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **কাঠামোগত এবং সরবরাহ শৃঙ্খল জনিত সমস্যা**

- **রেশনে চুরি বা লিকেজ (PDS Leakages):** ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন সত্ত্বেও, ২০২৬ সালের শুরুর দিকের হিসেব অনুযায়ী জনবন্টন ব্যবস্থায় (PDS) প্রায় **২০-২৮% চুরির** আশঙ্কা রয়েছে।
- **পরিকাঠামোর অভাব:** ভারতে পর্যাপ্ত **কোল্ড চেইন স্টোরেজ** বা হিমঘরের অভাব রয়েছে। এর ফলে ফসল তোলার পর প্রায় **৪০% পচনশীল পণ্য** (ফল ও সবজি) নষ্ট হয়ে যায়।
- **ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত জমি:** ভারতের ৮৬%-এর বেশি কৃষক "ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক"। এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং বড় পরিসরে চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **"লুকানো ক্ষুধা" বা পুষ্টির চ্যালেঞ্জ**

- **একফসলি চাষে ঝোঁক:** ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) ব্যবস্থা মূলত ধান ও গমের ওপর জোর দেয়। এর ফলে ডাল ও মিলেটের মতো পুষ্টিকর শস্যের চাষ কমে যাচ্ছে।
- **ক্ষুদ্র পুষ্টি উপাদানের অভাব:** মানুষের ক্যালরি পূরণ হলেও শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেল পাচ্ছে না। **NFHS-5** এবং ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী, **৫০%-এর বেশি নারী ও শিশু** আজও রক্তাল্পতায় (Anemia) ভুগছে।
- **মাটির স্বাস্থ্যের অবনতি:** রাসায়নিক সারের (ইউরিয়া) অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটিতে জিংক এবং বোরনের অভাব দেখা দিচ্ছে। এর ফলে উৎপাদিত ফসলও পুষ্টিহীন হয়ে পড়ছে।

৩. **জলবায়ু এবং পরিবেশগত ঝুঁকি**

- **চরম আবহাওয়া:** ২০২৪-২৫ সালের তাপপ্রবাহ এবং ২০২৬ সালের অনিশ্চিত মৌসুমি বায়ু প্রমাণ করেছে যে জলবায়ু পরিবর্তন এক মরসুমেই **১০-১৫% গমের ফলন** কমিয়ে দিতে পারে।
- **ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস:** পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো এলাকায় ধান চাষের ফলে জলের স্তর অত্যন্ত নিচে নেমে গেছে, যা ভবিষ্যতে চাষাবাদকে অসম্ভব করে তুলছে।
- **ভূমি ক্ষয়:** FAO-এর ২০২৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রায় **৩০% জমি** ক্ষয়ের মুখে রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

৪. **অর্থনৈতিক এবং বৈশ্বিক চাপ**

- **মুদ্রাস্ফীতির চাপ:** মধ্যপ্রাচ্য বা পূর্ব ইউরোপের যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক সংঘাতের ফলে **সার এবং জ্বালানির দাম** বাড়ছে। এটি সরাসরি সরকারের খাদ্য খরচ এবং সাধারণ মানুষের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **ভর্তুকির বোঝা:** বর্তমানে খাদ্য ভর্তুকি বিল (PMGKAY) মোট বাজেটের প্রায় **৪-৫%** দখল করে থাকে। এর ফলে সেচের মতো দীর্ঘমেয়াদী কৃষি বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত টাকা থাকছে না।

৫. **আর্থ-সামাজিক বাধা**

- **তথ্যগত ভুল বা বর্জন (Exclusion Errors):** ২০২৬ সালেও খাদ্য নিরাপত্তার আওতা নির্ধারণে ২০১১ সালের জনগণনার (Census) তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে প্রায় **১০ কোটি অভাবী মানুষ** রেশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছেন।
- **লিঙ্গ বৈষম্য:** পরিবারের ভেতরে খাদ্য বন্টনের সময় পুরুষদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে নারী ও কন্যারা অনেক সময় পর্যাপ্ত পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হন।

ভবিষ্যৎ পথ

- **ক্যালোরি থেকে পুষ্টির দিকে নজর:** রেশনে শুধুমাত্র চাল ও গমের বদলে ডাল, ভোজ্য তেল এবং **শ্রী অন্ন (মিলেট)** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে 'লুকানো ক্ষুধা' দূর হয়।
- **উপভোক্তার তথ্য আপডেট:** e-Shram পোর্টালের সাথে NFSA-এর সংযোগ ঘটিয়ে বাদ পড়া ১০ কোটি মানুষকে দ্রুত খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় আনতে হবে।
- **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI):** কৃষকদের জন্য **'এগ্রিস্ট্যাক' (AgriStack)** পুরোপুরি চালু করতে হবে, যাতে তারা মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সরাসরি বাজার সংযোগের (e-NAM) সুবিধা পান।
- **অপচয় রোধ:** ফসল নষ্ট হওয়া কমাতে গ্রাম পর্যায়ে (PACS) আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থা ও কোল্ড চেইন তৈরি করতে হবে।
- **প্রিসিশন ফার্মিং (Precision Farming):** সারের অপচয় কমাতে এবং মাটির স্বাস্থ্য ফেরাতে **AI-চালিত মনিটরিং** এবং ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।
- **জলবায়ু-সহনশীল কৃষি:** ২০২৬ সালের প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলা করতে তাপ ও বন্যা সহ্য করতে পারে এমন ফসলের জাত উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করতে হবে।

উপসংহার

২০২৬ সালে খাদ্য নিরাপত্তা মানে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, বরং সঠিক **ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি** নিশ্চিত করা। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি এবং বন্টন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে **"ক্ষুধামুক্ত" (SDG 2)** হওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন: *২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের (NFSA) প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এই খাদ্য নিরাপত্তা বিলটি ভারতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করতে কীভাবে সাহায্য করেছে? (২৫০ শব্দ)*

3.1.9. সংশোধিত শ্রমবিধি: মজুরি কাঠামোর সংস্কার ও শ্রমিক সশক্তিকরণ

প্রেক্ষাপট

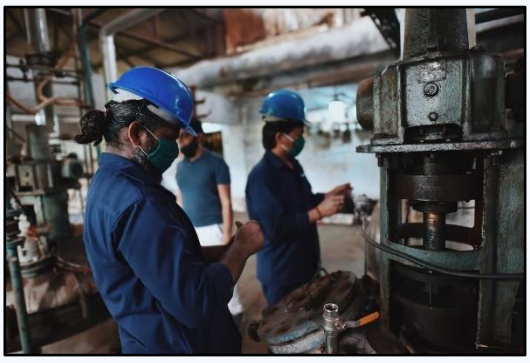

- ভারতে **চারটি শ্রমবিধি**র বাস্তবায়ন মূলত ঔপনিবেশিক আমলের বিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে একটি সুসংহত ও প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থার দিকে আমূল পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।
- **২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে** একত্রিত করার মাধ্যমে এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো— **'সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ' (Ease of Doing Business)**

নিশ্চিত করার পাশাপাশি **'সামাজিক নিরাপত্তার সার্বজনীনকরণ'**-এর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা।

- এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে এমন এক **কাঠামোগত হস্তক্ষেপ**, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সমানভাবে পৌঁছে দিতে ডিজাইন করা হয়েছে।

পটভূমি: শ্রমবিধি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিকভাবে ভারতের শ্রমবাজার অসংখ্য জটিল ও ওভারল্যাপিং আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। এর ফলে একদিকে যেমন নিয়োগকর্তাদের ওপর আইনি পালনের বোঝা বাড়ত, অন্যদিকে দেশের প্রায় **৯০% অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক** কোনো প্রথাগত সুরক্ষা ছাড়াই থেকে যেতেন। এই সমস্যাগুলি সমাধানে **দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশন (২০০২)** আইনগুলিকে একত্রিত করার সুপারিশ করেছিল, যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মোকাবিলা করা যায়:

- **পদ্ধতিগত জটিলতা:** ৪০টির বেশি কেন্দ্রীয় এবং ১০০টিরও বেশি রাজ্য আইন এক অদক্ষ **'ইন্সপেক্টর রাজ'** তৈরি করেছিল।
- **আইনি বিচ্ছিন্নতা: 'মজুরি', 'শ্রমিক'** বা **'কারখানা'**—এই শব্দগুলোর সংজ্ঞায় ধারাবাহিকতা না থাকায় অন্তহীন আইনি বিবাদ লেগেই থাকত।
- **আধুনিক যুগের বর্জন:** দ্রুত বাড়তে থাকা **'গিগ' (Gig) ও 'প্ল্যাটফর্ম' অর্থনীতির** কর্মীদের জন্য আইনি স্বীকৃতির সম্পূর্ণ অভাব ছিল।

শ্রমবিধির প্রধান বিধান: মজুরির পুনর্মূল্যায়ন ও শ্রমিক সশক্তিকরণ

এই সংস্কার মূলত চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: **মজুরি বিধি (২০১৯)**, **শিল্প সম্পর্ক বিধি (২০২০)**, **সামাজিক নিরাপত্তা বিধি (২০২০)** এবং **পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ বিধি (২০২০)**।

১. **মজুরির অভিন্ন সংজ্ঞা**

- **মজুরি বিধি, ২০১৯**-এ 'মজুরি'র একটি একক ও সার্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যা চারটি শ্রমবিধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি আগের বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্র-ভিত্তিক সংজ্ঞাগুলোর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।
- আগের ব্যবস্থায়, **১৯৩৬ সালের মজুরি প্রদান আইন, ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৭২ সালের গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন** এবং **১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের** মতো বিভিন্ন সংবিধিতে মজুরির সংজ্ঞা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এই সংজ্ঞাগুলিতে প্রায়ই বিভিন্ন ভাতাকে বাদ দেওয়া হতো, যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তার হিসেব করার সময় মূল মজুরির ভিত্তি কমে যেত।
- বর্তমানে, মজুরির মধ্যে স্পষ্টতই **বেসিক পে (Basic Pay)**, মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) এবং **রিটেইনিং অ্যালাওয়েন্স** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA), যাতায়াত ভাতা, পিএফ/এনপিএস-এ নিয়োগকর্তার অবদান এবং সংবিধিবদ্ধ বোনাসকে নির্দিষ্ট সীমা সাপেক্ষে বহির্ভূত রাখা হয়েছে।
- এখানে একটি **'৫০% নিয়ম'** যুক্ত করা হয়েছে: মোট পারিশ্রমিকের অন্তত ৫০% অবশ্যই 'মজুরি' হতে হবে। যদি ভাতা ৫০% অতিক্রম করে, তবে অতিরিক্ত অংশটি মজুরির সাথে যোগ করা হবে। এতে সামাজিক নিরাপত্তায় শ্রমিকের অবদানের পরিমাণ বাড়বে।

২. **সার্বজনীন ন্যূনতম মজুরি ও সময়মতো অর্থপ্রদান**

- এই বিধিতে একটি **ফ্লোর ওয়েজ (Floor Wage)** বা ভিত্তি মজুরির কথা বলা হয়েছে (ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্র সরকার এটি নির্ধারণ করবে, যার নিচে কোনো রাজ্য সরকার মজুরি ধার্য করতে পারবে না)। এর পাশাপাশি **সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি** বা স্ট্যাটুটরি মিনিমাম ওয়েজ নিশ্চিত করা হয়েছে যা স্থায়ী, নির্দিষ্ট মেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক এবং গিগ শ্রমিকসহ সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

- এটি মজুরি থেকে যথেচ্ছ কর্তন নিষিদ্ধ করে, সময়মতো মজুরি প্রদান (মূলত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে) নিশ্চিত করে এবং আয়ের সুরক্ষা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করে।

৩. **গ্র্যাচুইটি এবং নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মসংস্থান**

- সংশোধিত গ্র্যাচুইটি বিধান অনুযায়ী, **নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মীরা** এক বছরের নিরবিচ্ছিন্ন কাজ শেষ করলেই গ্র্যাচুইটির যোগ্য হবেন। আগে ১৯৭২ সালের আইন অনুযায়ী এটি ছিল পাঁচ বছর।
- এই পরিবর্তনটি বর্তমানে বৃদ্ধি পাওয়া স্বল্পমেয়াদী বা প্রজেক্ট-ভিত্তিক কাজের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং অস্থায়ী কাজকেও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সুবিধা ও সম্পদ তৈরির একটি মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলে।

৪. **গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি**

- **সামাজিক নিরাপত্তা বিধি** প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে **গিগ (Gig)** এবং **প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের** স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প, বিমা ও কল্যাণ তহবিলের আওতায় এনেছে। আগে এই বিশাল অংশের শ্রমিকরা আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।
- এটি রাজ্য বা নিয়োগকর্তা নির্বিশেষে প্রাপ্ত সুবিধার **বহনযোগ্যতা (Portability)** নিশ্চিত করে, যা পরিযায়ী এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে কর্মস্থল বা চাকরি পরিবর্তন করলেও তাদের সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাগুলি নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

শ্রম সংস্কারের তাৎপর্য: আধুনিক শ্রমিকদের সশক্তিকরণ

শ্রম আইনগুলোকে চারটি সংহিতায় একত্রিত করা কেবল একটি প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার ও আর্থিক মর্যাদার সমন্বয় ঘটানোর একটি কাঠামোগত পদক্ষেপ।

- **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা:** মোট পারিশ্রমিকের মধ্যে মজুরির অংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পিএফ (PF), পেনশন ও গ্র্যাচুইটিতে নিয়োগকর্তার অবদান বাড়বে। ফলে শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় ও অবসরকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
  - এছাড়া, নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্মীদের জন্য এক বছর পরেই **গ্র্যাচুইটি** পাওয়ার সুবিধা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা কমাবে।
- **অসংগঠিত ও গিগ কাজের আনুষ্ঠানিকীকরণ:** গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনায় অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ প্রথাগত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, সুবিধার **বহনযোগ্যতা (Portability)** পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
- **আয় পুনর্বণ্টন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি:** শ্রমিকদের হাতে বেশি অর্থ পৌঁছালে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। শ্রমিকের আয় মূলত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেই সঞ্চালিত হয়, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
- **সরলীকরণ ও স্বচ্ছতা:** ২৯টি আইনকে ৪টি কোডে রূপান্তর করায় আইনি জটিলতা কমবে। **সিঙ্গল রেজিস্ট্রেশন** ও ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আসবে এবং 'ইন্সপেক্টর রাজ'-এর দাপট কমবে।

বহুমুখী প্রভাব: শ্রমিক, নিয়োগকর্তা ও অর্থনীতি

- **শ্রমিকদের ওপর প্রভাব:** উচ্চতর মজুরি কাঠামো ও গ্র্যাচুইটি সুবিধার ফলে বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের আয়ের সুরক্ষা বাড়বে। এটি গিগ শ্রমিকদের শোষণ থেকে রক্ষা করবে এবং একটি মজবুত **সামাজিক সুরক্ষা কবচ** তৈরি করবে।
- **নিয়োগকর্তাদের ওপর প্রভাব:** ৫০% মজুরির নিয়ম এবং বর্ধিত গ্র্যাচুইটির ফলে বড় সংস্থাগুলোর (যেমন: আইটি বা নির্মাণ শিল্প) সংবিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতা ও খরচ কিছুটা বাড়বে। তবে ডিজিটাল ও সহজতর কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা এই বাড়তি খরচের বিপরীতে ব্যবসার পরিবেশকে আরও সহজ ও পূর্বাভাসযোগ্য করে তুলবে।

- **সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব:** শ্রমিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়লে দেশের সঞ্চয়ের ভিত্তি মজবুত হয়। এটি শ্রমবাজারের বিভাজন দূর করে এবং অর্থনৈতিক সংকটের সময় শ্রমিকদের টিকে থাকার ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে **সর্বজনীন** হয়ে ওঠে।

নতুন শ্রমবিধির প্রধান সীমাবদ্ধতা

বিপ্লবী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কিছু কাঠামোগত ও পরিচালনাগত বাধা শ্রমিক সশক্তিকরণের লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে:

১. **বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের বাধা**

- **অসম গ্রহণ:** কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি দিলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রয়োগে সামঞ্জস্য নেই।
- **তদারকির অভাব:** তৃণমূল স্তরে সচেতনতার অভাব এবং 'ইন্সপেক্টর'-এর বদলে 'ইন্সপেক্টর-কাম-ফ্যাসিলিটেটর' নিয়োগের ফলে নিয়ম লঙ্ঘন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

২. **সংজ্ঞার অস্পষ্টতা ও আইনি জটিলতা**

- 'মোট পারিশ্রমিক'-এর স্পষ্ট সংজ্ঞার অভাবে **৫০% মজুরি নিয়ম** কার্যকর করা জটিল হয়ে পড়ছে, যা ভবিষ্যতে আইনি বিবাদ বাড়াতে পারে।

৩. **শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতা**

- ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 'ভারত বনধ'-এর মতো কর্মসূচিগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, ইউনিয়নগুলো এই বিধিকে কর্পোরেট-বান্ধব বলে মনে করছে। ধর্মঘটের ওপর কড়াকড়িকে **যৌথ দরকষাকষির (Collective Bargaining)** অধিকার খর্ব করা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪. **পরিধি ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ**

- **গিগ শ্রমিকদের** অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, অন্তত ৯০ দিন কাজের শর্ত অনেককেই সুবিধার বাইরে রাখছে। এছাড়া ছাঁটাইয়ের **অনুমতির সীমা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩০০ জন** করায় ছোট সংস্থার কর্মীরা আরও বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন।
- **ডিজিটাল বিভাজন:** ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধনের জন্য আধার-সংযুক্ত নথির প্রয়োজন অনেক প্রান্তিক ও পরিযায়ী শ্রমিককে বঞ্চিত করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে

শ্রমবিধিকে সফল করতে নিম্নোক্ত বহুমুখী কৌশল প্রয়োজন:

- **যুক্তরাষ্ট্রীয় সমন্বয়:** যেহেতু 'শ্রম' একটি যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়, তাই প্রতিটি রাজ্য সরকারকে দ্রুত বিধিগুলো কার্যকর করতে হবে যাতে সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য না থাকে।
- **ডিজিটাল পরিকাঠামোর (DPI) ব্যবহার:** ই-শ্রম এবং EPFO পোর্টালকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। শ্রমিকদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়িয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা জরুরি।
- **পুনঃদক্ষতা বৃদ্ধি (Re-skilling):** অটোমেশন ও গিগ অর্থনীতির অস্থিরতা মোকাবিলায় একটি **জাতীয় পুনঃদক্ষতা তহবিল** গঠন করা প্রয়োজন, যাতে কাজ পরিবর্তনের সময় শ্রমিকের আয় বন্ধ না হয়।
- **MSME-দের জন্য সহায়তা:** ক্ষুদ্র শিল্পগুলো যাতে বাড়তি আর্থিক বোঝা সামলাতে পারে, সেজন্য সরকারকে সাময়িক ভর্তুকি বা কর ছাড়ের কথা ভাবতে হবে।
- **ত্রিপক্ষীয় সংলাপ:** সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে আস্থার সংকট দূর করতে হবে।

উপসংহার

ভারতের শ্রমবিধিগুলো কেবল আইনি সংস্কার নয়; বরং এগুলো একবিংশ শতাব্দীর একটি **সামাজিক চুক্তি**। আয় সুরক্ষা এবং শ্রমের মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সংস্কারগুলি ভারতীয় শ্রমিককে নিছক **'পরিবর্তনশীল খরচ'** (Variable Cost) থেকে এক **'মূল্যবান অংশীদার'** (Valued Stakeholder)-এ উন্নীত করেছে। এই কাঠামোর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করবে এর কার্যকর প্রয়োগের ওপর, যাতে ভারতের উন্নয়নের সুফল প্রতিটি প্রান্তিক শ্রমিকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

প্রশ্ন: *ভারতের শ্রমবাজার সংস্কারের প্রেক্ষাপটে চারটি 'শ্রমবিধি'-র (Labour Codes) গুণাগুণ আলোচনা করুন। এই বিষয়ে বর্তমান অগ্রগতি কতদূর? ২৫০ শব্দ*

3.1.10. ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার

প্রেক্ষাপট

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ এবং সম্প্রতি ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত **ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট** (India AI Impact Summit) ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী **"প্রযুক্তি-সার্বভৌম হাব"** (Tech-Sovereign Hub) হিসেবে গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিয়েছে। ভারতের GCC গুলো এখন আর শুধু বিদেশের প্রধান কার্যালয়গুলোকে সাহায্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এখানে এখন বিশ্বের সবচেয়ে জটিল **ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট** (ER&D) এবং **জেনারেটিভ এআই** (GenAI) মডেলগুলো তৈরি হচ্ছে।

ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCC) **সম্পর্কে**

সংজ্ঞা: গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার হলো কোনো বহুজাতিক কোম্পানির (MNC) নিজস্ব মালিকানাধীন একটি শাখা, যা আইটি (IT), ফিন্যান্স, গবেষণা (R&D) এবং বিশ্লেষণের মতো বিশেষ কাজগুলো পরিচালনা করে।

বর্তমান পরিস্থিতি:

- **ব্যাপ্তি:** ভারতে **১,৮০০টিরও বেশি** GCC রয়েছে, যা বিশ্বের মোট সেন্টারের প্রায় **৫০%**।
- **কর্মসংস্থান:** এটি সরাসরি **১৯ লক্ষ পেশাদারকে** কাজ দেয় এবং পরোক্ষভাবে প্রায় **১ কোটি ৪ লক্ষ মানুষের** কর্মসংস্থানে সাহায্য করে।
- **বিশেষজ্ঞতা:** বর্তমানে **৫০০টিরও বেশি** GCC শুধুমাত্র **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (AI) এবং উন্নত বিশ্লেষণের ওপর কাজ করছে।

ভারতের জন্য GCC-এর গুরুত্ব

১. **অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি:**

- **জিডিপি** (GDP) **অবদান:** এটি অর্থনীতিতে **৬৮ বিলিয়ন ডলার** যোগ করে; যা ২০৩০ সালের মধ্যে **১০৫ বিলিয়ন ডলারে** পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- **পরিষেবা রপ্তানি:** ভারতের মোট পরিষেবা রপ্তানির প্রায় **২০%** আসে এখান থেকে, যা দেশের **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট** (CAD) বা চলতি হিসাবের ঘাটতি কমাতে সাহায্য করে।
- **সরাসরি বিনিয়োগ:** এটি এখন আর শুধু মূলধন বিনিয়োগ (FDI) নয়, বরং **"মানবসম্পদ বিনিয়োগে"** পরিণত হয়েছে।

২. **মেধাশক্তির বিকাশ** (Brain-Gain Shift):

- **পূর্ণ মালিকানা:** ভারতীয় GCC গুলো এখন কোনো পণ্যের আইডিয়া থেকে শুরু করে তা তৈরি করা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার মালিকানা গ্রহণ করছে।
- **উদ্ভাবনী কেন্দ্র:** ভারত এখন **জেনারেটিভ এআই**, **সেমিকন্ডাক্টর** এবং **সাইবার সিকিউরিটির** একটি বিশ্বমানের গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে।
- **পেটেন্ট তৈরি:** বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন তাদের বিশ্বব্যাপী পেটেন্টের একটি বড় অংশ ভারতের মাটি থেকে নথিভুক্ত করছে।

৩. **কর্মসংস্থান ও নগরায়ন:**

- **উচ্চমানের চাকরি:** এখানে কর্মরত পেশাদারদের বেতন সাধারণ আইটি খাতের তুলনায় অনেক বেশি।
- **ছোট শহরে বিস্তার:** **"হাব-অ্যান্ড-স্পোক"** মডেলের মাধ্যমে এখন আহমেদাবাদ, ইন্দোর এবং কোচির মতো শহরেও এই কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠছে।
- **কর্মসংস্থান গুণক:** GCC-তে প্রতি ১টি চাকরির বিনিময়ে হসপিটালিটি ও রিয়েল এস্টেট খাতে প্রায় **৩-৪টি পরোক্ষ কর্মসংস্থান** তৈরি হয়।

৪. **কৌশলগত ও কূটনৈতিক প্রভাব:**

- **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব:** বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলোর মূল প্রযুক্তি ভারতে তৈরি হওয়ায় বিশ্বের দেশগুলো ভারতের স্থিতিশীলতার ওপর **নির্ভরশীল** হয়ে পড়ছে।
- **মানদণ্ড নির্ধারণ:** **'ভারতজেন'** (BharatGen) এর মতো এআই মডেলের মাধ্যমে ভারত এখন **দায়িত্বশীল এআই** (Responsible AI) এর বিশ্বমান নির্ধারণ করছে।

ভারতের GCC-এর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **প্রতিভা ও দক্ষতার সংকট:**

- **দক্ষতার অভাব:** প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার থাকলেও **কোয়ান্টাম কম্পিউটিং** বা **ভিএলএসআই** (VLSI) **ডিজাইনের** মতো বিশেষ কাজে পারদর্শী মানুষের অভাব রয়েছে।
- **বেতন বৃদ্ধি:** স্টার্টআপ এবং GCC-গুলোর মধ্যে দক্ষ কর্মী নেওয়ার লড়াই চলায় বেতন অনেক বেড়ে যাচ্ছে, যা খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।
- **কাজের উপযোগিতা:** ভারতের মাত্র **৪৫-৫০%** ইঞ্জিনিয়ার সরাসরি গবেষণার কাজে যোগ দেওয়ার মতো দক্ষ।

২. **আইনি ও নিয়ন্ত্রক বাধা:**

- **ডেটা সুরক্ষা:** **ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা** (DPDP) **আইন** মেনে বিশ্বব্যাপী ডেটা আদান-প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **কর সংক্রান্ত জটিলতা:** 'ট্রান্সফার প্রাইসিং' বা কর নির্ধারণ নিয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে দীর্ঘমেয়াদী আইনি লড়াই চলে।
- **মেধা স্বত্ব** (IP Ownership)**:** ভারতে উদ্ভাবিত পণ্যের মালিকানা কার থাকবে, তা নিয়ে আইনি অস্পষ্টতা বিনিয়োগে বাধা দেয়।

৩. **পরিকাঠামো ও কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি:**

- **বড় শহরের ওপর চাপ:** বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং পুনেতে অতিরিক্ত চাপের ফলে ট্রাফিক জ্যাম এবং অফিস ভাড়ার দাম আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে।
- **ছোট শহরের প্রস্তুতি:** ছোট শহরগুলোতে উচ্চ গতির বিদ্যুৎ এবং আন্তর্জাতিক মানের অফিসের অভাব এখনও রয়ে গেছে।

৪. **ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি:**

- **সুরক্ষাবাদ:** আমেরিকা বা ইউরোপ যদি তাদের কাজ নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি (Onshoring) নেয়, তবে ভারতে বিনিয়োগ কমতে পারে।

- **সাইবার নিরাপত্তা:** এই কেন্দ্রগুলো এখন রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছে, যার জন্য প্রচুর নিরাপত্তা বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সরকারি পদক্ষেপসমূহ

১. **কর ও নিয়ন্ত্রণ সংস্কার (বাজেট ২০২৬-২৭)**

- **২০৪৭ পর্যন্ত কর অবকাশ (Tax Holiday):** এটি একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব। যেসব বিদেশি কোম্পানি ভারতের ডেটা সেন্টার ব্যবহার করে এআই বা ক্লাউড পরিষেবা দেবে, তারা ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর ছাড় পাবে। এটি **"ডেটা রেসিডেন্সি"** বা ভারতেই ডেটা জমা রাখাকে উৎসাহিত করবে।
- **অগ্রিম মূল্য নির্ধারণ চুক্তি (APA):** দ্রুততর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে **৯ বছর** পর্যন্ত করের নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

২. **পরিকাঠামো ও ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব**

- **ইন্ডিয়া এআই মিশন (GPU-on-Tap):** সরকার **৩৮,০০০-এর বেশি জিপিইউ (GPU)** সম্বলিত কম্পিউটিং ক্ষমতা তৈরি করছে। এর ফলে GCC-গুলো আমেরিকার ক্লাউড সার্ভারের ওপর নির্ভর না করে স্থানীয় পরিকাঠামো ব্যবহার করেই **'ভারতজেন' (BharatGen)** এর মতো বড় ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল তৈরি করতে পারবে।
- **সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন (CERs):** পাটনা, কোচি এবং চণ্ডীগড়ের মতো শহরগুলোকে বিশেষায়িত GCC হাব হিসেবে গড়ে তুলতে **৫,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে কোম্পানিগুলো তৈরি অফিস বা 'প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে' সুবিধা পাবে।
- **ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM 2.0):** চিপ ডিজাইন এবং সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম তৈরির কাজে যুক্ত GCC-গুলোকে সহায়তা করতে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য **১,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩. **দক্ষতা ও প্রতিভা বিকাশ**

- **ফিউচারস্কিলস প্রাইম (MeitY ও NASSCOM):** এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা ইতোমধ্যে **১৯ লক্ষের বেশি** পেশাদারকে সাইবার সিকিউরিটি এবং এআই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শংসাপত্র প্রদান করেছে।
- **জেনেসিস (GENESIS):** স্টার্টআপগুলোর জন্য **৪৯০ কোটি টাকার** একটি প্রকল্প, যা ছোট কোম্পানিগুলোকে বড় GCC-গুলোর উদ্ভাবনী অংশীদার বা ভেন্ডর হিসেবে গড়ে তুলবে।
- **YUVAi এবং AI Tinkerpreneur:** ২০২৬ সালের এআই সামিটে এই প্রোগ্রামগুলো চালু করা হয়েছে যাতে স্কুল স্তর থেকেই দক্ষ জনবল তৈরি করা যায়।

৪. **নীতিগত কাঠামো**

- **জাতীয় GCC ফ্রেমওয়ার্ক:** আইটি মন্ত্রণালয় (MeitY) একটি নির্দেশিকা তৈরি করছে যাতে রাজ্যগুলো (যেমন বিহারের ২০২৬ নীতি) নিজস্ব GCC নীতি তৈরি করে মেট্রো শহরের বাইরের বিনিয়োগ টানতে পারে।
- **DPDP বিধিমালা ২০২৫:** ডেটা প্রসেসিং নিয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ভারতে ডেটা নিয়ে কাজ করতে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

১. **মানবসম্পদ রূপান্তর (Human Capital Transformation):**

- **শিক্ষাক্রমের আমূল পরিবর্তন:** শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Industry-Academia) অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একাডেমিক ফোকাসকে "সার্ভিস-ভিত্তিক কোডিং" থেকে সরিয়ে **"প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং"** এবং **"সিস্টেম থিঙ্কিং"**-এর দিকে নিয়ে যেতে হবে।
- **ফিনিশিং স্কুল: ফিউচারস্কিলস প্রাইম (FutureSkills Prime)**-এর পরিধি বাড়িয়ে জেন-এআই (GenAI), কোয়ান্টাম এবং স্পেস-টেক-এর মতো বিশেষ ক্ষেত্রে **"তৎক্ষণাৎ নিয়োগযোগ্য" (Ready-to-Deploy)** বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে।

২. **আঞ্চলিক বৈচিত্র্য (মেট্রো শহরের বাইরে বিস্তার):**

- **১০০-শহর পরিকল্পনা:** GCC-গুলোকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির (Tier-II/III) শহরগুলোতে সরিয়ে নিতে **সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন (CERs)**-এর সুবিধা নিতে হবে। এটি বড় শহরের ভিড় কমাবে এবং পরিচালনা খরচ **২৫-৩০%** হ্রাস করবে।
- **পরিকাঠামোগত সমতা:** কোচি, ইন্দোর এবং জয়পুরের মতো উদীয়মান হাবগুলোতে উচ্চ-গতির ৬জি/স্যাটেলাইট-লিঙ্ক সংযোগ এবং ২৪/৭ সবুজ (পরিবেশবান্ধব) বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **মেধা স্বত্ব (IP) এবং সার্বভৌমত্ব:**

- **"ইন-ইন্ডিয়া ফর গ্লোবাল" আইপি:** ভারতীয় পেটেন্ট অফিসকে আধুনিকীকরণ এবং মেধা স্বত্ব (IP) ভিত্তিক কর ছাড়ের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে (MNCs) ভারতেই পেটেন্ট ফাইল করতে উৎসাহিত করতে হবে।
- **ডেটা-কম্পিউট স্বাধীনতা: ইন্ডিয়া এআই মিশনের (IndiaAI Mission)** জিপিইউ (GPU) ক্লাস্টারগুলো ব্যবহার করে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে GCC-গুলো ভারতের মাটিতেই এআই প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে **"ডেটা উপনিবেশবাদ" (Data Colonization)** প্রতিরোধ করা যায়।

৪. **নিয়ন্ত্রক তৎপরতা:**

- **স্থিতিশীল কর ব্যবস্থা: ১৫.৫% সেফ হারবার (Safe Harbour)** মার্জিন বজায় রেখে এবং **অ্যাডভান্স প্রাইসিং এগ্রিমেন্ট (APAs)** দ্রুত কার্যকর করার মাধ্যমে "কর সন্ত্রাস" (Tax Terrorism) এড়াতে হবে।
- **গ্রিন GCC:** ভবিষ্যৎ প্রণোদনাগুলোকে **ESG (পরিবেশগত, সামাজিক ও শাসন সংক্রান্ত)** লক্ষ্যের সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে GCC-গুলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে এবং ভারতের **২০৭০ সালের নেট-জিরো** লক্ষ্যমাত্রায় অবদান রাখে।

উপসংহার

GCC-গুলোর "খরচ বাঁচানোর কেন্দ্র" থেকে **"বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী ইঞ্জিনে"** রূপান্তর ভারতের **৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি** হওয়ার লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দক্ষতার ঘাটতি পূরণ এবং নিয়ন্ত্রক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভারত বিশ্বের **"ব্যাক অফিস"** থেকে **"উদ্ভাবনের ফ্রন্ট অফিস"**-এ পরিণত হতে পারে, যা **বিকশিত ভারত @ ২০৪৭**-এর স্বপ্ন পূরণ করবে।

প্রশ্ন: *ভারতের **গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (GCCs)** গুলো খরচ কমানোর ইউনিট থেকে কৌশলগত উদ্ভাবনী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পেছনে দায়ী কারণগুলো আলোচনা করুন এবং ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এর প্রভাব পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.1.11. ভারতের ক্রিটিক্যাল মিনারেলস স্ট্র্যাটেজি: নীতিগত পরিবর্তন থেকে কৌশলগত মূলধারা পর্যন্ত

প্রেক্ষাপট

- **২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট** একটি নিষ্পত্তিমূলক আমূল পরিবর্তনের (Paradigm Shift) সাক্ষ্য দেয়: গুরুত্বপূর্ণ খনিজ বা ক্রিটিক্যাল মিনারেলস এখন ভারতের শিল্প ব্যবস্থা, শক্তি রূপান্তর, প্রতিরক্ষা এবং ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের একটি **মূল স্তম্ভ** (Core Pillar) হিসেবে স্থান পেয়েছে।
- মাত্র তিন বছর আগে, ২০২৩ সালে ভারতের **G20 প্রেসিডেন্সি** চলাকালীনও নীতিগত আলোচনায় এই খনিজগুলো ছিল প্রান্তিক পর্যায়ে। তখন লিথিয়ামের মতো খনিজগুলো 'পারমাণবিক খনিজ' (Atomic Minerals) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল, যা বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল।

- এই বছরের বাজেট বক্তৃতার গুরুত্ব ইঙ্গিত দেয় যে ভারত এখন "নীতি থাকা উচিত কি না" সেই পর্যায় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে **"কীভাবে এটি বড় আকারে, দ্রুত এবং নিবিড়ভাবে কার্যকর করা যায়"** সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পদক্ষেপ **আত্মনির্ভর ভারত, বিকশিত ভারত @২০৪৭** এবং **নেট জিরো ২০৭০** লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Minerals) সম্পর্কে ধারণা

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ বলতে এমন কিছু জ্বালানি-বহির্ভূত এবং লৌহ-বিহীন ধাতু ও তাদের যৌগকে বোঝায়, যা **পরিচ্ছন্ন শক্তি রূপান্তর** (Clean Energy Transition), উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং **ডিজিটাল অর্থনীতির** জন্য অপরিহার্য। এই খনিজগুলো বৈদ্যুতিক গাড়ি (EV), ব্যাটারি, সৌর প্যানেল, উইন্ড টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর এবং **রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট**-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মূল ভিত্তি।

- **ভারতের সরকারি তালিকা (৩০টি খনিজ): 'খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) [MMDR] সংশোধনী আইন, ২০২৩'**-এর অধীনে এই তালিকাটি সূচিত হয়েছে। এই আইনটি খনির নিলাম এবং বেসরকারি অংশগ্রহণকে আরও সহজতর করেছে। এই তালিকায় **লিথিয়াম**, কোবাল্ট, নিকেল, গ্রাফাইট, **রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস (REEs) (নিওডিয়ামিয়াম এবং ডিসপ্রোসিয়াম-এর মতো ১৭টি উপাদানের একটি গ্রুপ)**, বেরিলিয়াম, ট্যানটালাম, নিওবিয়াম, টাংস্টেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য খনিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ** (USGS) ২০২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতার **৬০-৯০% চীনের নিয়ন্ত্রণে**। এটি বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে, যা ২০২৫ সালের রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট নিষেধাজ্ঞা এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাটারি সংকটের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে।
- **প্রধান ঝুঁকি:** ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের **নিট-জিরো** (Net-Zero) অঙ্গীকার এবং বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রার মাঝে—খনিজের অত্যধিক **মূল্য অস্থিরতা**, প্রভাবশালী দেশগুলোর সরবরাহ ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার এবং ক্রমবর্ধমান **ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা** বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ আহরণ ভারতের জন্য একটি **কৌশলগত অনিবার্যতা**। এটি **খনিজ নিরাপত্তা** নিশ্চিত করার মাধ্যমে **আত্মনির্ভর ভারত** গড়ার লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করবে।

১. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা:**
   - লিথিয়াম (অস্ট্রেলিয়া/চিলি), নিকেল এবং কোবাল্ট (কঙ্গো/ইন্দোনেশিয়া)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটারি ধাতুর ক্ষেত্রে **১০০% আমদানি নির্ভরতা** হ্রাস পাবে।
   - এটি **উৎপাদন ভিত্তিক প্রণোদনা (PLI)** প্রকল্পগুলোতে গতি আনবে; যার মধ্যে উন্নত রসায়ন সেলের (Advanced Chemistry Cells) জন্য **১৮,১০০ কোটি টাকা** এবং সোলার পিভি মডিউলের জন্য **২৪,০০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রয়েছে।

২. **শক্তি রূপান্তর (Energy Transition):**
   - প্যারিস চুক্তির অধীনে ভারতের **জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC)** অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে **৫০০ গিগাওয়াট জীবাশ্ম-বিহীন জ্বালানি** সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করবে।
   - এটি **প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর** (১ কোটি পরিবারের জন্য ছাদে সোলার) এবং **FAME-III** (২০৩০ সালের মধ্যে যানবাহন বিক্রিতে ৩০% ইভি লক্ষ্যমাত্রা)-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগগুলোকে শক্তি যোগাবে।

৩. **ভূ-রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব:**
   - প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে চীনের **৬০-৯০% একচেটিয়া আধিপত্য** মোকাবিলায় এটি সহায়ক হবে। পাশাপাশি এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য **কোয়াড (QUAD) ক্রিটিক্যাল মিনারেলস ইনিশিয়েটিভ**-কে শক্তিশালী করবে।
   - এটি **আইপিইএফ (IPEF)** সরবরাহ ব্যবস্থা এবং **ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC)**-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে খনিজ সংগ্রহের উৎসগুলোকে বহুমুখী ও নিরাপদ করবে।

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Critical Mineral) নীতির বিবর্তন

ভারতের খনিজ নীতি নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধতা থেকে বর্তমানে একটি সক্রিয় কৌশলের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

- **২০২৩-পূর্ববর্তী সময়:** নীতিগত গুরুত্ব ছিল সীমিত। লিথিয়ামের মতো খনিজগুলো **পারমাণবিক খনিজ পরিদপ্তরের (AMD)** অধীনে কঠোর নিয়ন্ত্রিত ছিল, যা বেসরকারি খাতের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।
- **২০২৩-এর মাইলফলক:** MMDR **সংশোধনী আইন**-এর মাধ্যমে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ চিহ্নিত করা হয় এবং প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের জন্য দ্বার উন্মোচন করা হয়।
- **২০২৪-২৫:** রয়্যালটি হার যুক্তিসঙ্গত করা হয় এবং ক্ষুদ্র খনি সংস্থাগুলোর (Junior Miners) জন্য বিনিয়োগ সহজতর করা হয়।
- **জানুয়ারি ২০২৫:** প্রায় **১৬,৩০০ কোটি টাকা** ব্যয়ে **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)** চালু করা হয়।
- **২০২৬-এর পরিবর্তন:** কেন্দ্রীয় বাজেট এখন কেবল নীতি নির্ধারণ নয়, বরং তা দ্রুত ও বৃহৎ পরিসরে **বাস্তবায়নের (Implementation)** ওপর জোর দিচ্ছে।

ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)

২০২৫ সালে চালু হওয়া এই মিশনটির লক্ষ্য ভারতকে খনিজ সম্পদে স্বনির্ভর করে তোলা।

- **আর্থিক বরাদ্দ:** উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ এবং গবেষণার (R&D) জন্য ১৬,৩০০ কোটি টাকা।
- **মূল লক্ষ্য:** ২০৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে **১,২০০টি অনুসন্ধান প্রকল্প** সম্পন্ন করা এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দুর্গম খনিজগুলোর সন্ধান চালানো।
- **প্রধান ক্ষেত্র:** খনিজ ব্লকের নিলাম, খনিজ সমৃদ্ধকরণ (Beneficiation) এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য (Recycling) প্রযুক্তিতে অর্থায়ন।

খনিজ উত্তোলনের মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠান	পূর্ণরূপ ও ভূমিকা
GSI	**জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া** — জাতীয় মানচিত্রায়ন এবং প্রাথমিক খনিজ অনুসন্ধানের প্রধান সংস্থা।
NMET	**ন্যাশনাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন ট্রাস্ট** — আঞ্চলিক ও বিস্তারিত খনিজ অনুসন্ধানে অর্থায়ন করে।
KABIL	**খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড** — (NALCO, HCL, MECL-এর যৌথ উদ্যোগ) বিদেশে খনিজ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করে।
Mission Anveshan	**ন্যাশনাল জিওসায়েন্স ডেটা রিপোজিটরি (NGDR)**-এর মাধ্যমে খনিজ অনুসন্ধানে AI ও আধুনিক ডেটা ব্যবহার করে।

প্রধান অন্তরায়: ভারত কেন ঝুঁকির মুখে?

ভারত এই খনিজগুলো সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

১. **চরম আমদানি নির্ভরতা:** ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মধ্যে লিথিয়াম, কোবাল্ট এবং নিকেলসহ **১০টি খনিজের ক্ষেত্রে ভারত ১০০% আমদানি নির্ভর**।

২. **চীনের প্রক্রিয়াকরণ একচেটিয়া:** খনি উত্তোলন বড় সমস্যা নয়, আসল সমস্যা প্রক্রিয়াকরণে। চীন বিশ্বব্যাপী **৫৮% লিথিয়াম, ৬৫% কোবাল্ট** এবং **৮৭% রেয়ার আর্থ** প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদা:** ভারতে এখনও **ব্যাটারি বা ইভি (EV)** উৎপাদনের গতি ততোটা বৃদ্ধি পায়নি যা উৎপাদিত খনিজগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। ফলে বিনিয়োগকারীরা বড় প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪. **প্রযুক্তিগত ঘাটতি:** গভীর খনিজ অনুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা** (AI) এবং উন্নত **ভূ-স্থানিক** (Geospatial) টুল ব্যবহারে ভারত এখনও পিছিয়ে।

খনিজ নিরাপত্তার জন্য ভারতের মাস্টার প্ল্যান: সমন্বিত কৌশল ও সমাধান

খনিজ সম্পদ সুরক্ষিত করতে ভারত এখন নিছক নীতি ঘোষণা থেকে সরে এসে ছয়টি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে:

ক. স্মার্ট অনুসন্ধান (The NCMM)

- **কৌশল:** ভারত সরকার ২০২৫ সালে **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন (NCMM)** চালু করেছে। এর অধীনে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে **১,২০০টি লক্ষ্যভিত্তিক অনুসন্ধান প্রকল্প** পরিচালনা করবে।
- **উপকারিতা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং উন্নত ডেটা ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত দ্রুত স্থানীয় খনিজ ভাণ্ডার খুঁজে পাবে, যা সরাসরি আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনবে।

খ. প্রক্রিয়াকরণ ও পরিশোধনে গুরুত্বারোপ

- **কৌশল:** ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট অনুযায়ী, খনিজ উত্তোলনের চেয়ে উচ্চ-মানের প্রক্রিয়াকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ওপর থেকে **আমদানি শুল্ক** প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পের বিদ্যমান সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাটারি এবং প্রতিরক্ষা-গ্রেডের উপাদান তৈরি করা হচ্ছে।
- **উপকারিতা:** এটি সরাসরি চীনের একচেটিয়া আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং ভারতকে দেশীয়ভাবে নিজস্ব ব্যাটারি-গ্রেড উপাদান পরিশোধনে সক্ষম করে তুলবে।

গ. রেয়ার আর্থ ইকোসিস্টেম তৈরি (করিডোর এবং ম্যাগনেট)

- **কৌশল:** ওড়িশা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু—এই উপকূলীয় রাজ্যগুলোতে **'ডেডিকেটেড রেয়ার আর্থ করিডোর'** স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬,০০০ টন **স্থায়ী চুম্বক** (Permanent Magnets) তৈরির জন্য ৭,২৮০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
- **উপকারিতা:** কাঁচা বালি রপ্তানি করার পরিবর্তে এই করিডোরগুলো উত্তোলন থেকে উৎপাদন পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ দেশীয় সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করবে।

ঘ. নিশ্চিত অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি

- **কৌশল:** ইভি (EV), ব্যাটারি স্টোরেজ এবং উইন্ড প্রজেক্টের দেশব্যাপী সম্প্রসারণকে দ্রুততর করতে হবে।
- **উপকারিতা:** এটি প্রক্রিয়াজাত খনিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার তৈরি করবে, যা বিনিয়োগকারীদের খনিজ শোধনাগার তৈরির ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ঙ. বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব স্থাপন

- **কৌশল:** একক কোনো দেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারত সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলোর সাথে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপন করছে:
  - **রাশিয়া:** তেল ও অস্ত্রের বাইরে এখন **লিথিয়াম এবং রেয়ার আর্থ** নিয়ে দুই দেশ কাজ করছে। এছাড়া চেন্নাই-ভ্লাদিভোস্তক করিডোরের মাধ্যমে লজিস্টিক নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে।
  - **ব্রাজিল:** অনুসন্ধান থেকে রিসাইক্লিং—সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইনের জন্য দুই দেশ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।
  - **বৈশ্বিক সম্পদ:** রাষ্ট্রীয় সংস্থা KABIL আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়ায় লিথিয়াম ব্লক সুরক্ষিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে।

চ. খনিজ অনুসন্ধানে 'এআই-ফার্স্ট' (AI-First) পদ্ধতি

আবিষ্কারের গতি বাড়াতে এবং দশকের পর দশক সময় নষ্ট রোধ করতে ভারতকে অবশ্যই খনিজ অনুসন্ধানে **বাধ্যতামূলক এআই-ফার্স্ট কৌশল** গ্রহণ করতে হবে।

- **সমন্বয়:**
  - **ইন্ডিয়া-এআই মিশন:** ডেটা-ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য এআই কম্পিউট এবং মেধা ব্যবহার।
  - **জাতীয় ভূ-স্থানিক নীতি (২০২২):** ভূখণ্ড মানচিত্রায়নের জন্য উচ্চ-মানের স্যাটেলাইট এবং ড্রোন ডেটা ব্যবহার।
  - **মিশন অন্বেষণ:** হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানে ব্যবহৃত এআই-চালিত সিসমিক টুলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ অনুসন্ধানেও ব্যবহার করা হবে।

উপসংহার

ভারত সফলভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোকে তার অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার কৌশলগত কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পেরেছে। তবে কেবল খনি খনন করলেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে না। প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে **বৃহৎ আকারের প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন**, দ্রুত **অভ্যন্তরীণ উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি**, অনুসন্ধানে **এআই প্রযুক্তি গ্রহণ** এবং শক্তিশালী ও **বৈচিত্র্যময় বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব** বজায় রাখার ওপর।

প্রশ্ন: *ক্রিটিক্যাল মিনারেলস বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ হলো একবিংশ শতাব্দীর নতুন তেল। শক্তি রূপান্তর (Energy Transition), শিল্প নীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে ভারতের বিবর্তনীয় ক্রিটিক্যাল মিনারেলস কৌশলটি পরীক্ষা করুন।*

(২৫০ শব্দ)

3.2. পরিবেশ

3.2.1. জলাভূমি—জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য

প্রেক্ষিত

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০২৬ (২ ফেব্রুয়ারি) পালিত হয়েছে যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল: **"জলাভূমি এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান: সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন।"** জলাভূমি হলো মাটি ও জলের মিলনস্থলে অবস্থিত এক বহুমুখী ব্যবস্থা এবং **"প্রকৃতি-ভিত্তিক পরিকাঠামো"**।

ঐতিহ্যগত জলাভূমি ও জল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

- **তামিলনাড়ু: কুলাম** (মানুষের তৈরি জলাধার) যা ধানের জমিতে জল দেওয়ার জন্য একটি ধারাবাহিক সেচ নেটওয়ার্ক তৈরি করে।
- **কেরল (ওয়ায়ানাদ): কেনি** (অগভীর কুয়ো) যা ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পানীয় জল এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
- **অন্ধ্রপ্রদেশ (শ্রীকাকুলাম):** ঐতিহ্যগত **মাছ ধরার** পদ্ধতি যা স্থানীয় মানুষের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে।
- **রাজস্থান (বাওরি / ঝালারা):** কারুকার্যময় **ধাপ-কুয়ো** যা সম্প্রদায়ের জল সঞ্চয় এবং সামাজিক মিলনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **উত্তর-পূর্ব ভারত:**
  - **জাবো পদ্ধতি (নাগাল্যান্ড):** এটি জল সংরক্ষণের সাথে বনপালন, কৃষি এবং পশুপালনকে একত্রিত করে।
  - **বাঁশের ড্রিপ (মেঘালয়):** গোলমরিচ চাষের জন্য পাহাড়ি ঝরনার জল কাজে লাগাতে বাঁশের পাইপ ব্যবহার করা হয়।

ভারতে জলাভূমির বর্তমান অবস্থা

- **রামসার সাইট:** ভারতে **৯৮টি তালিকাভুক্ত রামসার সাইট** রয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং এটি ১.৩ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

- **মোট সংখ্যা:** ইসরো (ISRO)-র মানচিত্র অনুযায়ী ভারতে **৭.৫ লক্ষেরও বেশি জলাভূমি** রয়েছে।
- **ভৌগোলিক বিস্তার:** এগুলি ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় **৪.৬৩%** দখল করে আছে।
- **ক্ষতি:** গত ৩০ বছরে **৪০% প্রাকৃতিক জলাভূমি** হারিয়ে গেছে—যার প্রধান কারণ নগরায়ণ।
- **বাস্তুসংস্থানগত অবক্ষয়:** অবশিষ্ট জলাভূমির **৫০% "পরিবেশগতভাবে অবক্ষয়িত"** হিসেবে বিবেচিত, যার অর্থ এগুলি এখন আর আগের মতো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা জল শোধনের কাজ করতে পারছে না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিদ্যমান আইনি কাঠামো

১. জাতীয় আইনি কাঠামো

- **জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১৭:**
  - **আইনি ভিত্তি:** এটি **পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬**-এর অধীনে ঘোষিত।
  - **বিকেন্দ্রীকরণ:** জলাভূমি চিহ্নিত ও তদারকি করার জন্য **রাজ্য জলাভূমি কর্তৃপক্ষ** (SWA) গঠন করা হয়েছে।
  - **নিষেধাজ্ঞা:** জমি ভরাট করা, কঠিন বর্জ্য ফেলা এবং শোধন না করা নোংরা জল নির্গমন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- **NPCA (ন্যাশনাল প্ল্যান ফর কনজারভেশন অফ অ্যাকুয়াটিক ইকোসিস্টেম):**
  - **একত্রীকরণ:** এটি জাতীয় হ্রদ সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং জাতীয় জলাভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচিকে একত্রিত করেছে।
  - **উদ্দেশ্য:** হ্রদ ও জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- **উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (CRZ) বিজ্ঞপ্তি:**
  - **উপকূল রক্ষা:** এটি বিশেষভাবে উপকূলীয় জলাভূমি যেমন ম্যানগ্রোভ, কাদাভূমি এবং নোনা জলাভূমি রক্ষা করে।
- **জাতীয় বন্যপ্রাণী কর্মপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩১):**
  - **অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা:** পরিযায়ী পাখি এবং জলজ প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল হিসেবে জলাভূমি সংরক্ষণে গুরুত্ব দেয়।
- **মিষ্টি (MISHTI) প্রকল্প:**
  - **লক্ষ্য:** উপকূলরেখা এবং লবনাক্ত জমিতে ম্যানগ্রোভ বনায়ন।
  - **তথ্য:** এটি ৫ বছরে ৯টি রাজ্য এবং ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রায় **৫৪০ বর্গ কিমি** এলাকা কভার করবে।
- **অমৃত ধরোহর (রামসার সাইট কেন্দ্রিক):**
  - **লক্ষ্য:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংরক্ষণের ভারসাম্য বজায় রেখে রামসার সাইটগুলোর **"সঠিক ব্যবহার"** (Wise Use) নিশ্চিত করা।

২. আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো

- **রামসার কনভেনশন (১৯৭১):**
  - **"সঠিক ব্যবহার" নীতি:** বাস্তুসংস্থানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে মানুষের কল্যাণে জলাভূমির টেকসই ব্যবহার।
  - **অঙ্গীকার:** ভারতের **৯৮টি রামসার সাইট** "আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি" হিসেবে স্বীকৃত, যার জন্য কঠোর ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
- **মন্ট্রেক্স রেকর্ড:**
  - **"লাল তালিকা":** এটি সেইসব রামসার সাইটের তালিকা যেখানে দূষণ বা প্রযুক্তিগত কারণে পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে (যেমন: কেউলাদেও জাতীয় উদ্যান, লোকটাক হ্রদ)।
- **CBD (কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি):**
  - জলাভূমিকে জীববৈচিত্র্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
- **সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (SDGs):**
  - **SDG ৬ এবং ১৫:** বিশেষভাবে জল ব্যবস্থাপনা এবং ডাঙা ও জলাভূমির জীবন রক্ষাকে লক্ষ্য করে।

জলাভূমির গুরুত্ব

১. **পরিবেশগত গুরুত্ব**

- **জীববৈচিত্র্য:** পৃথিবীর মাত্র **৬% এলাকা** দখল করলেও এখানে **৪০% প্রজাতির** বাস।
- **পরিযায়ী পাখির পথ:** ভারতের জলাভূমিগুলো (যেমন চিলিকা বা কেউলাদেও) **২৭০টিরও বেশি প্রজাতির** পরিযায়ী পাখির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্রামস্থল।
- **জল শোধন:** এদের **"পৃথিবীর বৃক্ক (Kidney)"** বলা হয়; এক একর জলাভূমি বছরে **৭.৩ মিলিয়ন গ্যালন** জল ফিল্টার করতে পারে।

২. **জলতাত্ত্বিক গুরুত্ব**

- **"স্পঞ্জ" প্রভাব:** এক একর জলাভূমি সাধারণত প্রায় **১০-১৫ লক্ষ গ্যালন** বন্যার জল ধরে রাখতে পারে।
- **ভূগর্ভস্থ জল:** ভারতে গ্রামীণ এলাকার **৮০%** এবং শহুরে এলাকার **৫০%** জলের প্রয়োজন মেটানো ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণে জলাভূমি সাহায্য করে।

৩. **জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস**

- **ব্লু কার্বন:** ম্যানগ্রোভ সাধারণ বনের তুলনায় **২-৪ গুণ বেশি** হারে কার্বন শোষণ করে।
- **প্রাকৃতিক ঢাল:** ১৯৯৯ সালের ওড়িশার সুপার সাইক্লোনের সময় ম্যানগ্রোভ বেষ্টিত গ্রামগুলোতে (যেমন ভিতরকণিকা) প্রাণহানি অনেক কম হয়েছিল।
- **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি:** উপকূলীয় জলাভূমিগুলি বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে বিশ্বব্যাপী বছরে প্রায় **৬৫ বিলিয়ন ডলার** সাশ্রয় করে।

৪. **অর্থনৈতিক এবং জীবিকার গুরুত্ব**

- **বাজার মূল্য:** জলাভূমির বাস্তুসংস্থান পরিষেবার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মূল্য বছরে প্রায় **৪৭.৪ ট্রিলিয়ন ডলার**।
- **অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ:** ভারত অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনে **বিশ্বে দ্বিতীয়**, যা পুরোপুরি সুস্থ জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল।
- **কৃষি:** কেরলের **কুট্টানাদ** সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চাষাবাদ পদ্ধতি দেখায় কীভাবে জলাভূমি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৫. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব**

- **ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল:** বিহারের **আহর-পাইন** ব্যবস্থা এবং লাদাখের **জিং** হলো সামাজিক জল ব্যবস্থাপনার শতবর্ষ প্রাচীন উদাহরণ।
- **শহুরে পরিচয়: পূর্ব কলকাতা জলাভূমি** শহরের বিনামূল্যে নোংরা জল শোধনাগার হিসেবে কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটির কোটি কোটি টাকা বাঁচায় এবং **৩০,০০০-এরও বেশি মানুষের** জীবিকা নির্বাহ করে।

৬. **শহুরে গুরুত্ব**

- **তাপমাত্রা হ্রাস:** শহরের জলাশয়গুলো স্থানীয় তাপমাত্রা **২°C থেকে ৪°C** পর্যন্ত কমাতে পারে।
- **অর্থনৈতিক সাশ্রয়:** একটি প্রাকৃতিক জলাভূমিকে ড্রেনেজ পাইপ দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ **৩-৫ গুণ বেড়ে যায়**।

জলাভূমির প্রধান চ্যালেঞ্জগুলি

১. **কাঠামোগত এবং মানবসৃষ্ট হুমকি**

- **জলপ্রবাহে বাধা:** বাঁধ, বালি উত্তোলন এবং পাড় তৈরির ফলে জলের স্বাভাবিক গতিপথ নষ্ট হয়ে প্রবহমান জলাভূমিগুলো বদ্ধ ডোবায় পরিণত হচ্ছে।
- **অববাহিকা ক্ষয়:** চারপাশের এলাকার অবক্ষয়ের ফলে প্রচুর পলি জমে এবং জলাভূমিতে জল আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

২. **দূষণ এবং বাস্তুসংস্থানগত অবক্ষয়**

- **ইউট্রোফিকেশন সংকট:** কৃষি জমি থেকে আসা সার এবং নর্দমার জল জলাভূমিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটায় এবং শ্যাওলার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় (Algal Bloom)।
- **আবর্জনার স্তূপ:** শহরের জলাভূমিগুলোকে আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৩. **জলবায়ু এবং উপকূলীয় পরিবর্তন**

- **"ডাবল বাইন্ড" বা দ্বিমুখী চাপ (উপকূলীয় অঞ্চল):** ম্যানগ্রোভ এবং উপহ্রদগুলি একদিকে **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি** এবং অন্যদিকে স্থলভাগে **পরিকাঠামো উন্নয়নের** চাপে পিষ্ট হচ্ছে।
- **চরম আবহাওয়া:** তীব্র সাইক্লোন এবং উপকূলীয় ক্ষয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছে।

৪. **শাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অভাব**

- **সমন্বয়ের অভাব:** ভূমি, জল এবং বন বিভাগ আলাদাভাবে কাজ করায় সামগ্রিক নদী অববাহিকাভিত্তিক কাজ সম্ভব হচ্ছে না।
- **দক্ষতার অভাব:** রাজ্য কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে জলতত্ত্ব বা রিমোট সেন্সিং-এর মতো আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

৫. **সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়**

- **তত্ত্বাবধানের অভাব:** আধুনিক ব্যবস্থাপনায় ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে (যেমন কুলাম বা আহর-পাইন) অবহেলা করায় স্থানীয় মানুষের জীবিকা ও সংরক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

আগামীর পথ

১. **সীমানা সুরক্ষা:** স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং এবং ড্রোন ব্যবহার করে সঠিক সীমানা নির্ধারণ করা যাতে অবৈধ দখল বন্ধ হয়।

২. **সমন্বিত শাসন:** নগর পরিকল্পনা, সেচ এবং পরিবেশ দপ্তরের মধ্যে একটি অভিন্ন কর্মপদ্ধতি তৈরি করা।

৩. **প্রকৃতি-ভিত্তিক পরিকাঠামো (NbS):** জলাভূমিকে **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR)** কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। ম্যানগ্রোভ এবং প্লাবনভূমিকে বাঁধের মতোই গুরুত্বপূর্ণ "সবুজ/নীল পরিকাঠামো" হিসেবে গণ্য করা।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি:** বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার, জিআইএস (GIS) এবং পরিবেশ আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. **ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে মূলধারায় আনা: "সহভাগিতা" (Sahbhagita)** মডেলের মাধ্যমে স্থানীয় **"জলাভূমি মিত্র"** নিয়োগ করে জনগনকে সংরক্ষণে যুক্ত করা।

জলাভূমি সংক্রান্ত কেস স্টাডি

১. **পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (পশ্চিমবঙ্গ) - "লিভিং ল্যাবরেটরি":** এটি শহরের নোংরা জল ব্যবহার করে মাছ চাষ করে। এটি **বিশ্বের বৃহত্তম বর্জ্য-জল নির্ভর মৎস্য চাষ ব্যবস্থা।**

২. **লোকটাক হ্রদ (মণিপুর) - "ফুমডি ব্যবস্থাপনা":** ভাসমান দ্বীপগুলো (ফুমডি) রক্ষা করতে ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ব্যবহার।

৩. **পাল্লিকারনাই মার্শ (তামিলনাড়ু):** একটি বিশাল আবর্জনার স্তূপ থেকে জলাভূমিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা, যা শহরের জন্য জলাভূমির গুরুত্ব তুলে ধরে।

ঐতিহাসিক কিছু বিচারবিভাগীয় রায়

১. **এম.কে. বালকৃষ্ণন বনাম ভারত সরকার (২০১৭):** সুপ্রিম কোর্ট ২ লক্ষেরও বেশি জলাভূমির **জিও-ম্যাপিং** করার নির্দেশ দিয়েছে।

২. **এইচ.এন. মেহাল বনাম ভারত সরকার (২০২০):** আদালত **"পাবলিক ট্রাস্ট ডকট্রিন"** উল্লেখ করে বলেছে যে রাষ্ট্র জলাশয়গুলোর রক্ষক মাত্র, এগুলিকে ব্যক্তিগত বা রিয়েল এস্টেটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

উপসংহার

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে জলাভূমিকে "পরিত্যক্ত জমি" ভাবার পরিবর্তে অপরিহার্য **"প্রাকৃতিক মূলধন"** হিসেবে দেখা শুরু করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত রিমোট সেন্সিং-এর সাথে প্রাচীন জল-ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আমরা জল

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি। জলাভূমিগুলোকে **"জলবায়ু-স্মার্ট বায়ো-শিল্ড"** হিসেবে গড়ে তুললে তা ভারতের জীববৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ রক্ষা করবে।

প্রশ্ন: *ভারতের জলাভূমিগুলোর প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ গুলি আলোচনা করুন এবং সেগুলির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পরিস্থিতি-ভিত্তিক ব্যবস্থার পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

3.2.2. র‍্যাট-হোল মাইনিং-এর স্থায়িত্ব: আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি মেঘালয়ের একটি **অবৈধ র‍্যাট-হোল খনিতে** ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি খনি খননের এই গোপন কর্মকাণ্ড রুখতে **প্রশাসনিক ও পদ্ধতিগত ব্যর্থতার** একটি কঠোর সংকেত। গত এক দশক ধরে বিচারবিভাগীয় নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, এই **"মৃত্যু ফাঁদ"**-গুলোর টিকে থাকা আসলে আদিবাসীদের **জমির অধিকার, অর্থনৈতিক অসহায়তা** এবং **নিয়ন্ত্রণমূলক স্থবিরতার** এক জটিল সংমিশ্রণ।

র‍্যাট-হোল মাইনিং সম্পর্কে

- **মূল ধারণা (Concept):** র‍্যাট-হোল মাইনিং হলো একটি **আদিম, বিপজ্জনক** এবং **শ্রমনির্ভর** কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি। এতে মাটির নিচে অত্যন্ত সরু সুড়ঙ্গ খনন করা হয়—যা সাধারণত ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু এবং ২ থেকে ৩ ফুট চওড়া হয়—যা দেখতে অনেকটা **ইঁদুরের গর্তের** মতো।
    - এই সংকীর্ণ আয়তনের কারণে শ্রমিকদের (যাদের মধ্যে অনেক সময় **শিশুরাও** থাকে) কয়লা তোলার জন্য সুড়ঙ্গের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয় এবং সাধারণ হাত-সরঞ্জাম ব্যবহার করে কয়লা বের করে আনতে হয়।
    - **কোথায় প্রচলিত:** এই পদ্ধতিটি মূলত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে **মেঘালয়** এবং **অসম** রাজ্যে দেখা যায়, যেখানে কয়লার স্তরগুলো খুব পাতলা এবং মাটির নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।
- **কয়লা উত্তোলনের কৌশল :** খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়:
    - **সাইড-কাটিং পদ্ধতি:** এটি মূলত পাহাড়ি এলাকায় ব্যবহৃত হয়। শ্রমিকরা পাহাড়ের ঢাল বরাবর সরাসরি **অনুভূমিক** সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কয়লার পাতলা স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এই কয়লার স্তরগুলো সাধারণত ২ মিটারের কম পুরু হয়।
    - **বক্স-কাটিং পদ্ধতি:** এই পদ্ধতিতে প্রথমে **১০ থেকে ১০০ বর্গমিটার** এলাকা জুড়ে একটি বিশাল আয়তাকার গর্ত খুঁড়ে **১০০ থেকে ৪০০ ফুট** গভীর পর্যন্ত যাওয়া হয়। একবার কয়লার স্তরটি উন্মুক্ত হয়ে গেলে, সেই গভীর গর্তের দেওয়াল থেকে চারদিকে ইঁদুরের গর্তের মতো ছোট ছোট **অনুভূমিক সুড়ঙ্গ** তৈরি করে কয়লা উত্তোলন করা হয়।

র‍্যাট-হোল মাইনিং পদ্ধতি অব্যাহত থাকার মূল কারণসমূহ

- **দারিদ্র্য এবং জীবিকার অনিশ্চয়তা:** কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার তাগিদে এই বিপজ্জনক খনি খনন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করে।
    - মারাত্মক স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, কয়লা বিক্রি থেকে **দ্রুত এবং নিশ্চিত নগদ আয়ের** আশায় দুর্বল ও দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে এই কাজ অর্থনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।
- **জমির মালিকানা এবং তদারকির অভাব:** জমির মালিকানার অস্পষ্টতা এবং দুর্বল আইন প্রয়োগ ব্যবস্থার কারণে এই অবৈধ খনি খনন পদ্ধতি ফুলে-ফেঁপে উঠছে।
    - প্রশাসনের এই ফাঁকফোকরগুলোকে কাজে লাগিয়ে কোনো প্রকার দায়বদ্ধতা ছাড়াই এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

- কিছু ক্ষেত্রে, **রাজনৈতিক স্বার্থ** এবং কয়লা খনির মালিকানার মধ্যে যোগসাজশ থাকার কারণে 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল' (NGT)-এর নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

- **কয়লার ক্রমাগত চাহিদা:** আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক—উভয় বাজারেই কয়লার ব্যাপক চাহিদা থাকায় এই অবৈধ ব্যবসাটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক থাকে।
  - মধ্যস্বত্বভোগী এবং অবৈধ ব্যবসায়ীদের সক্রিয় উপস্থিতি এই গোপন সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, যা অবৈধভাবে তোলা কয়লার একটি **স্থায়ী বাজার** নিশ্চিত করে।
- **ভৌগোলিক উপযোগিতা এবং কম খরচ:** উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়লার স্তরগুলো সাধারণত খুব পাতলা (২ মিটারের কম) হয়। ফলে ক্ষুদ্র মালিকদের পক্ষে বড় আকারের যান্ত্রিক খনি চালানো লাভজনক হয় না। অন্যদিকে, এই আদিম ও শ্রমনির্ভর পদ্ধতিতে **সামান্য পুঁজিতেই** কাজ শুরু করা যায়, যা স্থানীয় ঠিকাদারদের জন্য এই ব্যবসায় নামা সহজ করে তোলে।

র‍্যাট-হোল মাইনিং-এর সাথে জড়িত গুরুতর চ্যালেঞ্জসমূহ

অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন মানব নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সামাজিক নৈতিকতার ক্ষেত্রে এক বহুমুখী সংকট তৈরি করে।

১. **পেশাগত নিরাপত্তার চরম ঝুঁকি:** কোনো প্রকার মজবুত কাঠামো বা সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায়, এই সরু সুড়ঙ্গগুলো ধসে পড়ার বা আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে। এতে খনির গভীরে শ্রমিকদের আটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের অভাব (Poor ventilation) অনেক সময় **দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু** এবং খনির ভেতরে বিস্ফোরক গ্যাস জমার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উদাহরণ: ২০১৮ সালের ক্ষান (Ksan) বন্যা (১৭ জনের মৃত্যু) এবং ২০২৪ সালের ওখা (Wokha) বিস্ফোরণ (৬ জনের মৃত্যু) এই ঝুঁকির ভয়াবহ প্রমাণ।

২. **পরিবেশগত অবক্ষয় এবং বিষক্রিয়া:** এই খনিগুলোর কারণে ব্যাপক হারে **বন উজাড়** এবং মাটি ক্ষয় হচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব হলো **অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ (AMD)**; যেখানে সালফারযুক্ত বর্জ্য জল মিশে জলাশয়গুলোকে দূষিত করে। এর ফলে মেঘালয়ের লুখা (Lukha) নদীর মতো নদীগুলো আম্লিক বা অ্যাসিডিক হয়ে পড়ছে এবং জলজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে।

   প্রভাব: নাগাল্যান্ডের ওখা এবং মন জেলার উর্বর কৃষিজমিগুলো মারাত্মক দূষণ ও উর্বরতা হ্রাসের শিকার হয়েছে।

৩. **পদ্ধতিগত সামাজিক শোষণ:** এই শিল্পে শিশুদের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ তাদের ছোট আকার সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে চলাচলের জন্য সুবিধাজনক। 'ইমপালস' (Impulse) নামক এনজিও-র রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় **৭০,০০০ শিশু** (যাদের বড় অংশ বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে আসা) এই কাজে নিয়োজিত। এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ এবং বিপজ্জনক কর্মপরিবেশের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে।

র‍্যাট-হোল মাইনিং নিয়ন্ত্রণের আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো

ভারতে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি আদালতের নিষেধাজ্ঞা, কেন্দ্রীয় আইন এবং উত্তর-পূর্বের বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষার এক জটিল মিশ্রণ।

১. ভারতে নিয়ন্ত্রণের বর্তমান অবস্থা

- **আইনি অবস্থান:** এটি একটি **অবৈধ কার্যক্রম**। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের, যারা একে একটি বড় 'আইন-শৃঙ্খলা চ্যালেঞ্জ' হিসেবে দেখে।
- **NGT নিষেধাজ্ঞা (২০১৪):** অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং শ্রমিকদের উচ্চ মৃত্যুর হারের কারণে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল এর ওপর **সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা** আরোপ করে।
- **সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১৯):** এনজিটি-র নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখে আদালত জানায়, MMDR Act, 1957 অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া এই খনি চালানো নিষিদ্ধ।

- **বি.পি. কাটাকি কমিটি (২০২২):** মেঘালয় হাইকোর্ট দ্বারা গঠিত এই কমিটি জানায়, বিশেষ করে **পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড়ে** ব্যাপক অবৈধ খনন চলছে। আদালত একে প্রশাসনের "চরম উদাসীনতা ও জবাবদিহিতার অভাব" বলে উল্লেখ করেন।

২. **রাজ্য-ভিত্তিক ও সাংবিধানিক বিশেষ বিধান**

- **নাগাল্যান্ড কয়লা নীতি (২০০৬):** ব্যক্তিগত মালিকদের SPDL (স্মল পকেট ডিপোজিট লাইসেন্স) প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র খনিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা।
- **MEPRF তহবিল:** কয়লার ওপর **১০% রয়্যালটি** নিয়ে গঠিত এই তহবিল খনি-ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিবেশ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত হয়।
- **অনুচ্ছেদ ৩৭১-এ (নাগাল্যান্ড):** জমি ও সম্পদের ওপর রাজ্যের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রীয় খনি আইন প্রয়োগে আইনি জটিলতা তৈরি করে।
- **ষষ্ঠ তফসিল (মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অসম):** স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (ADC)-এর হাতে জমির মালিকানা থাকায় কেন্দ্রীয় তদারকি বাধাগ্রস্ত হয়। MMDR Act এবং ADC আইনের বিরোধের সুযোগ নেয় অবৈধ ব্যবসায়ীরা।

৩. **আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট**

- **বৈশ্বিক মানদণ্ড:** সরাসরি কোনো আইন না থাকলেও আন্তর্জাতিক প্রোটোকলগুলো **টেকসই খনন** ও শ্রমিক নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়।
- **পরোক্ষ প্রভাব:** আন্তর্জাতিক শ্রম ও পরিবেশগত মানদণ্ডের চাপে দেশগুলো আদিম পদ্ধতি ছেড়ে **বৈজ্ঞানিক উত্তোলনের** দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হচ্ছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: অবৈধ র‍্যাট-হোল মাইনিং নির্মূল করার কৌশলগত রোডম্যাপ

অবৈধ র‍্যাট-হোল মাইনিং-এর এই সংকট নিরসনের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যেখানে কঠোর আইন প্রয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং **'গ্রিন স্টিল'** (Green Steel) অর্থনীতির দিকে উত্তরণের সমন্বয় থাকবে।

১. **প্রযুক্তিগত নজরদারি:** দুর্গম অঞ্চলে অবৈধ খনন রুখতে **স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং** ও **ড্রোন** ব্যবহার করা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করা।

২. **গ্রিন স্টিল উৎপাদন:** কোকিং কয়লার বিকল্প হিসেবে **গ্রিন হাইড্রোজেন-ভিত্তিক** প্রযুক্তি (DRI) ব্যবহারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা, যাতে কয়লার চাহিদা হ্রাস পায় এবং অবৈধ মাইনিং-এর প্রয়োজনীয়তা কমে।

৩. **সরবরাহ শৃঙ্খল তদারকি:** কয়লাবাহী যানবাহনে **জিপিএস** (GPS) ও ডিজিটাল ট্রানজিট পাস বাধ্যতামূলক করা এবং শিল্পাঞ্চলে সিসিটিভি চেকপোস্টের মাধ্যমে কয়লার উৎস যাচাই করা।

৪. **বিকল্প জীবিকা সংস্থান:** খনি-নির্ভরতা কমাতে স্থানীয়দের জন্য **উদ্যানপালন**, **পরিবেশ-পর্যটন** ও ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণের সুবিধা এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরি করা।

৫. **সামাজিক ক্ষমতায়ন:** গ্রাম পরিষদ ও জেলা পরিষদকে নজরদারিতে সম্পৃক্ত করা এবং সংগৃহীত জরিমানার একটি অংশ তাদের প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় মালিকানা বৃদ্ধি করা।

৬. **শ্রমিক পুনর্বাসন:** খনি শ্রমিকদের ডাটাবেস তৈরি করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং পরিত্যক্ত খনির **বাস্তুসংস্থান পুনরুদ্ধার** বা পরিবেশবান্ধব শক্তি প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া।

৭. **বৈজ্ঞানিক খনন পদ্ধতি:** অবৈধ পদ্ধতির পরিবর্তে কেবল **পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন** (EIA) এবং **অ্যাসিড মাইন ড্রেনেজ** (AMD) শোধন ব্যবতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক খনি খননকেই অনুমোদন দেওয়া।

উপসংহার

মেঘালয়ে খনি দুর্ঘটনার "ভয়াবহ পুনরাবৃত্তি" প্রমাণ করে যে, কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাই যথেষ্ট নয়, এটি একটি হাতিয়ার মাত্র, সমাধান নয়। প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন একটি দ্বিমুখী পদ্ধতি: একদিকে কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে **কঠোর প্রশাসনিক**

ব্যবস্থা, এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের জন্য **সহমর্মিতামূলক পুনর্বাসন**। মেঘালয়ের খনিজ অর্থনীতিকে ভারতের **'গ্রিন স্টিল'** লক্ষ্যমাত্রার সাথে যুক্ত করা কেবল পরিবেশগত প্রয়োজনই নয়, বরং একটি নৈতিক দায়িত্বও বটে; যাতে অন্ধকার, সরু গর্তে মানুষের জীবনের বিনিময়ে তথাকথিত "উন্নয়ন" না আসে।

প্রশ্ন: *আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মেঘালয়ে র‍্যাট-হোল মাইনিং অব্যাহত রয়েছে, যা বারবার মানবসম্পদ ও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। এই অবৈধ পদ্ধতিটি টিকে থাকার কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন এবং এটি নির্মূল করার উপায়গুলো পরামর্শ দিন।*

(২৫০ শব্দ)

3.2.3. গ্রেট নিকোবর প্রকল্প: উন্নয়ন বনাম পরিবেশ

প্রেক্ষাপট: সম্প্রতি **ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল** (NGT)-এর একটি বিশেষ বেঞ্চ **গ্রেট নিকোবর প্রকল্পকে** সবুজ সংকেত দিয়েছে। পরিবেশগত এবং আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল প্রকল্পটির **"কৌশলগত গুরুত্বকে"** (Strategic Importance) প্রাধান্য দিয়েছে।

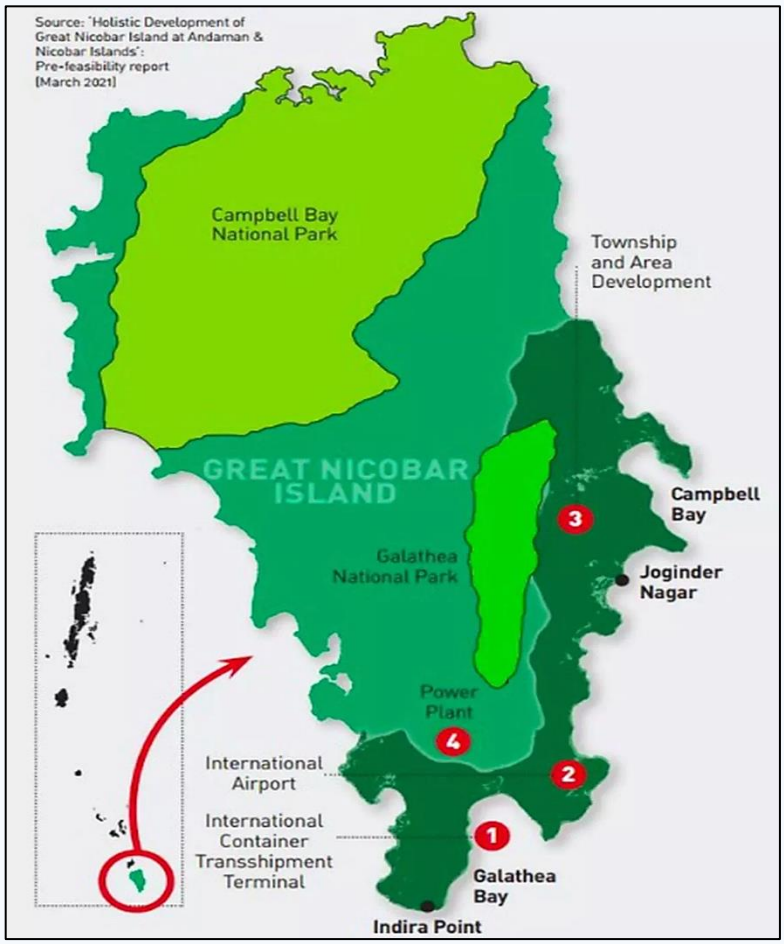

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের উৎস:

- **পরিকল্পনা:** ২০২১ সালে **নীতি আয়োগ** (NITI Aayog) কর্তৃক পরিকল্পিত।
- **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমন্বিত উন্নয়ন নিগম (ANIIDCO)।
- **আকার:** প্রায় ১৬৬ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত (দ্বীপের মোট ৯১০ বর্গ কিমি এলাকার প্রায় ১৮%)।

প্রকল্পের প্রধান উপাদানসমূহ:

একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেম তৈরির জন্য প্রকল্পটি চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি:

I. **আন্তর্জাতিক কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (ICTT):**

- **অবস্থান:** দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত **গালাথিয়া বে** (Galathea Bay)-তে এটি কৌশলগতভাবে স্থাপন করা হচ্ছে।
- **ক্ষমতা:** পূর্ণ ক্ষমতায় বছরে **১৬ মিলিয়ন** TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডেল করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে প্রথম ধাপ (৪ মিলিয়ন TEU) শেষ হওয়ার কথা।
- **সুবিধা:** এখানে জলের স্বাভাবিক গভীরতা **২০ মিটারের বেশি**, যা ড্রেজিং ছাড়াই বিশাল আকৃতির কন্টেইনার জাহাজ ভেড়াতে সাহায্য করবে।

II. **গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:**

- **দ্বিমুখী ব্যবহার:** এটি বেসামরিক পর্যটন এবং প্রতিরক্ষা/সামরিক **লজিস্টিকস**—উভয় কাজেই ব্যবহৃত হবে।
- **ক্ষমতা:** প্রতি ঘণ্টায় **৪,০০০ যাত্রী** সামলানোর ক্ষমতা সম্পন্ন। এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুত মোতায়েনের জন্য **আন্দামান ও নিকোবর কমান্ড** (ANC)-কে শক্তিশালী করবে।

III. **গ্যাস এবং সৌর-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র:**

- **ক্ষমতা:** একটি **৪৫০-এমভিএ** (MVA) হাইব্রিড বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- **কাজ:** টার্মিনাল, বিমানবন্দর এবং নতুন শহরে নিরবচ্ছিন্ন শক্তি সরবরাহ করা। এতে ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং সৌর শক্তির মিশ্রণ ব্যবহার করা হবে।

IV. **গ্রিনফিল্ড স্মার্ট সিটি / জনপদ** (Township):

- **ভিশন:** ১৬০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে একটি আধুনিক শহর তৈরি করা যেখানে **৩.৫ লাখ বাসিন্দা** থাকতে পারবেন (বর্তমানে লোকসংখ্যা মাত্র ৮,০০০)।
- **অবকাঠামো:** এর মধ্যে আবাসিক এলাকা, বিলাসবহুল পর্যটন রিসোর্ট, **ক্রুজ শিপ টার্মিনাল** এবং শিল্প কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের গুরুত্ব:

গ্রেট নিকোবরকে বঙ্গোপসাগরে ভারতের **"অডুবে বিমানবাহী রণতরী"** (Unsinkable Aircraft Carrier) বলা হয়।

১. **ভূ-কৌশলগত এবং নিরাপত্তা:**

- **সামুদ্রিক চোকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ:** এটি **মালাক্কা প্রণালী** থেকে মাত্র ৯০ নটিক্যাল মাইল দূরে অবস্থিত। বিশ্বের প্রায় **৪০% বাণিজ্যের** ওপর নজরদারি করার সুযোগ করে দেবে এই অবস্থান।
- **চীনকে মোকাবিলা:** চীনের **"স্ট্রিং অফ পার্লস"** (যেমন গোয়াদর, হাম্বানটোটা বন্দর) এবং কোকো দ্বীপে তাদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে এটি একটি শক্তিশালী কৌশলগত দুর্গ হিসেবে কাজ করবে।
- **ত্রি-পরিষেবা কমান্ড (ANC):** ভারতের একমাত্র সমন্বিত ত্রি-পরিষেবা কমান্ডের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে আকাশ ও নৌ বাহিনীর দ্রুত মোতায়েন নিশ্চিত করবে।

২. **অর্থনৈতিক এবং "ব্লু ইকোনমি":**

- **ট্রান্সশিপমেন্ট সার্বভৌমত্ব:** বর্তমানে ভারতের প্রায় **৭৫% কন্টেইনার** কলম্বো বা সিঙ্গাপুরে খালাস হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় **২০০–২২০ মিলিয়ন ডলার** বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।
- **প্রাকৃতিক সুবিধা:** গালাথিয়া বে-র গভীরতা বিশালাকৃতির জাহাজ নোঙরের জন্য আদর্শ।
- **ব্লু ইকোনমি বৃদ্ধি:** এটি **মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০**-এর সাথে সংগতিপূর্ণ এবং জাহাজ মেরামত ও জ্বালানি সরবরাহের মতো শিল্প গড়ে তুলবে।
- **পর্যটনের সম্ভাবনা:** মালদ্বীপ বা মরিশাসের মতো বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দ্বীপটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

৩. **কূটনৈতিক এবং আঞ্চলিক নেতৃত্ব:**

- **"অ্যাক্ট ইস্ট" নীতি:** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ASEAN দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত সেতু হিসেবে কাজ করবে।
- **নিরাপত্তা প্রদানকারী:** বঙ্গোপসাগরে বিপর্যয় মোকাবিলা (HADR) এবং জলদস্যু বিরোধী অভিযানে ভারতের সামর্থ্য বাড়বে।

৪. **আর্থ-সামাজিক প্রভাব:**

- **কর্মসংস্থান:** প্রায় **১ লাখ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান** তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।
- **অবকাঠামোগত উন্নয়ন:** আধুনিক বিমানবন্দর এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতের এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

প্রধান উদ্বেগসমূহ:

১. **পরিবেশগত ঝুঁকি:**

- **ব্যাপক বন উজাড়:** প্রায় **১৩০ বর্গ কিমি** গ্রীষ্মমন্ডলীয় রেইনফরেস্ট ধ্বংস করা হবে। সরকারি হিসাবে **৯.৬৪ লাখ গাছ** কাটা হবে, যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই সংখ্যা **৩০ লাখ** ছাড়াতে পারে।

বিপন্ন প্রজাতি:

- **জায়ান্ট লেদারব্যাক টার্টল:** গালাথিয়া বে এদের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র; যা এখন হুমকির মুখে।
- **নিকোবর মেগাপোড:** এটি একটি বিশেষ ধরনের পাখি যা শুধুমাত্র এই এলাকাতেই পাওয়া যায়।
- **প্রবাল প্রাচীর ও ম্যানগ্রোভ:** ড্রেজিংয়ের ফলে পলি জমে প্রায় **২০,০০০ প্রবাল কলোনি** ধ্বংস হতে পারে। ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হলে সুনামি প্রতিরোধ ক্ষমতা কমবে।

২. **আদিবাসী অধিকার ও সামাজিক উদ্বেগ:**

- PVTGs-এর প্রতি হুমকি: এটি **শম্পেন** (একটি অতি বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী) এবং **নিকোবরী** সম্প্রদায়ের আদি নিবাস।
- **আইন লঙ্ঘন:** অভিযোগ উঠেছে যে আদিবাসী পরিষদের **"অবাধ ও পূর্ব সম্মতি"** (FPIC) যথাযথভাবে নেওয়া হয়নি।
- **সাংস্কৃতিক বিলুপ্তি:** জনসংখ্যা হঠাৎ ৮,০০০ থেকে ৩.৫ লাখে পৌঁছালে আদিবাসীরা বাইরের রোগের সম্মুখীন হতে পারে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে পারে।

৩. **ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকি:**

- **সিসমিক জোন V:** এলাকাটি অত্যন্ত উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। ২০০৪ সালের সুনামির সময় এই দ্বীপটি স্থায়ীভাবে **১৫ ফুট নিচে তলিয়ে গিয়েছিল**।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি:**

- **অস্পষ্ট ছাড়পত্র:** "জাতীয় নিরাপত্তা"-র দোহাই দিয়ে অনেক পরিবেশগত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।
- **ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন:** পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) মাত্র এক ঋতুর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে বলে সমালোচনা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পথ

- **কার্যকর প্রবাল স্থানান্তর (Effective Coral Translocation):** প্রবালগুলোকে কেবল নামমাত্র এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থানান্তর না করে, প্রবাল পুনরুৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক সেরা পদ্ধতিগুলো (যেমন **Biorock প্রযুক্তি**) গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া ২০,০০০-এরও বেশি প্রবাল কলোনির বেঁচে থাকার হার যাচাই করতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে অডিট বা নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হবে।
- **প্রকৃতি-ভিত্তিক উপকূলীয় প্রতিরক্ষা (Nature-Based Coastal Defense):** তথাকথিত কংক্রিটের বাঁধের পাশাপাশি **"গ্রিন-গ্রে" (Green-Gray)** অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিতে হবে। এর অর্থ হলো সমুদ্রের ঢেউ ও সুনামির ঝুঁকি কমাতে এবং ভূমি ক্ষয় রোধ করতে সমুদ্রের দেওয়ালের সাথে সাথে ম্যানগ্রোভ বন পুনরুদ্ধার এবং কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর ব্যবহার করা।
- **স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Health Safeguards):** দ্বীপের জনসংখ্যা বাড়লেও আদিবাসী **শম্পেন (Shompen)** উপজাতিদের "সীমিত যোগাযোগ" বা বিচ্ছিন্ন থাকার মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। বাইরের রোগ যাতে তাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়, সেজন্য একটি কঠোর **"বায়োসিকিউরিটি প্রোটোকল"** তৈরি করতে হবে।
- **স্বাধীন তদারকি কর্তৃপক্ষ (Independent Oversight Authority):** পরিবেশগত ছাড়পত্রের (EC) শর্তগুলো ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য একটি বহুমুখী অংশীজন বডি বা কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে পরিবেশবিদ, আদিবাসী প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশ (Public Disclosure):** ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের (NGT) সাম্প্রতিক আলোচনা অনুযায়ী, জনমনে বিশ্বাস তৈরির জন্য সরকারের উচিত **উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির (HPC)** রিপোর্টের অ-সংবেদনশীল অংশগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।
- **জলবায়ু-সহনশীল ইঞ্জিনিয়ারিং (Climate-Resilient Engineering):** গ্রেট নিকোবর অত্যন্ত উচ্চ ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা (সিসমিক জোন V) হওয়ার কারণে, সমস্ত অবকাঠামো অবশ্যই সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক মানের (Eurocode 8 বা সমতুল্য) ভূমিকম্প-প্রতিরোধী নিয়ম মেনে তৈরি করতে হবে। এছাড়া নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক **"সিসমিক অডিট"** বা ভূমিকম্প সংক্রান্ত পরীক্ষা করতে হবে।

উপসংহার:

কৌশলগত গভীরতার সাথে পরিবেশগত পবিত্রতার সমন্বয় ঘটিয়ে এই প্রকল্পটিকে একটি **"সবুজ সামুদ্রিক কেন্দ্র"** (Green Maritime Hub) হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। টেকসই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আদিবাসী-অন্তর্ভুক্তিমূলক সুশাসনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে ভারত গ্রেট নিকোবরকে এমন এক **ভবিষ্যৎ সীমান্তে** (Futuristic Frontier) রূপান্তরিত করতে পারে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের নেতৃত্ব এবং উচ্চ-মূল্যবান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ—উভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখবে।

প্রশ্ন: *"গ্রেট নিকোবর প্রকল্প উন্নয়ন বনাম পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিষয়টি সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন।" (১৫ নম্বর)*

3.2.4. কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) প্রযুক্তি

প্রাসঙ্গিকতা

২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারত **"হার্ড-টু-এবেট"** (Hard-to-Abate) বা দূষণ কমানো কঠিন এমন খাতগুলোকে (ইস্পাত এবং সিমেন্ট) অগ্রাধিকার দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের **কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম** (CBAM) মোকাবিলা করার জন্য CCU পাইলট প্ল্যান্টগুলোতে **ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং** (VGF) প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছে।

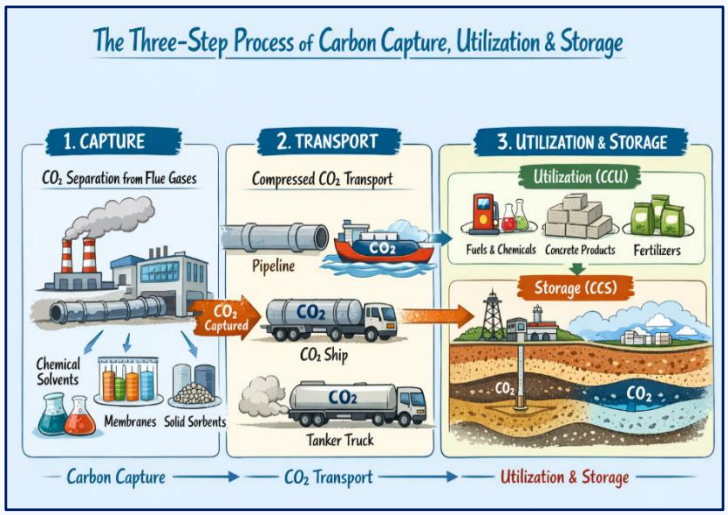

কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) প্রযুক্তি সম্পর্কে

কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) বলতে এমন প্রযুক্তিকে বোঝায় যা বিভিন্ন শিল্প উৎস (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিমেন্ট, ইস্পাত, রিফাইনারি) থেকে নির্গত CO_2 **নির্গমন সংগ্রহ** করে। এরপর এই সংগৃহীত কার্বনকে হয় বিভিন্ন মূল্যবান পণ্যে (রাসায়নিক, জ্বালানি, নির্মাণ সামগ্রী) **রূপান্তর** করা হয় অথবা মাটির নিচে **সঞ্চয়** (CCS) করে রাখা হয়।

তিনটি ধাপের প্রক্রিয়া

এই চিত্রগুলো CCUS-এর তিনটি ধাপের প্রক্রিয়াকে দৃশ্যমানভাবে ব্যাখ্যা করে:

১. **সংগ্রহ (Capture):** শিল্পের নির্গত গ্যাস (Flue gas) থেকে CO_2-কে আলাদা করা হয়।

২. **পরিবহন (Transport):** সংগৃহীত CO_2-কে সংকুচিত (Compress) করে পাইপলাইন, জাহাজ বা ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়।

৩. **ব্যবহার (Utilisation) বা সঞ্চয় (Storage):**

- **কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU):** একে জ্বালানি, রাসায়নিক, **কংক্রিট** এবং সারে রূপান্তর করা হয়।
- **কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ (CCS):** স্থায়ীভাবে সঞ্চয়ের জন্য মাটির গভীর স্তরে (Geological formations) ইনজেক্ট করা হয়।

কেন ভারতের CCU প্রযুক্তি প্রয়োজন?

১. **কঠিন শিল্প খাতকে (Hard-to-Abate) কার্বনমুক্ত করা**

- **রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা:** সিমেন্ট এবং ইস্পাত তৈরির সময় 'ক্যালসিনেশন' প্রক্রিয়ায় সরাসরি উপজাত হিসেবে CO_2 উৎপন্ন হয়, যা কেবল নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়।

- **অর্থনৈতিক ভিত্তি:** এই শিল্পগুলো **"বিকশিত ভারত @ ২০৪৭"**-এর জন্য অপরিহার্য; CCU এই শিল্পগুলোকে বিশাল কার্বন জরিমানা ছাড়াই সচল রাখতে সাহায্য করবে।

২. **নতুন শিল্প সম্পদ রক্ষা করা**

- **অচল সম্পদ (Stranded Assets) এড়ানো:** ভারতের শিল্প কারখানাগুলো তুলনামূলকভাবে **নতুন**। CCU প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই কয়লা ও গ্যাস ভিত্তিক প্ল্যান্টগুলো অকালে বন্ধ না করে সেগুলোকে আধুনিকায়ন (Retrofitting) করা সম্ভব।
- **সম্পদ নিরাপত্তা:** এটি ২০৭০ সালের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ কয়লা সম্পদের ব্যবহার সচল রাখে।

৩. **চক্রাকার কার্বন অর্থনীতি (বর্জ্য থেকে সম্পদ)**

- **আমদানি বিকল্প:** সংগৃহীত CO_2-কে **ইউরিয়া (সার)** এবং **মিথানল**-এ রূপান্তর করা যায়, যা ভারতের ব্যয়বহুল রাসায়নিক আমদানির ওপর নির্ভরতা কমায়।
- **টেকসই পরিকাঠামো:** CO_2-কে খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত করে **ইঁদুরে ও কংক্রিটে** ব্যবহারের মাধ্যমে এটি "সবুজ নির্মাণ" ব্যবস্থাকে সহায়তা করে।

৪. **অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা**

- **বাণিজ্য স্থিতিস্থাপকতা:** এটি ভারতীয় রপ্তানি পণ্যগুলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের **CBAM (কার্বন বর্ডার ট্যাক্স)**-এর মতো আন্তর্জাতিক কর এড়াতে সাহায্য করে।
- **সবুজ প্রবৃদ্ধি (Green Growth):** ২০২৬ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত **২০,০০০ কোটি টাকা** নতুন স্টার্ট-আপ তৈরি করতে এবং বিশেষায়িত **"গ্রিন ভ্যালু চেইন"** কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

ভারতের কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) এর বর্তমান অবস্থা

- **আর্থিক প্রতিশ্রুতি:** ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে **২০,০০০ কোটি টাকার** একটি ঐতিহাসিক বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো বেসরকারি বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানো এবং পরীক্ষামূলক পর্যায় থেকে বাণিজ্যিক শিল্প প্ল্যান্টে CCUS-কে উন্নীত করা।
- **কার্যকরী মাইলফলক:** দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন—IITs/IISc) এবং বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন—JSW, Dalmia) মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে সিমেন্ট খাতে **পাঁচটি সমন্বিত CCU টেস্টবেড** চালু করা হয়েছে।
- **বাজার ব্যবস্থা: ইন্ডিয়ান কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম (CCTS)** সক্রিয় করা হয়েছে। ২০২৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে ৪৯০টি তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রথম **কার্বন ক্রেডিট সার্টিফিকেট (CCC)** ইস্যু করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- **কৌশলগত রোডম্যাপ:** নীতি (NITI) আয়োগের ২০২৬ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সিমেন্ট এবং অ্যালুমিনিয়ামের মতো খাতগুলোতে গভীর কার্বনমুক্তকরণের (Decarbonization) জন্য **CCUS একমাত্র কার্যকর পথ**। ২০৭০ সালের মধ্যে এই খাতগুলোর চাহিদা ৭ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- **লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা খাত:** পাঁচটি **"হার্ড-টু-এবেট"** বা দূষণ কমানো কঠিন এমন খাতের ওপর কৌশলগত নজর দেওয়া হয়েছে—বিদ্যুৎ, ইস্পাত, সিমেন্ট, রিফাইনারি এবং রাসায়নিক। এটি **"বিকশিত ভারত @ ২০৪৭"** এবং ২০৭০ সালের 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে।

বৈশ্বিক কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU) উদ্যোগসমূহ

- **COP30 "বেলেম থেকে বাকু" রোডম্যাপ:** অনুচ্ছেদ ৬.৪-এর অধীনে **প্যারিস এগ্রিমেন্ট ক্রেডিটিং মেকানিজম (PACM)** আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এর ফলে DAC এবং CCU-এর মতো প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে কার্বন অপসারণের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব হবে।

- **ইউরোপীয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্বন স্ট্র্যাটেজি: নেট-জিরো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাক্ট** (NZIA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ৫০ মিলিয়ন টন CO_2 সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং **'নর্দান লাইটস'** (Northern Lights)-এর মতো আন্তঃসীমান্ত 'ওপেন-অ্যাক্সেস' হাব তৈরি করেছে।
- **মিশন ইনোভেশন (MI):** ভারতসহ ২৩টি দেশের একটি জোট **CDR মিশন**-কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ১০০ মিলিয়ন টন CO_2 অপসারণ করা। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড এনার্জি কংগ্রেসে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একে সমর্থন জানানো হচ্ছে।
- **বৈশ্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** IEA এবং GCCSI-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে এই খাতের প্রকল্পগুলো **বার্ষিক ৩০% হারে** বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌথ শিল্প "হাব" তৈরির মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্বন ক্যাপচার সক্ষমতা দ্বিগুণ হওয়ার পথে রয়েছে।
- **আমেরিকার 45Q ট্যাক্স ক্রেডিট:** আমেরিকার 'ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট' ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার (DAC)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত প্রতি টন CO_2-এর জন্য **১৮০ ডলার** পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান করে। এটি কার্বন অপসারণকে একটি লাভজনক ব্যবসায়িক মডেলে পরিণত করেছে।

কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন (CCU)-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **এনার্জি পেনাল্টি (শক্তির অপচয়):** CO_2 সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শক্তি-নিবিড়। শিল্প কারখানাগুলোকে তাদের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের **১৫-২৫%** শুধুমাত্র এই ক্যাপচার ইউনিটগুলো চালাতেই খরচ করতে হয়, যা জ্বালানি খরচ বাড়িয়ে দেয়।
- **প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক ব্যবধান:** উচ্চ পরিচালনা ব্যয়ের কারণে (প্রতি টনে **৫,০০০ টাকা** পর্যন্ত) CCU পদ্ধতিতে তৈরি পণ্য যেমন—সবুজ ইউরিয়া বা কংক্রিট, সস্তা জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে।
- **সবুজ হাইড্রোজেনের অভাব:** সিন্থেটিক এভিয়েশন ফুয়েলের মতো উচ্চ-মূল্যের CCU পণ্য তৈরির জন্য সাশ্রয়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন **সবুজ হাইড্রোজেন** সরবরাহ প্রয়োজন, যা বর্তমানে সীমিত।
- **অস্থায়ী সংরক্ষণের সমস্যা:** গভীর ভূগর্ভস্থ সংরক্ষণের তুলনায়, জ্বালানি বা প্লাস্টিকের মতো CCU পণ্যগুলোতে কার্বন কেবল **সাময়িকভাবে আটকে থাকে**। পণ্যটি ব্যবহারের সময় বা পুড়িয়ে ফেললে CO_2 আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে।
- **পরিকাঠামোগত বাধা:** ভারতে কার্বন পরিবহনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো **জাতীয় CO_2 পাইপলাইন নেটওয়ার্ক** নেই। সড়ক বা সমুদ্রপথে সংকুচিত কার্বন পরিবহন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এতে নতুন করে কার্বন নিঃসরণ ঘটে।
- **নিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতার অভাব:** CO_2 লিক বা নিঃসরণের ক্ষেত্রে আইনি দায়বদ্ধতা কার ওপর থাকবে এবং **"কার্বন-নিউট্রাল"** লেবেলিংয়ের বৈশ্বিক মানদণ্ড কী হবে—তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দিচ্ছে।

আগামীর পথ

- **হাব এবং ক্লাস্টার মডেল:** গুজরাট বা ওড়িশার মতো অঞ্চলে শিল্প ক্লাস্টার তৈরি করা, যেখানে একাধিক কারখানা একটি সাধারণ CO_2 পাইপলাইন ও স্টোরেজ ব্যবহার করবে। এতে প্রতিটি কারখানার জন্য খরচ অনেক কমে আসবে।
- **কার্বন মার্কেটের সক্রিয়করণ:** ২০২৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে **ইন্ডিয়ান কার্বন ক্রেডিট ট্রেডিং স্কিম** (CCTS) কার্যকর করা, যাতে কোম্পানিগুলো তাদের সংগৃহীত কার্বনকে সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অর্থায়ন করতে পারে।
- **ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং (VGF):** ২০,০০০ কোটি টাকার বাজেট ব্যবহার করে প্রথম ১০-১৫টি বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, যাতে প্রাথমিক উচ্চ ব্যয়ের বাধা দূর করা যায়।
- **উচ্চ-মূল্যের ব্যবহার ক্ষেত্র: "সবুজ কংক্রিট"** (মিনারেলিজেশন) এবং **টেকসই বিমান জ্বালানি** (SAF) উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং একে জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের সাথে যুক্ত করা।
- **নীতিমালার মানদণ্ড নির্ধারণ:** CO_2 পরিবহনের নিরাপত্তা, পরিবেশগত মান এবং দীর্ঘমেয়াদী আইনি দায়বদ্ধতার বিষয়ে একটি স্পষ্ট জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা যাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।
- **স্বদেশী গবেষণা (R&D):** কম খরচে স্থানীয়ভাবে **রাসায়নিক দ্রাবক** (Chemical Solvents) তৈরি করা এবং কার্বন অডিটিং ও রূপান্তর প্রযুক্তিতে দক্ষ একদল বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরি করা।

প্রশ্ন: *কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (CCUS) কী? জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় CCUS-এর সম্ভাব্য ভূমিকা কী? (১৫০ শব্দ)*

3.2.5. ভারতে বোতলজাত জলের নিরাপত্তার ভ্রান্ত ধারণা এবং প্রকৃত সত্য

প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট

- বর্তমান ভারতে বোতলজাত পানীয় জল এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং একটি অপরিহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। মূলত পুরসভার সরবরাহ করা জলের ওপর **আস্থার অভাব** এবং "সিল করা প্লাস্টিকের জল মানেই নিরাপদ"—এই বদ্ধমূল ধারণাই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ।
- তবে সাম্প্রতিক বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বলছে যে, বোতলজাত জল অণুজীবমুক্ত (Microbiological standards) হলেও, এর মধ্যে মিশে থাকা অদৃশ্য **রাসায়নিক ও ভৌত দূষক** মানবস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে।

বোতলজাত জলের ব্যবহারের কাঠামোগত বৃদ্ধি

ভারতের বোতলজাত জলের বাজার বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র, যা ২০২৫-২০৩৫ সালের মধ্যে ৬.৫% হারে (CAGR) বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ক. বোতলজাত পানীয় জলের প্রসারের কারণসমূহ

- **ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ**, জরাজীর্ণ জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, অনিয়মিত জল সরবরাহ এবং ভূগর্ভস্থ জলের দূষণের ফলে বোতলজাত জলের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে।
- রেল স্টেশন, অফিস, হাসপাতাল এবং রেস্তোরাঁগুলোতে এই জল এখন দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
- অদৃশ্য দূষকগুলোর কথা বিবেচনা না করেই "সিল করা" জলকে **"নিরাপদ"** মনে করার একটি প্রবণতা জনমানসে তৈরি হয়েছে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো

- **FSSAI** (Food Safety and Standards Authority of India) ২০০৬ সালের আইন অনুযায়ী এটি নিয়ন্ত্রণ করে।
- **BIS** (Bureau of Indian Standards) এর প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ করে।
- **নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মূল নজর থাকে:**
    - ক্ষতিকারক অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ।
    - নির্দিষ্ট কিছু ভারী ধাতু ও রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের মাত্রা পরীক্ষা করা।
- তবে বর্তমান সরকারি মানদণ্ডে **মাইক্রোপ্লাস্টিক** এবং **ন্যানোপ্লাস্টিক** পরীক্ষার কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই, যা একটি বড় ধরনের **নিয়ন্ত্রণমূলক ঘাটতি** (Regulatory gap) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক: এক অদৃশ্য হুমকি

৫. মিলিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের **মাইক্রোপ্লাস্টিক** এবং ১ মাইক্রোমিটারের চেয়েও ছোট **ন্যানোপ্লাস্টিক** বর্তমানে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

- **ভারতীয় বাজারে ব্যাপকতা:** নাগপুর, মুম্বাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরীক্ষা করা ১০০% নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিক বিদ্যমান (প্রতি লিটারে ৭২ থেকে ২১২টি কণা)।
- **মান নিয়ন্ত্রণে বৈষম্য:** জাতীয় ব্র্যান্ডের তুলনায় স্থানীয়ভাবে বোতলজাত জলে প্লাস্টিকের ঘনত্ব অনেক বেশি পাওয়া গেছে।

- **ন্যানোপ্লাস্টিকের অনুপ্রবেশ:** ন্যানোপ্লাস্টিক অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ এগুলো কোষের পর্দা, রক্ত-মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধক (Blood-brain barrier) এবং গর্ভফুল (Placenta) অতিক্রম করে মানব সংবহনতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে প্রবেশ করতে পারে।
- **প্যাথোফিজিওলজিক্যাল প্রভাব:** এই কণাগুলো **অক্সিডেটিভ স্ট্রেস**, দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া এগুলো 'ট্রোজান হর্স' হিসেবে কাজ করে শরীরে ভারী ধাতু ও জীবাণু বহন করে আনে।
- **রাসায়নিক লিচিং (Leaching):** থ্যালেটস, **বিসফেনল এ (BPA)** এবং অ্যান্টিমনির মতো উপাদান বোতল থেকে জলে মিশে যেতে পারে।
- **পরিবেশগত প্রভাব:** সরাসরি সূর্যের আলো এবং ভারতের গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রা প্লাস্টিকের রাসায়নিক ভাঙন ও লিচিংয়ের হারকে ত্বরান্বিত করে।
- **দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া:** লিচ হওয়া এই রাসায়নিকগুলো **এন্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টর** (হরমোন ব্যঘতকারী) হিসেবে কাজ করে, যা প্রজনন বা বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি করতে পারে।
- **নিয়ন্ত্রণমূলক সীমাবদ্ধতা:** বর্তমান মানদণ্ডে মাইক্রোপ্লাস্টিকের সাথে একাধিক রাসায়নিকের দীর্ঘমেয়াদী বিক্রিয়া বা **'ককটেল ইফেক্ট'** মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই।

প্যাকেজজাত জল শিল্পের মূল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

- **ভূগর্ভস্থ জলের অতি-উত্তোলন:** এই শিল্প এমন সব জলস্তরের (Aquifers) ওপর নির্ভরশীল যা ইতিমধ্যেই সংকটাপন্ন। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মতো পুনর্ভরণ পদ্ধতিতে এদের বিনিয়োগ অত্যন্ত নগণ্য।
- **খনিজ ঘাটতির ঝুঁকি: রিভার্স অসমোসিস (RO)** প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো অত্যাবশ্যকীয় খনিজ দূর হয়ে যায়, যা হৃদরোগসহ দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে (WHO-এর সতর্কতা অনুযায়ী)।
- **পরিবেশগত প্রভাব:** একবার ব্যবহারযোগ্য (Single-use) PET বোতল ভারতের প্লাস্টিক বর্জ্য সংকটকে ঘনীভূত করছে; যার মাত্র **১৩% কার্যকরভাবে রিসাইকেল** হয়। বাকি অংশ মাটি ও খাদ্যশৃঙ্খলে মিশে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করছে।
- **তথ্যের অসামঞ্জস্যতা:** গ্রাহকরা প্রায়ই 'ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার' এবং সাধারণ 'প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার'-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না, যা সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা।

নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো এবং প্রধান ঘাটতিসমূহ

ভারতের প্যাকেজজাত জল শিল্প বর্তমানে **FSSAI**-এর অধীনে একটি বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

- **২০২৪-এর পরিবর্তন:** লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করতে FSSAI বাধ্যতামূলক **BIS শংসাপত্র** সরিয়ে নিয়েছে। এখন বোতলজাত জলকে **"উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্য বিভাগ"** হিসেবে গণ্য করা হয়, যার জন্য বার্ষিক থার্ড-পার্টি অডিট বাধ্যতামূলক।
- **পরীক্ষাগারের সীমাবদ্ধতা (IS 14543):** বর্তমান মানদণ্ডে খনিজ ও ভারী ধাতু পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, **মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিক** পরীক্ষার কোনো প্রোটোকল নেই।
- **তদারকি ঘাটতি:** ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকারী ইউনিটগুলোতে প্রায়ই **কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ** এবং **ফ্লোরাইড** দূষণ ধরা পড়ছে, যা নিয়ম পালনে উদাসীনতা প্রমাণ করে।

নিরাপদ জল ও প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি উদ্যোগ

১. জল জীবন মিশন (JJM): পরিকাঠামো ও সুবিধা

২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই মিশনের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া (২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা)।

- **২০২৬-এর অগ্রগতি:** ১৯.৩৬ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ১৫.৮ কোটিরও বেশি (৮১.৬%) পরিবারে ট্যাপ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

- **গুণমান নজরদারি:** ২,৮০০টিরও বেশি ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং ২৪ লক্ষেরও বেশি নারীকে **ফিল্ড টেস্টিং কিট (FTK)** ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- **উৎসের স্থায়িত্ব:** ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

২. অমৃত (AMRUT) ২.০: নগর জল নিরাপত্তা

শহরগুলোকে **"জল-সুরক্ষিত"** (Water secure) করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।

- **সর্বজনীন কভারেজ:** ৪,৭০০টিরও বেশি সংবিধিবদ্ধ শহরে ১০০% জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্য।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি:** ব্যবহৃত জল পুনর্ব্যবহার (Recycle/Reuse) এবং জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ কমানো।

৩. FSSAI-এর নতুন টেস্টিং স্কিম (২০২৬)

২০২৪-এ BIS শংসাপত্র সরানোর পর, ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আরও কঠোর তদারকি ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

- **বাধ্যতামূলক পরীক্ষা:** উৎপাদকদের প্রতি মাসে অণুজীব পরীক্ষা এবং প্রতি তিন মাস অন্তর ভারী ধাতু ও খনিজ পরীক্ষা করতে হবে।
- **ডিজিটাল রেকর্ড:** 'ফুড বিজনেস অপারেটর'দের (FBO) ৫ বছরের ডিজিটাল পরিদর্শন রেকর্ড রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪. মাইক্রোপ্লাস্টিক মোকাবিলা: প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম

২০২৪ ও ২০২৫ সালের সংশোধিত নিয়মগুলি সরাসরি মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণকে লক্ষ্য করে তৈরি।

- **মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংজ্ঞা:** ২০২৪-এর নিয়মে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিককে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- **EPR (Extended Producer Responsibility):** উৎপাদক ও ব্র্যান্ড মালিকরা তাদের উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইকেল করতে আইনত বাধ্য।
- **ডিজিটাল ট্র্যাকিং (২০২৫):** উৎপাদন থেকে বর্জ্য অপসারণ পর্যন্ত নজরদারি চালাতে প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ে **QR কোড বা বারকোড** বাধ্যতামূলক।
- **SUP নিষিদ্ধকরণ:** একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single-use Plastic) নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে তা ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত না হয়।

ভবিষ্যতের পন্থা: একটি বহুমুখী কৌশল

এই "অদৃশ্য সংকট" মোকাবিলায় সমন্বিত নীতি সংস্কার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং আচরণের পরিবর্তন প্রয়োজন, যা ভারতের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **নিরাপত্তার মানদণ্ড আধুনিকীকরণ:** মাইক্রোপ্লাস্টিক, প্লাস্টিকাইজার (যেমন- থ্যালেটস) এবং ভারী ধাতু পরীক্ষার জন্য **FSSAI প্রোটোকল** বাধ্যতামূলক করা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পাবলিক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রকাশ করা।
- **পুরসভার জল সরবরাহ শক্তিশালী করা:** 'জল জীবন মিশন'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ট্যাপের জলের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা। এক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন, থার্ড-পার্টি অডিট এবং গুণমান প্রকাশের জন্য অ্যাপ ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে যাতে বোতলজাত জলের ওপর নির্ভরতা কমে।
- **টেকসই বিকল্পের প্রসার:** ভর্তুকি এবং সচেতনতা অভিযানের মাধ্যমে বাড়িতে ব্যবহারের উপযোগী ফিল্টার (যেমন- UF+UV সিস্টেম) এবং কাঁচ বা স্টেইনলেস স্টিলের পুনর্ব্যবহারযোগ্য পাত্রের ব্যবহার উৎসাহিত করা।
- **বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) ত্বরান্বিত করা:** প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, ২০২২-এর অধীনে **Extended Producer Responsibility (EPR)** কঠোরভাবে প্রয়োগ করা, যাতে ১০০% PET বোতল সংগ্রহ, বাছাই এবং উচ্চমানের রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

ভারতে বোতলজাত জলের ওপর এই নির্ভরতা মূলত জনপরিষেবার ঘাটতির একটি জটিল লক্ষণ। যদিও এটি সাময়িকভাবে জলের চাহিদা মেটায়, কিন্তু এর প্রচ্ছন্ন খরচ—মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস—প্রমাণ করে যে বর্তমান মডেলটি **টেকসই নয়**। ভারতের জন্য **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬** (বিশুদ্ধ জল ও স্যানিটেশন) অর্জন করতে হলে বাণিজ্যিক সুবিধার চেয়ে একটি স্বচ্ছ এবং বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, যা নাগরিক এবং পরিবেশ—উভয়েরই দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেবে।

নিচে আপনার দেওয়া টেক্সটটির একটি যথাযথ এবং মার্জিত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো:

প্রশ্ন: *ভারতে বোতলজাত জলের ব্যবহারের দ্রুত বৃদ্ধি 'নিরাপত্তার ধারণা' এবং 'উদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি'র মধ্যে এক কঠিন আপসকে তুলে ধরে। প্যাকেজজাত পানীয় জল শিল্পের চ্যালেঞ্জগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন। সকলের জন্য পানীয় জলের টেকসই এবং নিরাপদ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে একটি বহুমুখী (Multi-sectoral) কৌশলের পরামর্শ দিন। (২৫০ শব্দ)*

3.3. বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি

3.3.1. ইন্ডিয়া এআই স্ট্যাক

প্রেক্ষাপট

ভারতের এআই (AI) কৌশল মূলত **"মানবতার জন্য এআই"** দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত । এর মূল লক্ষ্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুযোগ-সুবিধাকে **গণতন্ত্রীকরণ** করা, যাতে এর সুফল কেবল কয়েকটি সংস্থা বা দেশের হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে । ভারতের প্রধান লক্ষ্য হলো এআই-কে জনসাধারণ -পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, শিক্ষা, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং বিচার ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা ।

এআই স্ট্যাক (AI Stack) কী?

এআই স্ট্যাক হলো প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং বিভিন্ন সিস্টেমের একটি **সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম**, যা বাস্তব জগতে এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, প্রশিক্ষণ, ব্যবহার এবং বড় আকারে পরিচালনা করতে একত্রে কাজ করে । এটি **পাঁচটি আন্তঃসংযুক্ত স্তরের** একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বাস্তব জগতের প্রভাবে রূপান্তর করতে সাহায্য করে:

1. **অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার** (Application Layer)
2. **এআই মডেল লেয়ার** (AI Model Layer)
3. **কম্পিউট লেয়ার** (Compute Layer)
4. **ডেটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামো লেয়ার** (Data Centres & Network Infrastructure Layer)
5. **এনার্জি লেয়ার** (Energy Layer)

এআই স্ট্যাকের ৫টি স্তর

১. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার :

এটি হলো সেই স্তর যার সাথে সাধারণ ব্যবহারকারী সরাসরি যোগাযোগ করেন । এটি জটিল কোডকে সহজ ও ব্যবহারকারী-বান্ধব সেবায় রূপান্তর করে ।

- **ভারতে উচ্চ-প্রভাবশালী প্রয়োগ:**
  - **কৃষি:** এআই-চালিত পরামর্শের মাধ্যমে বীজ বপন, ফলন এবং কাঁচামালের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে । অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে **৩০-৫০% উৎপাদনশীলতা** বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেছে ।
  - **স্বাস্থ্যসেবা:** যক্ষ্মা (TB), ক্যান্সার এবং স্নায়বিক রোগ দ্রুত শনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসাকে শক্তিশালী করছে ।
  - **শিক্ষা: NEP 2020**, CBSE পাঠ্যক্রম, DIKSHA এবং YUVAi-এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এআই শিক্ষা একীভূত করা হয়েছে ।
  - **বিচার ব্যবস্থা: ই-কোর্ট (e-Courts) পর্যায় III**-এ অনুবাদ, সময় নির্ধারণ এবং মামলার ব্যবস্থাপনায় এআই/এমএল ব্যবহার করা হচ্ছে ।
  - **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:** ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তর বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড় এবং বজ্রপাতের পূর্বাভাসের জন্য এআই ব্যবহার করছে; **মৌসম জিপিটি (Mausam GPT)** কৃষক ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে ।

২. **এআই মডেল লেয়ার (মস্তিষ্ক):**

এই স্তরটি ডেটার ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত অ্যালগরিদম দ্বারা গঠিত, যা প্যাটার্ন চিনতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে ।

- **ভারতের লক্ষ্য:** স্থানীয় প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে **ভারতজেন (BharatGen)** এবং **ভাষিণী (Bhashini)**-র মতো নিজস্ব মডেল তৈরি করা ।

৩. **কম্পিউট লেয়ার (পেশী):**

এটি এআই মডেল প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রসেসিং ক্ষমতা (**GPU এবং TPU**) সরবরাহ করে ।

- **মূল তথ্য: ইন্ডিয়া এআই (IndiaAI) কম্পিউট পোর্টাল** ভর্তুকি মূল্যে (ঘণ্টায় ১০০ টাকার নিচে) উচ্চ-মানের প্রসেসিং সুবিধা দিচ্ছে, যা স্টার্টআপদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় সাহায্য করছে ।

৪. **ডেটা সেন্টার এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার (হাইওয়ে):**

এটি সেই ভৌত অবকাঠামো—যেখানে ফাইবার কেবল এবং সার্ভার হাউজের মাধ্যমে এআই-এর তথ্য জমা থাকে ও আদান-প্রদান করা হয় ।

- **বর্তমান স্থিতি:** ভারতে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার ক্ষমতার প্রায় ৩% (~৯৬০ মেগাওয়াট) রয়েছে । ৫জি নেটওয়ার্ক এখন দেশের **৯৯.৯% জেলায়** বিস্তৃত এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টার ক্ষমতা **৯.২ গিগাওয়াটে (GW)** পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

৫. **এনার্জি লেয়ার (জ্বালানি):**

এআই প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে। এই স্তরটি সার্ভারগুলো সচল রাখতে নিরবচ্ছিন্ন এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

- **স্থায়িত্ব:** ভারতের মোট বিদ্যুৎ ক্ষমতার **৫১% এরও বেশি** বর্তমানে অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে আসে, যা পরিবেশের ক্ষতি না করেই এআই-এর প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে । ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি এবং বিশাল ব্যাটারি স্টোরেজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ।

ইন্ডিয়া এআই স্ট্যাক মিশনের গুরুত্ব

- **এআই-এর গণতন্ত্রীকরণ:** কম্পিউট ক্ষমতা, ডেটাসেট এবং মডেল সবার জন্য সহজলভ্য করে তোলা ।
- **জনসংখ্যা-পর্যায়ে জনসেবা:** কৃষি থেকে বিচার ব্যবস্থা—সব খাতে এআই-এর বড় মাপের প্রয়োগ সম্ভব করা ।
- **সার্বভৌম ও ভারত-কেন্দ্রিক মডেল:** বিদেশি মডেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভারতীয় ভাষা ও আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিজস্ব মডেল তৈরি করা ।
- **স্টার্টআপ ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি:** ভর্তুকি মূল্যের প্রসেসিং শক্তি এবং উন্মুক্ত ডেটাসেটের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের বাধা দূর করা ।

- **প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা (Atmanirbhar Bharat):** সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং সুপারকম্পিউটিংয়ের (যেমন- PARAM Siddhi-AI, AIRAWAT) সাথে এআই-কে যুক্ত করা ।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল শাসন:** স্থানীয় ভাষায় নাগরিক-কেন্দ্রিক এআই পরিষেবা নিশ্চিত করা ।

এআই স্ট্যাক মিশনের চ্যালেঞ্জসমূহ

- **হার্ডওয়্যার একাধিপত্য:** ভারত এখনো বিদেশি চিপের (NVIDIA/Google) ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল; দেশীয় চিপ (যেমন- SHAKTI) এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ।
- **উচ্চ মূলধনী ব্যয়:** জিপিইউ (GPU) ক্লাস্টার রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল; ভর্তুকি ধরে রাখতে সরকারের ওপর বিশাল আর্থিক চাপ থাকে ।
- **সমন্বয়হীন ডেটা ব্যবস্থাপনা:** অনেক সরকারি তথ্য এখনো অসংগঠিত বা ডিজিটাল ফর্মে নেই ।
- **গোপনীয়তা রক্ষা:** তথ্যের গণতন্ত্রীকরণ এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ।
- **দক্ষতার অভাব:** উচ্চমানের এআই গবেষকদের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম।
- **পরিবেশগত ও শক্তি ব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ:** ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর শক্তি খরচ করে এবং এগুলো ঠান্ডা রাখতে বিশাল পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় ।
- **অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত:** ঐতিহাসিক ডেটাতে থাকা সামাজিক বৈষম্য (জাতি বা লিঙ্গ) এআই-এর সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে ।

ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ

- **চিপ প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরতা:** চিপ ডিজাইনের পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদনের জন্য **ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন**-কে গতিশীল করা।
- **এজ এআই (Edge AI):** সরাসরি ডিভাইসে এআই চালানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া যাতে মূল সার্ভারের ওপর চাপ কমে ।
- **ডেটা মানককরণ:** সব সরকারি তথ্যকে এআই-বান্ধব করতে অভিন্ন প্রোটোকল তৈরি করা ।
- **এআই-দক্ষ মানবসম্পদ:** স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত এআই শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া ।
- **এআই অডিট:** সামাজিক পক্ষপাতমুক্ত এআই নিশ্চিত করতে স্বাধীন তদারকি সংস্থা গঠন করা ।
- **পরিবেশবান্ধব এআই নীতি:** ১০০% নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারকারী ডেটা সেন্টারকে উৎসাহিত করা ।

উপসংহার

ইন্ডিয়া এআই স্ট্যাক কেবল একটি প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নয়; এটি ১৪০ কোটি মানুষের জন্য একটি **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার** । নিজস্ব মডেলের সাথে পরিবেশবান্ধব শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ভারত একটি **"মানব-কেন্দ্রিক এআই"** মডেলের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে, যা ডিজিটাল যুগে ভারতের বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে ।

প্রশ্ন: *জনসাধারণের জন্য বড় পরিসরে সরকারি পরিষেবা প্রদান, প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা এবং টেকসই ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে 'ইন্ডিয়া এআই স্ট্যাক মিশনের' গুরুত্ব পরীক্ষা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.3.2. AMCA এবং ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট

ভারত সরকার হ্যাল (HAL)-এর একচেটিয়া আধিপত্য কমিয়ে এবং উৎপাদনের বিলম্ব কাটিয়ে উঠতে **AMCA প্রোটোটাইপ তৈরির চুক্তি** বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেওয়ার প্রস্তাব করছে। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো ভারতের অ্যারোস্পেস ইকোসিস্টেমকে বহুমুখী করা এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক **বেসরকারি প্রতিরক্ষা শিল্প কেন্দ্র** গড়ে তোলা।

জাতীয় কৌশলগত প্রকল্প হিসেবে AMCA

অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফট (AMCA) শুধুমাত্র একটি যুদ্ধবিমান তৈরির কর্মসূচি নয়; এটি আসলে:

- **পঞ্চম প্রজন্মের বিমান যুদ্ধে** ভারতের প্রবেশদ্বার।
- **স্টিলথ ডিজাইন (Stealth Design)**, সেন্সর ফিউশন, অ্যাভিওনিক্স এবং এআই-চালিত যুদ্ধের কৌশলে দক্ষতা অর্জন।
- উচ্চমানের অ্যারোস্পেস ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ভারতের **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন** নিশ্চিত করা।

যুদ্ধবিমান উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

১. **সরকারি খাতের একচেটিয়া আধিপত্য দূর করা**

এর ফলে দেশে একটি **দ্বিতীয় বিমান তৈরির কারখানা** বা উৎপাদন লাইন তৈরি হবে।

- **ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা:** টাটা (Tata), এলঅ্যান্ডটি (L&T) বা ভারত ফোর্জের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলো এলে খরচের নিয়ন্ত্রণ, উন্নত গুণমান এবং সঠিক সময়ে কাজ শেষ করার একটি সংস্কৃতি তৈরি হবে, যা অনেক সময় সরকারি সংস্থাগুলোতে দেখা যায় না।
- **কাজের চাপ কমানো:** বর্তমানে হ্যাল (HAL)-এর কাছে ১৮০টিরও বেশি তেজাস (Tejas Mk-1A এবং Mk-2) বিমানের বিশাল অর্ডার রয়েছে। বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এলে AMCA প্রকল্পের কাজে কোনো দেরি হবে না।

২. **"আত্মনির্ভর ভারত" ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা**

একটি শক্তিশালী **সামরিক-শিল্প কেন্দ্র (MIC)** গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি খাত অত্যন্ত জরুরি:

- **আইপি (IP) মালিকানা:** এই মডেলে সরকার নকশা বা ইন্টেল্যাকচুয়াল প্রপার্টির মালিকানা নিজেদের কাছে রাখবে, কিন্তু বেসরকারি খাত **লিড সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন (LSI)** বা সম্পূর্ণ বিমানটি একত্রিত করার জটিল প্রক্রিয়াটি শিখে যাবে।
- **ছোট ও মাঝারি শিল্পের (MSME) উন্নতি:** বড় বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কাজের জন্য অসংখ্য ছোট দেশীয় সরবরাহকারী বা MSME-র একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করবে, যা দেশের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করবে।

৩. **বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি**

- **উদ্ভাবনী ক্ষমতা:** বেসরকারি সংস্থাগুলো খুব সহজেই বিদেশি নামী সংস্থাগুলোর (যেমন ইঞ্জিনের জন্য Safran বা এয়ারফ্রেমের জন্য Boeing) সাথে **যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture)** তৈরি করে উন্নত প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারবে।
- **রপ্তানি মানসিকতা:** সরকারি সংস্থার তুলনায় বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশ্ববাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিমান তৈরি করবে, যা ভবিষ্যতে AMCA-কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে **রপ্তানির সুযোগ** তৈরি করে দেবে।

৪. **ঝুঁকি কমানো এবং বৈচিত্র্য আনা**

- **আর্থিক সুরক্ষা:** বড় বড় শিল্প গোষ্ঠীগুলো তাদের অন্যান্য ব্যবসার মুনাফা থেকে এই ধরনের গবেষণার প্রাথমিক ঝুঁকি নিতে পারে, যেখানে হ্যাল (HAL) সম্পূর্ণভাবে সরকারি বাজেটের ওপর নির্ভরশীল।
- **প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র:** একাধিক সংস্থা মাঠে থাকলে সবাই **৩ডি প্রিন্টিং** বা **এআই-চালিত অ্যাসেম্বলির** মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খরচ কমানোর চেষ্টা করবে।

যুদ্ধবিমান উন্নয়নে বেসরকারি খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব**

- **শুরুর বাধা:** ভারতের বেসরকারি সংস্থাগুলো ছোটখাটো যন্ত্রাংশ তৈরিতে দক্ষ হলেও একটি আস্ত ফাইটার জেট তৈরির কোনো **পূর্ব অভিজ্ঞতা** তাদের নেই।
- **জটিলতা:** একটি সাধারণ বিমানের তুলনায় পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ বিমান তৈরি করা অনেক বেশি কঠিন এবং জটিল।
- **প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতির অভাব:** হ্যাল (HAL)-এর কাছে গত ৮০ বছরের বিমান পরীক্ষা ও অস্ত্র সংযোজনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তা খুব দ্রুত অর্জন করতে হবে।

২. **পরিকাঠামো এবং মূলধনী ঝুঁকি**

- **বেঙ্গালুরু কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা:** ভারতের সমস্ত প্রধান পরীক্ষাগার (DRDO, ASTE, National Flight Test Centre) বেঙ্গালুরুতেই অবস্থিত।
- **বিশাল খরচ:** শুধুমাত্র পাঁচটি প্রোটোটাইপ বা পরীক্ষামূলক বিমান তৈরির জন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন পরিকাঠামো তৈরি করতে চাইবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।
- **আর্থিক ঝুঁকি:** গবেষণার বিশাল খরচ এবং অনিশ্চয়তার কারণে অনেক বেসরকারি সংস্থা শুরুর দিকে এই প্রকল্পে যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করছিল।

৩. **নকশা ও উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব**

- **একক নিয়ন্ত্রণের অভাব:** আগে নকশা এবং উৎপাদন একই ছাদের নিচে (HAL) হতো বলে যেকোনো সমস্যা দ্রুত মেটানো যেত।
- **মালিকানা নিয়ে ধোঁয়াশা:** এখন যদি নকশা করে সরকারি সংস্থা (ADA) এবং বিমান তৈরি করে বেসরকারি সংস্থা, তবে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির ক্ষেত্রে দায়ভার কার হবে, তা নিয়ে আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হতে পারে।

৪. **দক্ষ জনশক্তির অভাব**

- **টেস্ট পাইলটের অভাব:** ভারতে টেস্ট পাইলট প্রশিক্ষণের মাত্র একটি স্কুল রয়েছে। বেসরকারি সংস্থার পক্ষে এমন দক্ষ পাইলট খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।
- **কর্মীবাহিনী:** বেসরকারি সংস্থাগুলো হয়তো হ্যাল বা ডিআরডিও-র অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদেরই নিয়োগ করবে, যার ফলে নতুন কোনো মেধা তৈরি না হয়ে শুধু একই লোক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হবে।

ভবিষ্যতের পথ

১. **সমন্বিত পরিকাঠামো মডেল**

ভারতকে একটি **'প্লাগ-এন্ড-প্লে' (Plug-and-Play)** মডেল গ্রহণ করতে হবে:

- **সম্পদ ভাগ করে নেওয়া:** হ্যাল-এর বিমানবন্দর এবং ডিআরডিও-র ল্যাবগুলো বেসরকারি সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করতে দিতে হবে।
- **সহ-অবস্থান:** বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের বিমান বাহিনীর টেস্টিং ইউনিটের (ASTE) সাথেই কাজ করতে হবে যাতে তারা দ্রুত ফিডব্যাক পায়।

২. **অংশীদারিত্বের মডেল উন্নত করা**

বেসরকারি সংস্থাগুলোর আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট আশ্বাস প্রয়োজন:

- **ক্রয়ের নিশ্চয়তা:** প্রথম দুটি স্কোয়াড্রন বিমান কেনার একটি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি সরকারকে দিতে হবে।
- **ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয়:** বড় সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা ছোট ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) সাথে নিয়ে কাজ করে।

৩. **ইঞ্জিনের সমস্যা সমাধান**

একটি বিমানের মূল অংশ হলো তার ইঞ্জিন। এর জন্য দুটি পথে এগোতে হবে:

- **স্বল্পমেয়াদী:** শুরুর প্রোটোটাইপগুলোর জন্য আমেরিকার **GE F414 ইঞ্জিন** ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- **দীর্ঘমেয়াদী:** ফ্রান্সের স্যাফরান (Safran)-এর সাথে যৌথভাবে ১২০ কিলোনিউটনের শক্তিশালী ইঞ্জিন তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করা, যাতে ভারত ইঞ্জিনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ **স্বনির্ভর** হতে পারে।

৪. **দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা**

- **পাইলট প্রশিক্ষণ:** টেস্ট পাইলট স্কুলের ক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে বেসরকারি খাতের পাইলটরাও সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।
- **সফটওয়্যার ও এআই:** যেহেতু বেসরকারি সংস্থাগুলো আইটি-তে ভালো, তাদের উচিত বিমানের **সফটওয়্যার এবং সেন্সর ফিউশনের** ওপর বেশি জোর দেওয়া।

উপসংহার

AMCA প্রকল্পটি **আত্মনির্ভর ভারত** গড়ার পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এটি সরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে একটি বেসরকারি শিল্প ভিত্তি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ভারত তার **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করতে পারবে, যার ফলে পঞ্চম প্রজন্মের এই যুদ্ধবিমান দেশের ভেতরেই তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন: *"ভারতের ফাইটার এয়ারক্রাফট বা যুদ্ধবিমান কর্মসূচিতে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনের যুক্তিগুলো সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। এই পরিবর্তনটি কী ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে?" (২৫০ শব্দ)*

3.3.3. আসন্ন এআই (AI) বিপ্লব এবং এর বৈশ্বিক প্রভাব

প্রেক্ষাপট

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) একটি রূপান্তরমূলক **'সাধারণ-উদ্দেশ্য প্রযুক্তি'** (General-purpose technology) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে, যার প্রভাব **শিল্প বিপ্লব বা ইন্টারনেট বিপ্লবের** সাথে তুলনীয়। বর্তমান এআই-এর এই জোয়ার—যা **জেনারেটিভ এআই, মেশিন লার্নিং, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং উন্নত সেমিকন্ডাক্টর** ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত—বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শাসন কাঠামো এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার সমীকরণকে নতুন করে সাজাচ্ছে। এর প্রভাব কেবল প্রযুক্তির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা এক সভ্যতামূলক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এআই (AI) বিপ্লবের চালিকাশক্তি

১. **দ্রুত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন**

- **লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLMs)** এবং **জেনারেটিভ এআই**-এর বিকাশ, যা যুক্তি প্রদান, কোডিং, বিষয়বস্তু তৈরি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে সক্ষম।
- ক্লাউড কম্পিউটিং, **ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT)**, রোবোটিক্স এবং ৫জি (5G) নেটওয়ার্কের সাথে এআই-এর সমন্বয়।
- ডেটা স্টোরেজ বা তথ্য সংরক্ষণের খরচ হ্রাস এবং **কম্পিউটেশনাল ক্ষমতা** বৃদ্ধি, যা রিয়েল-টাইম প্রসেসিং বা তাৎক্ষণিক তথ্য বিশ্লেষণকে সম্ভবপর করছে।

২. **বিপুল সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ (Massive Public and Private Investments)**

- বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলোর (আমেরিকা, চীন, ইইউ) কৌশলগত অর্থায়ন, যেখানে এআই-কে **জাতীয় অগ্রাধিকার** হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
- প্রযুক্তি জায়ান্টদের পক্ষ থেকে এআই গবেষণা, চিপ ডিজাইন এবং বৈশ্বিক **ডেটা অবকাঠামো** তৈরিতে বিনিয়োগ।
- প্রতিরক্ষা, নগর পরিকল্পনা, জনকল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদান এবং **ডিজিটাল প্রশাসনে** সরকার কর্তৃক এআই-এর ব্যবহার।

তাৎপর্য ও প্রভাব

১. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত প্রবৃদ্ধি**

- **তাৎপর্য:** এআই একটি **সাধারণ-উদ্দেশ্য প্রযুক্তি** হিসেবে বিভিন্ন খাতে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়করণ বা **অটোমেশন** দক্ষতা বাড়ায়, খরচ কমায় এবং ভুলের মাত্রা কমিয়ে আনে। **প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স** বা পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ সাপ্লাই চেইন, কৃষি, অর্থায়ন এবং উৎপাদন শিল্পকে শক্তিশালী করে।
- **প্রভাব:** উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি। নতুন ব্যবসায়িক মডেলের (**যেমন:** AI-as-a-Service, **প্ল্যাটফর্ম ইকোনমি**) উত্থান। শিল্পের পুনর্গঠন এবং **ক্রিয়েটিভ ডেসট্রাকশন** (পুরাতন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও নতুনের সৃষ্টি)। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধির চাপ।

২. **শ্রমবাজারের রূপান্তর**

- **তাৎপর্য:** রুটিনমাফিক কাজ এবং দাপ্তরিক কাজের অটোমেশন। উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন এআই-সংশ্লিষ্ট চাকরির চাহিদা বৃদ্ধি।
- **প্রভাব:** স্বল্প ও মাঝারি দক্ষতার কর্মক্ষেত্রে সাময়িক **চাকরিচ্যুতি**। দক্ষতা-ভিত্তিক এবং ডিজিটালভাবে মানানসই কর্মসংস্থানের দিকে ঝোঁক। যথাযথ নীতিমালার অভাবে **কাঠামোগত বেকারত্বের** ঝুঁকি।

৩. **ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ঝুঁকি**

- **তাৎপর্য:** গুটিকতক কর্পোরেশন এবং উন্নত দেশগুলোর হাতে এআই অবকাঠামোর কেন্দ্রীভবন। ডেটা, চিপস এবং কম্পিউটিং ক্ষমতার অসম বণ্টন।
- **প্রভাব:** বৈশ্বিক **ডিজিটাল বিভাজন** (Digital Divide) আরও প্রশস্ত হওয়া। উন্নত দেশগুলোর ওপর উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা। আয়ের মেরুকরণ এবং সম্ভাব্য সামাজিক অস্থিরতা।

৪. **এআই, কৌশলগত আধিপত্য এবং ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব**

- **তাৎপর্য:** প্রতিরক্ষা, নজরদারি এবং সাইবার কার্যক্রমে এআই-কে একটি **কৌশলগত সম্পদ** হিসেবে ব্যবহার। স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তথ্য ও ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।
- **প্রভাব:** বৈশ্বিক ক্ষমতার লড়াই এবং **টেকনো-ন্যাশনালিজম** বা প্রযুক্তিগত জাতীয়তাবাদের তীব্রতা বৃদ্ধি। **এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতার** (AI arms race) ঝুঁকি। বৈশ্বিক ডিজিটাল ব্যবস্থার খণ্ডবিখণ্ড হওয়া। ডেটা এবং সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন নিয়ে বাণিজ্যিক উত্তেজনা।

৫. **সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য যুদ্ধ**

- **তাৎপর্য:** এআই সাইবার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করলেও এটি উন্নতমানের **সাইবার আক্রমণের** সুযোগ করে দেয়। **ডিপফেক** এবং অপপ্রচারমূলক সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি।
- **প্রভাব:** গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর (Critical Infrastructure) সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচনের ওপর হুমকি। **হাইব্রিড যুদ্ধের** বিস্তার। বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং এআই গভর্ন্যান্স কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা।

এআই শাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতার অভাব**

- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে (যেমন: চালকহীন গাড়ি, এআই দ্বারা রোগ নির্ণয়) **আইনি দায়বদ্ধতা** বা 'লায়াবিলিটি'-র সুস্পষ্ট কাঠামোর অভাব। ডেভেলপার, ব্যবহারকারী নাকি পরিচালনাকারী—কার ওপর দায় বর্তাবে তা নির্ধারণ করা কঠিন।
- এআই-জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় প্রচলিত আইনি নীতিমালার অপর্যাপ্ততা।

২. **নৈতিক উদ্বেগ: পক্ষপাতিত্ব, গোপনীয়তা এবং নজরদারি**

- অ্যালগরিদমিক **পক্ষপাতিত্বের** কারণে নিয়োগ, ঋণদান, পুলিশিং এবং জনকল্যাণমূলক কাজে বৈষম্যের সৃষ্টি। আদর্শগত অডিটিং এবং স্বচ্ছতার অভাব।

- ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং গণ-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে **ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ঝুঁকি**।
- উপাত্ত-চালিত শাসনব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক অধিকারের (গোপনীয়তা, সমতা, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া) মধ্যে দ্বন্দ্ব।

৩. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় (Societal and Cultural Disruptions)**

- এআই-দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট নিয়ে **মেধা স্বত্ব** (Intellectual Property) এবং লেখকস্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ।
- কর্মক্ষেত্র, সৃজনশীলতা এবং জ্ঞান উৎপাদনের ধারায় আমূল পরিবর্তন।
- অ্যালগরিদমের সিদ্ধান্তের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা (Human Agency) কমিয়ে দিচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা নষ্ট করছে।

৪. **সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনমত (Social Stability and Public Perception)**

- কর্মসংস্থান হারানো এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ভয়। রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক না হলে **সামাজিক অস্থিরতার** ঝুঁকি।
- অঞ্চল ও প্রজন্মভেদে **ডিজিটাল সাক্ষরতার** বড় ব্যবধান।

৫. **জাতীয় পর্যায়ের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা (National-Level Capacity Constraints)**

- সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং উন্নত গবেষণায় সীমাবদ্ধতা। বিদেশি এআই প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং কার্যকর উপাত্ত সুরক্ষা আইনের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা।
- দেশীয় উদ্ভাবন, এআই দক্ষতা বৃদ্ধি (NEP 2020) এবং **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের** (PPP) গুরুত্ব।

ভবিষ্যতের পথ

১. **মানব-কেন্দ্রিক এআই**

- এআই ডিজাইনের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে (স্বাস্থ্যসেবা, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা) মানুষের **তত্ত্বাবধান** (Human Oversight) নিশ্চিত করা।
- জনমনে আস্থা তৈরিতে ন্যায্যতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে অন্তর্ভুক্ত করা। মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং মানুষের **সক্ষমতা বৃদ্ধির** হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করা।

২. **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি**

- এআই-চালিত উৎপাদনশীলতা থেকে প্রাপ্ত সুফলকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়া। বড় পরিসরে **পুনঃদক্ষতা** (Reskilling) এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে বিনিয়োগ করা।
- কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি মোকাবিলায় **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী** শক্তিশালী করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও উন্নয়নশীল অঞ্চলের দিকে নজর দিয়ে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো।

৩. **ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ**

- ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে একটি **অভিযোজনযোগ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো** (Adaptive Regulatory Framework) গ্রহণ করা।
- অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা, উপাত্ত সুরক্ষা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- এমন কঠোর নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে চলা যা উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আইনকে প্রযুক্তিগতভাবে প্রাসঙ্গিক রাখতে নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা।

৪. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**

- এআই নৈতিকতা এবং শাসনের বিষয়ে বৈশ্বিক মানদণ্ড তৈরি করা। উপাত্ত শাসন, সাইবার নিরাপত্তা এবং **স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র** নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

- জাতিসংঘ (UN), জি-২০ (G20) এবং ওইসিডি (OECD)-র মতো বহুপাক্ষিক ফোরাম ব্যবহার করে নীতি নির্ধারণ করা। নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বিভাজন এবং **এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতা** রোধ করা।

৫. সক্ষমতা বৃদ্ধি

- গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন এবং ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা। প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং **স্বনির্ভরতাকে** উৎসাহিত করা।
- উচ্চশিক্ষা এবং শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো। শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে একটি দক্ষ এআই জনবল বা **ট্যালেন্ট পাইপলাইন** তৈরি করা।

উপসংহার

এআই (AI)-এর এই জোয়ার একটি **রূপান্তরমূলক যুগের** সূচনা করেছে, যা একদিকে যেমন অভূতপূর্ব উদ্ভাবন এবং উৎপাদনশীলতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অন্যদিকে তেমনি বৈষম্য এবং **ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের** ঝুঁকিও তৈরি করে। এআই যাতে মানবজাতির কল্যাণে অগ্রসর হয়, তা নিশ্চিত করতে এর ভবিষ্যৎ প্রভাব মূলত দূরদর্শী শাসনব্যবস্থা, **বৈশ্বিক সহযোগিতা** এবং **অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালার** ওপর নির্ভর করবে।

প্রশ্ন: *আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতি একই সাথে অভূতপূর্ব সুযোগ এবং জটিল প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। এআই-এর এই আকস্মিক উত্থানের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ভারতের বিশেষ প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে এর দায়িত্বশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার উপায়গুলো প্রস্তাব করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.3.4. SHANTI আইন এবং ভারতের পারমাণবিক রূপান্তর

প্রেক্ষাপট

- সম্প্রতি ভারতের সংসদ **'সাসটেইনেবল হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্ট অফ নিউক্লিয়ার এনার্জি ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া' (SHANTI)** আইন পাস করেছে, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎ খাতে **বেসরকারি সংস্থাগুলোর** অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে। এই আইনটি ১৯৬২ সালের **'অ্যাটোমিক এনার্জি অ্যাক্ট'** এবং ২০১০ সালের **'সিভিল লায়বিলিটি ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ অ্যাক্ট'** (CLNDA)-কে রদ করে একটি নতুন নিয়ন্ত্রক ও দায়বদ্ধতা কাঠামো তৈরি করেছে।
- SHANTI আইনের মূল লক্ষ্য হলো পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে ভারতের যাত্রাকে গতিশীল করা এবং **২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট** পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। তবে, সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের দায়মুক্তি, ক্ষতিপূরণের আইনি কাঠামোর শিথিলতা এবং জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য **'মোরাল হ্যাজার্ড'** বা **নৈতিক ঝুঁকির** বিষয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

সংস্কারের পটভূমি: SHANTI আইনের যৌক্তিকতা

SHANTI আইন ভারতের পারমাণবিক খাতকে একটি বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন মডেল থেকে মুক্ত ও **সংকর (hybrid) ইকোসিস্টেমে** রূপান্তরিত করার একটি কাঠামোগত পদক্ষেপ। এই আমূল পরিবর্তনের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে:

- **জ্বালানি অংশগ্রহণে দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা:** কয়েক দশক ধরে অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও, ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র **৩%** আসে পারমাণবিক উৎস থেকে। বর্তমানে এই সক্ষমতা মাত্র **৮.৭৮ গিগাওয়াট**, যা জ্বালানি খাতের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে।

- **লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঐতিহাসিক ব্যর্থতা:** এই খাতে বারবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার নজির রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকে ২০০০ সালের মধ্যে ১০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও অর্জিত হয়েছিল মাত্র ২.৮৬ গিগাওয়াট। একইভাবে, ২০০৬ সালে নেওয়া ২০ গিগাওয়াট (২০২০ সালের মধ্যে) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন ছিল মাত্র ৬.৭৮ গিগাওয়াট।
- **পদ্ধতিগত বাধা এবং দীর্ঘসূত্রতা:** উচ্চ মূলধন খরচ, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং প্রকল্পের দীর্ঘ বিলম্ব এই ব্যর্থতার মূল কারণ। কালপক্কমের **প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (PFBR)** এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ; ২০১০ সালে এটি চালু হওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হতে পারেনি।
- **সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা:** এই খাতটি উন্মুক্ত করার ফলে বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়বে, যা সরকারি তহবিলের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দেশীয় ও বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করবে।
- **উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার:** বেসরকারি খাতের প্রবেশ **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR)** এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, দেখা গেছে যে SMR প্রযুক্তি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর একক প্রতি মূলধন খরচ অনেক বেশি হতে পারে।
- **পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে উত্তরণ:** ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট-জিরো'** বা কার্বনমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই সংস্কারকে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

SHANTI আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারতের পারমাণবিক নীতিতে **SHANTI আইন** এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ২০৪৭ সালের মধ্যে **১০০ গিগাওয়াট** পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **কার্বনমুক্ত (Decarbonization)** লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান:** এই আইন পারমাণবিক বিদ্যুতে সরকারের একক নিয়ন্ত্রণ শেষ করেছে। এখন থেকে **বেসরকারি সংস্থা** এবং যৌথ উদ্যোগগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন, কেন্দ্র পরিচালনা এবং বিশেষ সরঞ্জাম ও জ্বালানি তৈরির কাজ করতে পারবে।
- **কৌশলগত সরকারি নিয়ন্ত্রণ:** ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, ব্যবহৃত জ্বালানি (spent fuel) ব্যবস্থাপনা এবং থোরিয়াম প্রক্রিয়াকরণের মতো সংবেদনশীল **'ফুয়েল-সাইকেল'** কার্যক্রম শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই সংরক্ষিত থাকবে।
- **শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা (AERB):** পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে (AERB) **সংবিধিবদ্ধ মর্যাদা (Statutory Status)** দেওয়া হয়েছে। এখন এটি সরাসরি **সংসদের কাছে দায়বদ্ধ**, যা এর স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- **স্তরভিত্তিক দায়বদ্ধতা ব্যবস্থা:** প্রকল্পের আকার অনুযায়ী পরিচালনাকারীদের (operators) জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে:
  - **বৃহৎ প্রকল্প:** ৩,০০০ কোটি টাকা।
  - **মাঝারি প্রকল্প:** ১,৫০০ কোটি টাকা।
  - **স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর (SMR):** ১০০ কোটি টাকা।
- **নিউক্লিয়ার লায়বিলিটি ফান্ড:** পরিচালনাকারীর সীমার অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ মেটাতে কেন্দ্র সরকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করবে। কোনো একটি দুর্ঘটনার জন্য মোট ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা হবে **৩০০ মিলিয়ন SDR** (প্রায় ৩,৯০০ কোটি টাকা)।
- **সরবরাহকারীদের পূর্ণ দায়মুক্তি:** পূর্ববর্তী CLNDA ২০১০ আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে এখন **সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার (Right of Recourse) বাতিল করা হয়েছে।** সরঞ্জামে ত্রুটি থাকলেও সরবরাহকারীরা সব ধরণের দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায় থেকে মুক্ত থাকবেন; সমস্ত দায়ভার কেবল পরিচালনাকারীর ওপর বর্তাবে।
- **আইনি একীকরণ:** এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তরা অন্য কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনের আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। সমস্ত অভিযোগ এই আইনের নির্ধারিত কাঠামোর মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।
- **অ-বিদ্যুৎ খাতের তদারকি:** বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও স্বাস্থ্যসেবা (রেডিওথেরাপি), কৃষি এবং শিল্প গবেষণায় **বিকিরণের (Radiation)** শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি লাইসেন্সিং ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

- **বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা:** দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে **'অ্যাটোমিক এনার্জি রিড্রেসাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল'** এবং একটি বিশেষায়িত **কমিশন** গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ আপিল ট্রাইব্যুনাল (APTEL) এখানে চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে।
- **আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্য:** ভারতের কোনো দুর্ঘটনায় বিদেশের ক্ষয়ক্ষতিও এই আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যা **'কনভেনশন অন সাপ্লিমেন্টারি কমপেনসেশন'** (CSC)-এর মতো আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

SHANTI আইনের গুরুত্ব

SHANTI **আইন** পারমাণবিক জ্বালানি খাতকে একটি উচ্চ-মূল্যের বাণিজ্যিক বাজারে রূপান্তরিত করতে এবং বেসরকারি শিল্পের জন্য বিশাল আর্থিক সুযোগ তৈরি করতে ডিজাইন করা হয়েছে।

- **বিশাল বাজারের সুযোগ:** পারমাণবিক প্রকল্পগুলোতে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই আইন ভারতের বহু-বিলিয়ন ডলারের এই বাজারকে **বেসরকারি সংস্থাগুলোর** জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
- **দায়বদ্ধতাহীন মুনাফা:** বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি সরবরাহকারীরা এখন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বড় কোনো আর্থিক ঝুঁকি বা আইনি মামলার ভয় ছাড়াই বিশাল মুনাফা অর্জন করতে পারবে।
- **বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ:** সরঞ্জাম ত্রুটিপূর্ণ হলেও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার (Right of Recourse) বাতিল করায় বড় ধরণের 'ঝুঁকির বাধা' দূর হয়েছে, যা **সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)** বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- **ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ:** এই আইন নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং কাজের গতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের **লাভজনকতা** নিশ্চিত করে।

গুরুতর উদ্বেগ: জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা ঝুঁকি

শিল্পের উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এই আইনে কিছু বড় উদ্বেগের জায়গা রয়েছে:

- **ক্ষতিপূরণে বিশাল বৈষম্য:** আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের সর্বোচ্চ সীমা (প্রায় ৩,৯০০ কোটি টাকা) ঐতিহাসিক দুর্যোগগুলোর ব্যয়ের তুলনায় প্রায় হাজার গুণ কম। যেমন, **ফুকুশিমা** দুর্ঘটনায় ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং **চেরনোবিল** দুর্ঘটনায় বেলারুশের ক্ষতি হয়েছিল ২১ লক্ষ কোটি টাকা।
- **ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক বোঝা:** আন্তর্জাতিক সহায়তা মিললেও তা মোট ক্ষয়ক্ষতির **১%** পূরণ করতে পারবে কি না সন্দেহ। আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে নাগরিকরা নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির বোঝা নিজেরাই বইতে বাধ্য হতে পারেন।
- **'মোরাল হ্যাজার্ড' বা নৈতিক ঝুঁকি:** কোম্পানিগুলোকে বিশাল আর্থিক দায় থেকে মুক্তি দেওয়ায় তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বজায় রাখার তাগিদ কমে যেতে পারে এবং অধিক মুনাফার জন্য **অতিরিক্ত ঝুঁকি** নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।
- **'অ্যাবসলিউট লায়বিলিটি' বা নিরঙ্কুশ দায়বদ্ধতার শিথিলতা:** "গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের" কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় পরিচালনাকারীদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এটি বিপজ্জনক শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠিত আইনি নীতিকে দুর্বল করে, যা শক্তিশালী ও **দুর্যোগ-সহনশীল** কেন্দ্র তৈরির আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে।
- **কর্পোরেট স্বার্থকে অগ্রাধিকার:** এই কাঠামোটি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচালেও দুর্ঘটনার বিশাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি রাষ্ট্র এবং জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়।

পারমাণবিক জ্বালানি প্রসারে অন্যান্য উদ্যোগ

- **জাতীয় পারমাণবিক জ্বালানি মিশন:** ২০২৫-২৬ বাজেটে ২০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি শুরু হয়েছে, যার লক্ষ্য ২০৩৩ সালের মধ্যে পাঁচটি দেশীয় SMR (Small Modular Reactor) চালু করা।
- **BARC-এর দেশীয় উদ্ভাবন:** ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার ২০০ মেগাওয়াটের **'ভারত স্মল মডুলার রিঅ্যাক্টর'** (BSMR-200) তৈরি করছে, যা আমদানিনির্ভরতা কমাবে।

- **ত্রি-স্তরীয় বিদ্যুৎ কর্মসূচি:** থোরিয়াম মজুত ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী **জ্বালানি সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি কৌশলগত পরিকল্পনা।
- **আন্তর্জাতিক পারমাণবিক জোট:** রাশিয়া ও ফ্রান্সের মতো দেশগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে ভারত উন্নত প্রযুক্তি ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: SHANTI কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ

- **নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বাধীনতা বৃদ্ধি:** বাণিজ্যিক গতির চাপে যেন নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য AERB-কে 'অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন'-এর প্রভাবমুক্ত করে পূর্ণ **কার্যকরী স্বায়ত্তশাসন** প্রদান করতে হবে।
- **ক্ষতিপূরণের সীমা পুনর্বিবেচনা:** নাগরিকদের সুরক্ষার্থে দায়বদ্ধতার সীমা **মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ** করা বা সম্ভাব্য দুর্যোগের মাত্রার সাথে যুক্ত করা উচিত, যাতে বড় কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাস্তবসম্মত হয়।
- **চুক্তিবদ্ধ দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা:** আইনে সরাসরি সুযোগ না থাকলেও, সরঞ্জামের মান বজায় রাখতে পরিচালনাকারীদের উচিত সরবরাহকারীদের সাথে বেসরকারি চুক্তিতে কঠোর **'ইন্ডেমনিটি ক্লজ'** বা ক্ষতিপূরণের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।
- **দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়নে জোর:** উচ্চমূল্যের বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমাতে ভারতের বিশাল থোরিয়াম মজুত ব্যবহার করে **'ত্রি-স্তরীয় পারমাণবিক কর্মসূচি'** ত্বরান্বিত করতে হবে, যা দীর্ঘমেয়াদী **জ্বালানি সার্বভৌমত্ব** নিশ্চিত করবে।
- **জনসচেতনতা ও স্বচ্ছতা:** পারমাণবিক নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ দূর করতে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা প্রোটোকল সম্পর্কে **জনগণের আস্থা** বৃদ্ধি করবে।

উপসংহার

SHANTI আইন ভারতের পারমাণবিক খাতকে উন্মুক্ত করতে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে **'নেট জিরো'** লক্ষ্য অর্জনে একটি সাহসী পদক্ষেপ। তবে, সরবরাহকারীদের দায়মুক্তি এবং ক্ষতিপূরণের সীমিত সীমা জননিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। এই আইনের সাফল্য নির্ভর করবে **'Ease of Doing Business'** বা ব্যবসা সহজীকরণের সাথে কঠোর নিরাপত্তা মানদণ্ড এবং ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার সঠিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর।

প্রশ্ন: *SHANTI আইনের লক্ষ্য হলো ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করা। এই সংস্কার বাণিজ্যিক কার্যকারিতার সাথে জননিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছে কি না—তা সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.3.5. ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) বা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষেবা

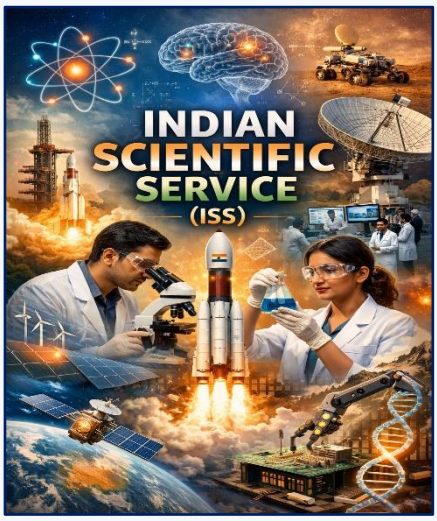

ভূমিকা: ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) হলো একটি প্রস্তাবিত **অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস** (সর্বভারতীয় পরিষেবা), যা প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। **"বিজ্ঞানী-প্রশাসক"** ধারণাটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে, এর লক্ষ্য হলো গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ব্যবস্থাপনাকে পেশাদার করা এবং উন্নত ভারতের জন্য তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ নিশ্চিত করা।

ISS প্রতিষ্ঠার কারণসমূহ

- **নীতি নির্ধারণে প্রযুক্তিগত গভীরতা:** এটি **AI (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), সেমিকন্ডাক্টর** এবং **জিনোমিক্সের** মতো জটিল উদীয়মান খাতগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য গভীর জ্ঞান প্রদান করে, যেখানে সাধারণ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয়।

- **তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক শাসন:** এটি নিশ্চিত করে যে জাতীয় নীতিগুলো কেবল প্রশাসনিক সুবিধার পরিবর্তে **নির্ভুল বৈজ্ঞানিক উপাত্ত** এবং প্রযুক্তিগত বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।
- **"ভ্যালি অফ ডেথ" (Valley of Death) অতিক্রম করা:** এটি ল্যাবরেটরি গবেষণা এবং বাণিজ্যিক শিল্প পণ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য **প্রযুক্তি-ব্যবস্থাপক** তৈরি করে ভারতের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- **কৌশলগত মিশনের নেতৃত্ব:** নিবেদিত বৈজ্ঞানিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে এটি **গ্রিন হাইড্রোজেন** বা **মহাকাশ মিশনের** মতো বৃহৎ জাতীয় প্রকল্পগুলোতে সমন্বয়হীনতা এবং বিলম্ব রোধ করে।
- **বৈজ্ঞানিক সততা ও স্বায়ত্তশাসন:** এটি এমন একটি আইনি কাঠামো তৈরি করে যা বিজ্ঞানীদের প্রথাগত আমলাতান্ত্রিক নিয়মের তোয়াক্কা না করে **নিরপেক্ষ প্রযুক্তিগত সতর্কতা** (যেমন জলবায়ু বা পরিবেশগত ঝুঁকি) প্রদানের সুযোগ দেয়।
- **বৈশ্বিক প্রযুক্তি-কূটনীতি:** এটি আন্তর্জাতিক মান, মেধাসম্পদ (IP) অধিকার এবং কৌশলগত সম্পদ (যেমন বিরল মৃত্তিকা খনিজ) চুক্তিতে আলোচনার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ **"বিজ্ঞানী-কূটনীতিক"** তৈরি করে।

ISS প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

১. সমন্বিত বিজ্ঞান প্রশাসন

বর্তমানে ভারতের বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলো (যেমন DST, DBT, CSIR, ISRO, DRDO) আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। একটি ISS থাকলে:

- **কেন্দ্রীভূত পুল তৈরি হবে:** "বিজ্ঞানী-প্রশাসকদের" একটি নিবেদিত দল তৈরি হবে যারা গবেষণা এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া—উভয়ই বোঝেন।
- **নিয়োগের মানদণ্ড:** একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারের বৈজ্ঞানিক কাঠামোতে উচ্চ মেধাবীদের প্রবেশ নিশ্চিত করা যাবে।

২. তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ

জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি বা AI নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো এখন শাসনের মূলে রয়েছে।

- **ক্ষমতায় কারিগরি সাক্ষরতা:** ISS কর্মকর্তারা মন্ত্রণালয়গুলোকে বিশেষ পরামর্শ দিতে পারবেন, যা সাধারণ আমলাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।
- **কৌশলগত পরিকল্পনা:** এটি প্রযুক্তিগত প্রবণতা অনুমান করার এবং সেগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে।

৩. পেশাগত উন্নতি এবং প্রতিভা ধরে রাখা

- **মেধা পাচার (Brain Drain) রোধ:** একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং সুগঠিত কর্মজীবনের সুযোগ দিয়ে সরকার শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের বিদেশ যাওয়া বা বেসরকারি খাতে চলে যাওয়া আটকাতে পারবে।
- **নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা:** এটি জাতীয় গবেষণাগার এবং মিশনগুলো পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা নিশ্চিত করবে।

৪. বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক কূটনীতি

- **আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্ব:** ISS কর্মকর্তারা IPCC, WHO বা CERN-এর মতো বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে কূটনৈতিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সমন্বয়ে ভারতের হয়ে আরও ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

এ পর্যন্ত সরকারের গৃহীত উদ্যোগসমূহ

- **STIP 2020 (খসড়া):** সর্বশেষ **বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন নীতি** স্পষ্টভাবে একটি বিশেষায়িত "বিজ্ঞান প্রশাসন" ক্যাডার তৈরির প্রস্তাব করেছে।

- **নীতি (NITI) আয়োগের ৩-বছরের কর্ম পরিকল্পনা:** বায়োটেকনোলজি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির মতো প্রযুক্তিগত খাতে **ল্যাটারাল এন্ট্রি** (সরাসরি নিয়োগ) সুপারিশ করেছে।
- **অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ANRF):** ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে গবেষণার কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে।
- **এমপাওয়ারড টেকনোলজি গ্রুপ (ETG):** সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এই গ্রুপটি গঠিত হয়েছে।
- **UPSC ল্যাটারাল এন্ট্রি:** ২০১৮ সাল থেকে পরিবেশ ও ইলেকট্রনিক্সের মতো মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা ISS-এর একটি প্রাথমিক মহড়া হিসেবে কাজ করছে।
- **মিশন কর্মযোগী:** সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের কারিগরি বিভাগগুলো আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি।

বৈশ্বিক চর্চা ও শিক্ষা

- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:** এখানে একটি **দ্বৈত-ক্যারিয়ার ব্যবস্থা** রয়েছে যা বিজ্ঞানীদের তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা না ছেড়েই উচ্চ প্রশাসনিক পদে আরোহণের সুযোগ দেয়।
- **যুক্তরাজ্য (UK):** প্রতি মন্ত্রণালয়ে একজন **চিফ সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার (CSA)** থাকেন এবং ১০,০০০-এর বেশি বিশেষজ্ঞের একটি আলাদা পেশাদার বাহিনী রয়েছে।
- **চীন:** সিভিল সার্ভিসে ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানীদের নিয়োগের ওপর উচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **জার্মানি:** এখানে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কর্মীদের নিয়মিত আদান-প্রদান ঘটে।

ISS প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **"সাধারণ বনাম বিশেষজ্ঞ" দ্বন্দ্ব**

ভারতীয় আমলাতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে **মেকলে (Macaulayian)** মডেল অনুসরণ করে, যা বিশেষজ্ঞদের তুলনায় সাধারণ আমলাদের (IAS) প্রাধান্য দেয়।

- **ক্ষমতার লড়াই:** বিদ্যমান অল-ইন্ডিয়া সার্ভিসগুলোর মধ্যে শীর্ষ নীতি-নির্ধারণী পদ শেয়ার করার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ রয়েছে।
- **সীমাবদ্ধতা:** সমালোচকরা মনে করেন বিজ্ঞানীদের "টানেল ভিশন" (গভীর জ্ঞান থাকলেও সীমিত ক্ষেত্র) থাকে, যা বহুমুখী সামাজিক চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে।

২. **ফেডারেল এবং সাংবিধানিক বাধা**

- **ধারা ৩১২-এর প্রয়োজনীয়তা:** একটি নতুন অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস তৈরির জন্য **রাজ্যসভায়** উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন, যা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হতে পারে।
- **রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন:** রাজ্যগুলো একে কেন্দ্রের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখতে পারে।

৩. **প্রশাসনিক ও দক্ষতাগত ঘাটতি**

- **ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ:** বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দক্ষ হলেও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা বা সমঝোতার দক্ষতায় পিছিয়ে থাকতে পারেন, যার জন্য বড় প্রশিক্ষণ অবকাঠামো প্রয়োজন।

৪. **আইনি ও পেশাগত গতিশীলতা**

- **পরিচালন বিধি (Conduct Rules):** বর্তমান সরকারি নিয়মগুলো বিজ্ঞানীদের জন্য সীমাবদ্ধ হতে পারে, বিশেষ করে যখন কোনো গবেষণা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যায়।

ভবিষ্যৎ পথ

- **পাইলট প্রজেক্ট:** শুরুতে MeitY এবং **বায়োটেকনোলজির** মতো উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন বিভাগে পরীক্ষামূলকভাবে ISS চালু করা যেতে পারে।
- **সংবিধানের ধারা ৩১২:** একটি শক্তিশালী আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য রাজ্যসভার প্রস্তাবের মাধ্যমে এটিকে অল-ইন্ডিয়া সার্ভিস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত।
- **দ্বৈত-ক্যারিয়ার মডেল:** এমন ব্যবস্থা রাখা যেখানে কর্মকর্তারা জ্যেষ্ঠতা না হারিয়েই **গবেষণা এবং নীতি ব্যবস্থাপনা**—উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারেন।
- **ল্যাটারাল এন্ট্রি প্রাতিষ্ঠানিক করা:** শিক্ষাবিদ এবং বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের ৩-৫ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়ে সরকারকে আধুনিক প্রযুক্তিতে আপডেট রাখা।
- **ANRF-এর নেতৃত্ব: ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে** এই সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ করা উচিত যাতে নিয়োগ রাজনৈতিক না হয়ে মেধা-ভিত্তিক হয়।

উপসংহার

ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS) হলো **"বিকশিত ভারত"** গড়ার পথে একটি অপরিহার্য সেতু, যা ভারতকে একটি বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি-শাসিত রাষ্ট্রে (Technocracy) রূপান্তর করবে। **ধারা ৩১২**-এর মাধ্যমে শাসনে বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে যুক্ত করলে তা তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে কৌশলগত নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন: *"২১ শতকের শাসনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা নীতি নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক দক্ষতার গভীর সমন্বয় দাবি করে।" এই প্রসঙ্গে, একটি **ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক সার্ভিস (ISS)** প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করুন। এর সম্ভাব্য গুণাবলি, চ্যালেঞ্জ এবং ভারতে বিজ্ঞান-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উপায়গুলি আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

3.3.6. এআই ইমপ্যাক্ট সংক্রান্ত নয়াদিল্লি ঘোষণা

প্রেক্ষাপট

ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ (১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত) ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানে ভারত নিজেকে **গ্লোবাল সাউথ** বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর এআই (AI) শাসনের নেতা হিসেবে তুলে ধরেছে।

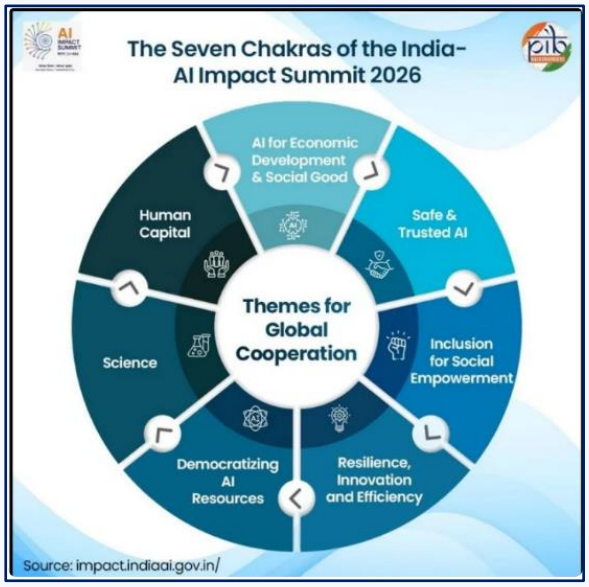

এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের পটভূমি

দিল্লি সামিটটি ছিল বিশ্বজুড়ে চলা ধারাবাহিক আলোচনার একটি অংশ, যার বিবর্তন নিচে দেওয়া হলো:

- **ব্লেচলে পার্ক, ইউকে (২০২৩):** মূলত **এআই সুরক্ষা** (AI Safety) এবং এর অস্তিত্বের ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা হয়।
- **সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া (২০২৪):** এআই সুরক্ষা এবং **উদ্ভাবনের** (Innovation) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়।
- **প্যারিস, ফ্রান্স (২০২৫):** ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং মানদণ্ড নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- **নয়াদিল্লি, ভারত (২০২৬):** এই সম্মেলনে মূল ফোকাস ছিল **বাস্তবায়ন, অন্তর্ভুক্তি** এবং **গ্লোবাল সাউথের** স্বার্থ রক্ষা।

মূল আকর্ষণ: "সাতটি চক্র" বা স্তম্ভ

নয়াদিল্লি ঘোষণাটি সাতটি মূল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বিশ্বের জন্য এআই-এর রোডম্যাপ নির্ধারণ করে:

1. **এআই সম্পদের গণতন্ত্রীকরণ:** সমস্ত দেশের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে **কম্পিউট** (Compute), **ডেটা** এবং **মডেল** নিশ্চিত করা।
2. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ:** উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক কল্যাণে এআই-এর ব্যবহার।
3. **সুরক্ষিত ও বিশ্বস্ত এআই:** নৈতিক সুরক্ষা কবচ এবং স্বেচ্ছায় নিরাপত্তা মানদণ্ড তৈরি করা।
4. **বিজ্ঞানের জন্য এআই:** স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং জলবায়ু গবেষণায় এআই-এর গতি বৃদ্ধি।
5. **সামাজিক ক্ষমতায়ন:** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় ভাষাভাষীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজাইন।
6. **মানব সম্পদ উন্নয়ন:** ব্যাপক হারে দক্ষতা বৃদ্ধি (Skilling), পুনঃদক্ষতা (Reskilling) এবং এআই সাক্ষরতার ওপর জোর দেওয়া।
7. **সহনশীল ও দক্ষ এআই:** পরিবেশবান্ধব এবং শক্তি-সাশ্রয়ী এআই সিস্টেমের প্রচার।

নয়াদিল্লি ঘোষণা ও এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের প্রধান ফলাফল

১. নয়াদিল্লি ঘোষণা ও বৈশ্বিক কাঠামো

সামিটের প্রধান ফলাফল ছিল এই অ-বাধ্যতামূলক কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা, যা **"সাতটি চক্র"** (Seven Chakras) বা স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

- **এআই-এর গণতান্ত্রিক প্রসারের চার্টার** (Charter for the Democratic Diffusion of AI): গুটিকয়েক দেশের হাতে প্রযুক্তি কুক্ষিগত হওয়া রোধ করতে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে কম্পিউট, ডেটাসেট ও অ্যালগরিদম সবার কাছে পৌঁছে দিতে একটি স্বেচ্ছাসেবী কাঠামো।
- **গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট কমন্স** (Global AI Impact Commons): স্বাস্থ্যসেবা এবং কৃষির মতো খাতে এআই-এর সফল ব্যবহারগুলো আন্তঃসীমান্তে ভাগ করে নেওয়ার এবং বাস্তবায়নের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম।
- **ট্রাস্টেড এআই কমন্স** (Trusted AI Commons): দায়িত্বশীল এআই বিকাশের লক্ষ্যে মানদণ্ড (benchmarks), সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং নৈতিক নির্দেশাবলীর একটি সম্মিলিত ভাণ্ডার।

২. ভূ-রাজনৈতিক এবং কৌশলগত পরিবর্তন (Geopolitical and Strategic Shifts)

- **প্যাক্স সিলিকা উদ্যোগ** (Pax Silica Initiative): সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইন, উন্নত কম্পিউটিং হার্ডওয়্যার এবং খনিজ সম্পদ সুরক্ষিত করতে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন এই জোটে যোগ দিয়েছে।
- **বিশ্ব বন্ধু** (Vishwa Bandhu) **ভূমিকা:** উন্নত বিশ্বের (Global North) প্রযুক্তিগত মান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের (Global South) সামাজিক-অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারত।
- **GPAI-এর বিস্তার:** সামিটে **গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন এআই** (GPAI)-এর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে **সৌদি আরব** এবং **মাল্টাকে** নতুন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানানো হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামো প্রতিশ্রুতি

- **বিশাল বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি:** পরিকাঠামো উন্নয়নে (ডেটা সেন্টার, ফ্যাব প্ল্যান্ট) **২৫০ বিলিয়ন ডলার** এবং ডিপ-টেক ভেঞ্চার ফান্ডিংয়ের জন্য প্রায় **২০ বিলিয়ন ডলারের** বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **কম্পিউট পাওয়ার** (GPU) **বৃদ্ধি:** IndiaAI Mission 2.0-এর অধীনে ২০২৬ সালের মধ্যে **১,০০,০০০ জিপিইউ** (GPU) স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যাতে স্টার্টআপ ও গবেষকরা সস্তায় কম্পিউট সুবিধা পায়।
- **MSME এআই স্ট্যাক:** ইউপিআই (UPI)-এর সাফল্যের আদলে ছোট ব্যবসার জন্য একটি **"AI Playbook"** চালুর পরিকল্পনা, যাতে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে।

৪. দেশীয় প্রযুক্তিগত সাফল্য

- **সার্বভৌম এলএলএম (Sovereign LLMs):** ভারতে প্রশিক্ষিত মডেল যেমন **Sarvam AI** (Sarvam-30B ও 105B) এবং ১৭টি ভারতীয় ভাষার **BharatGen** (১৭ বিলিয়ন প্যারামিটার) মডেলের উদ্বোধন।
- **হার্ডওয়্যার উদ্ভাবন:** ভারতে তৈরি এআই স্মার্ট গ্লাস **'Sarvam Kaze'**-এর উন্মোচন।
- **মানব (MANAV) ভিশন:** প্রধানমন্ত্রী মোদী এআই-এর জন্য **MANAV** কাঠামো (Moral, Accountable, National Sovereignty, Accessible, Valid) উন্মোচন করেছেন, যা ভারতের নৈতিক দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

৫. মানব সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব

- **এআই ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্ট প্লেবুক:** এআই-চালিত অর্থনীতির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি (skilling) ও পুনঃদক্ষতা (reskilling) নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দেশিকা।
- **ফ্ল্যাগশিপ চ্যালেঞ্জ:** উদ্ভাবকদের স্বীকৃতি দিতে **AI for ALL** (অন্তর্ভুক্তি), **AI by HER** (নারী নেতৃত্বাধীন) এবং **YUVAi** (তরুণ নেতৃত্বাধীন) পুরস্কার প্রদান।
- **বিচার বিভাগীয় সততা:** বিচারকদের জন্য **"AI Essentials for Judges"** চালু করা হয়েছে, যাতে "ব্ল্যাক-বক্স জাস্টিস" (অস্বচ্ছ বিচার) রোধ করা যায় এবং এআই যেন মানুষের বিচারবুদ্ধির ওপর প্রাধান্য না পায়।

এআই ইমপ্যাক্ট সামিট নিয়ে উদ্বেগ

১. বাধ্যতামূলক প্রয়োগের অভাব

- **আকাঙ্ক্ষা বনাম বাস্তবায়ন:** সমালোচকরা বলছেন যে **'গণতান্ত্রিক প্রসারের' (Democratic Diffusion)** নীতিগুলো দেশগুলো আদেও মেনে চলছে কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বা যাচাইকরণ ব্যবস্থা নেই।
- **স্বেচ্ছাসেবী কাঠামো: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) এআই অ্যাক্টের** মতো এখানে কোনো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেই। ফলে এটি কোনো প্রকৃত দায়বদ্ধতা ছাড়াই কেবল একটি 'প্রদর্শনীতে' পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

২. "অদৃশ্য" শ্রম সংকট

- **কর্মসংস্থান হারানো:** দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের **৫৮ লক্ষ তথ্য প্রযুক্তি (IT)** কর্মীর জন্য এটি একটি বড় হুমকি।
- **ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা: জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (GenAI)**-এর কারণে এন্ট্রি-লেভেল কোডিং, ডেটা এন্ট্রি এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যাপক বেকারত্বের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

৩. মানবাধিকার এবং সীমারেখা

- **নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতি: প্রেডিক্টিভ পুলিশিং (Predictive Policing)** বা **বায়োমেট্রিক নজরদারির (Biometric Surveillance)** মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কাজে এআই ব্যবহারে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, যা প্রায়ই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **সুরক্ষা কবচের অভাব: অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International)** টেক জায়ান্টদের "ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ" বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় এই সম্মেলনের সমালোচনা করেছে।

৪. ভূ-রাজনীতি এবং 'ডেটা উপনিবেশবাদ'

- **ডেটা কলোনি ঝুঁকি:** ভয় করা হচ্ছে যে **গ্লোবাল সাউথ** বা উন্নয়নশীল দেশগুলো কেবল কাঁচা ডেটা এবং প্রতিভা সরবরাহ করবে, অথচ উচ্চ-মূল্যের মডেলগুলোর মালিকানা থাকবে **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US)** এবং **চীনের** সংস্থাগুলোর হাতে।
- **ভূ-রাজনৈতিক বর্জন:** বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর হাব হওয়া সত্ত্বেও কূটনৈতিক স্পর্শকাতরতার কারণে **তাইওয়ানকে (Taiwan)** বাদ রাখা হয়েছে, যাকে হার্ডওয়্যার ও পরিকাঠামো বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বড় ঘাটতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৫. পরিবেশ এবং স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্যা

- **সম্পদের তীব্র ব্যবহার:** বড় আকারের এআই মডেলগুলোর প্রশিক্ষণের ফলে শক্তির ব্যবহার বা বিদ্যুৎ খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- **জলের সংকট:** ডেটা সেন্টারগুলো ঠান্ডা রাখতে প্রতিদিন প্রায় **১১ লক্ষ লিটার জল** প্রয়োজন। এটি জল-সংকটে থাকা অঞ্চলগুলোর জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. বাস্তবায়ন এবং লজিস্টিক সমস্যা

- **'প্রদর্শনী' হিসেবে সমালোচনা:** কিছু পর্যবেক্ষক মনে করেন, অনুষ্ঠানটি শাসনের (Governance) আলোচনার চেয়ে বিনিয়োগ চুক্তির **'ট্রেড এক্সপো'** বা বাণিজ্য মেলার মতো বেশি মনে হয়েছে।
- **দেশীয় নির্ভরযোগ্যতা:** বিদেশি প্রযুক্তিকে (যেমন: চীনের রোবট ডগ) দেশীয় উদ্ভাবন হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাগুলি দেশীয় এআই দাবির সত্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বিকাশের জন্য পদক্ষেপসমূহ

১. ডিপিআই-এর মাধ্যমে সুযোগের গণতন্ত্রীকরণ

- **এআই-ডিপিআই মেলবন্ধন (AI-DPI Convergence):** এআই-কে একটি জনকল্যাণমূলক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য **"ইন্ডিয়া স্ট্যাক"** (UPI/Aadhaar) মডেলকে ব্যবহার করা। "সাধারণ ডিজিটাল রেল" (Common digital rails) তৈরির ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো (MSMEs) বড় টেক কোম্পানিগুলোর ওপর নির্ভর না করেই উন্নত মানের ডেটা এবং মডেল ব্যবহার করতে পারবে।
- **ভাষিণী ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি:** BHASHINI প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্থানীয় উপভাষায় ভয়েস-ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করা, যাতে নিরক্ষর মানুষও ব্যাংকিং এবং সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে।

২. সার্বভৌম এআই এবং পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ

- **ইন্ডিয়া-এআই মিশন ২.০ (IndiaAI Mission 2.0):** জাতীয় কম্পিউট ক্ষমতা বাড়িয়ে **১,০০,০০০ জিপিইউ** (GPU) করা এবং এর খরচ ভর্তুকি দিয়ে কমানো (প্রায় **৬৫ টাকা/ঘণ্টা**), যাতে কেবল ধনী কর্পোরেশন নয়, বরং সবাই উদ্ভাবন করতে পারে।
- **দেশীয় এলএলএম (BharatGen):** দেশের নিজস্ব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে **'ফাউন্ডেশনাল মডেল'** তৈরি করা, যাতে ভারতের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ভাষাগত গুরুত্ব বজায় থাকে।

৩. প্রান্তিক মানুষের জন্য ক্ষেত্র-ভিত্তিক পদক্ষেপ

- **কৃষি (কিষাণ ই-মিত্র):** ব্যক্তিগত শস্য পরামর্শ, মোবাইলের ছবির মাধ্যমে পোকা শনাক্তকরণ এবং জলবায়ু-সহনশীল চাষাবাদের জন্য এআই মোতায়েন করা।
- **স্বাস্থ্যসেবা (সুমন সখী):** গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য ট্র্যাকিংয়ের জন্য ASHA কর্মীদের এআই চ্যাটবট এবং রোগ নির্ণয়কারী সরঞ্জামের মাধ্যমে সহায়তা করা।
- **শিক্ষা (দীক্ষা এআই):** আঞ্চলিক ভাষায় ব্যক্তিগত শিক্ষার বিষয়বস্তু তৈরি এবং ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে এআই ব্যবহার করা।

৪. কর্মীবাহিনীর সুরক্ষা

- **ডিজিটাল শ্রমসেতু (Digital ShramSetu):** দেশের **৪৯ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের** জন্য একটি এআই প্ল্যাটফর্ম, যা দক্ষতার সাথে কাজের মিল ঘটায় এবং কাজের ফাঁকেই শিখতে সহায়তা করার জন্য 'মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়াল' প্রদান করে।
- **এআই ওয়ার্কফোর্স প্লেবুক:** কর্মীদের ডেটা এন্ট্রি থেকে **'এআই-অগমেন্টেড'** (এআই-চালিত উন্নত কাজ) ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য "ব্যাপক পুনঃদক্ষতা" (Mass reskilling)-এর বৈশ্বিক মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

৫. নৈতিক এবং নিরাপদ শাসন

- **মানব (MANAV) কাঠামো:** এআই যেন নৈতিক (Moral), দায়বদ্ধ (Accountable), জাতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা (National), সহজলভ্য (Accessible) এবং বৈধ (Valid) হয় তা নিশ্চিত করা।
- **"গ্লাস বক্স" স্বচ্ছতা:** জনকল্যাণে ব্যবহৃত এআই-এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। কোনো নাগরিক যদি এআই অ্যালগরিদমের কারণে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন, তবে কেন হলেন তা জানার জন্য তার **"ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার"** (Right to Explanation) থাকবে।

উপসংহার

নয়াদিল্লি ঘোষণা মূলত **সার্বভৌম এআই** (Sovereign AI) এবং প্রযুক্তির **গণতান্ত্রিক প্রসারের** (Democratic Diffusion) দিকে একটি বড় পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এআই-কে **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI)**-এর সাথে যুক্ত করে ভারত এমন একটি মানবিক মডেলের নেতৃত্ব দিচ্ছে যা নিশ্চিত করে যে আধুনিক প্রযুক্তি যেন বিশ্বব্যাপী ব্যবধান কমিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং সাম্যবাদী ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে

প্রশ্ন: *"অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ক্রমেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। এই প্রেক্ষাপটে, 'নিউ দিল্লি ডিক্লারেশন অন এআই ইমপ্যাক্ট'-এর উদ্দেশ্যগুলো বিশ্লেষণ করুন। ভারত কীভাবে উদ্ভাবনের সাথে নৈতিক ও নিয়ন্ত্রক সুরক্ষা কবচের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে?" (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to attempt more questions...

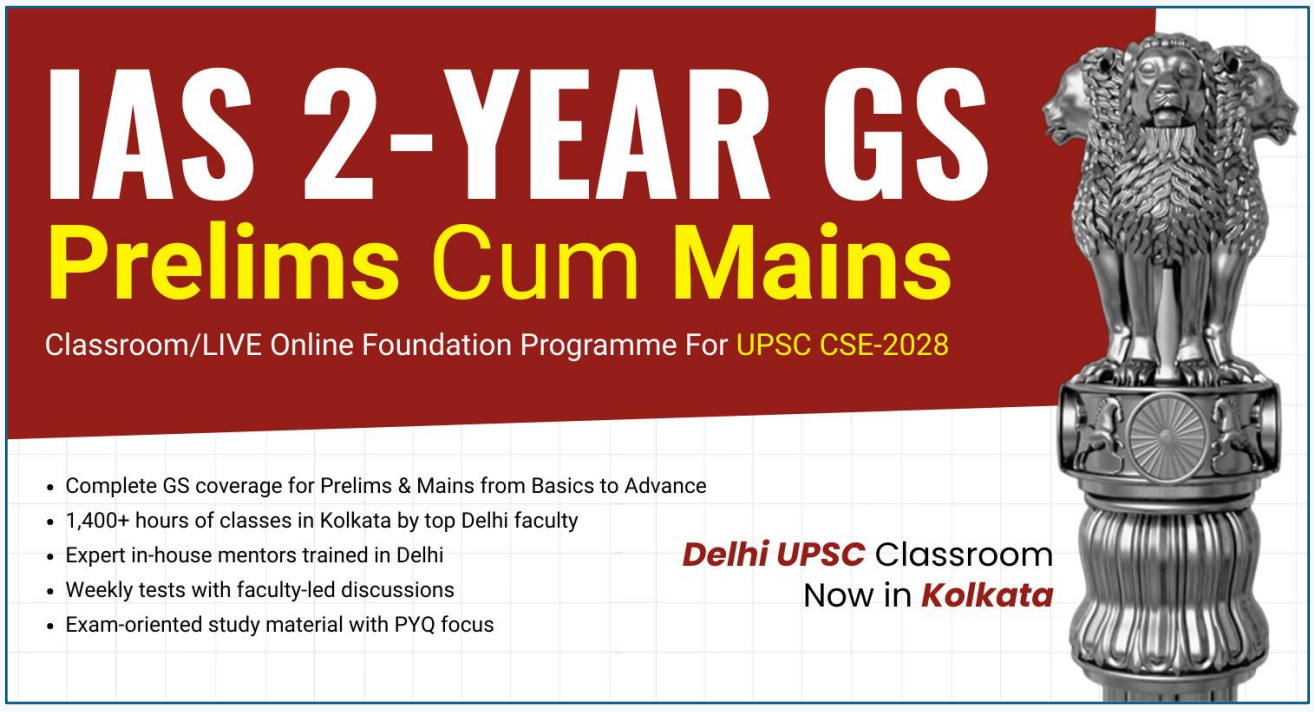

সাধারণ স্টাডিজ ৪

4.1. নীতিশাস্ত্র

4.1.1. খননযোগ্য সত্তা – পরবর্তী বড় পণ্য হিসেবে মানবজীবন

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের একটি ধারণাগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। মিডিয়া, প্রযুক্তি, অর্থায়ন, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইকোসিস্টেমের মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের নিজস্ব সত্তা, ব্যক্তিগত গল্প এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে একটি নতুন বৈশ্বিক পণ্যে রূপান্তরিত করা হচ্ছে—এই বিশ্লেষণে তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

শিল্প পুঁজিবাদ থেকে সামাজিকতা নিষ্কাশনের বিবর্তন

ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুঁজিবাদ থেকে সমসাময়িক যুগে উত্তরণের এই পথটি মূল্য আহরণ বা শোষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এক আমূল পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।

- **মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (Marxist Surplus Value Theory):** শিল্প পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল 'উদ্বৃত্ত মূল্য' তৈরি এবং তার শোষণ। কার্ল মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী, উদ্বৃত্ত মূল্য হলো শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের অতিরিক্ত যে মূল্য উৎপাদিত হয়, যা পুঁজির মালিক ও ব্যবস্থাপকদের পকেটে 'মুনাফা' নামক এক রহস্যময় রূপে জমা হয়।
- **নিষ্কাশনের নতুন দিগন্ত:** আজ মানুষ নিজেই পুঁজিবাদের নিষ্কাশন বা শোষণের নতুন লক্ষ্যবস্তু ও দিগন্ত হয়ে উঠেছে। এই নতুন লক্ষ্যবস্তু হলো মানুষের **'সামাজিকতা' (Sociality)**। অর্থাৎ, শোষণের কেন্দ্রবিন্দু এখন আর শারীরিক শ্রম নয়, বরং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল নির্যাস।
- **সামাজিক বন্ধনের সর্বব্যাপী শোষণ:** খনির মতো খুঁড়ে বের করার এই নতুন প্রক্রিয়াটি মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রকে লক্ষ্যবস্তু করে—তা সে বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক বন্ধন, সহপাঠী, সন্তান, সহকর্মী বা প্রতিবেশীই হোক না কেন।
- **কার্যকরী এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্ক:** এই শোষণ প্রক্রিয়া আমাদের ডিজিটাল জীবন, রাজনৈতিক মিত্র, এমনকি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহকারীদের পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ফলে মানুষের সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডই আজ মুনাফার সম্পদে পরিণত হয়েছে।
- **সামাজিক সুরক্ষা কবচের 'সৃজনশীল ধ্বংস' (Creative Destruction):** এই প্রক্রিয়াটি **'সৃজনশীল ধ্বংসের'** এক নতুন পর্যায়কে উপস্থাপন করে, যেখানে **গোপনীয়তা, অন্তরঙ্গতা এবং বিশ্বাসের** মতো সনাতন ধারণাগুলোকে সেকেলে বা অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই—কোনো অনুমতি বা সীমারেখা ছাড়াই মানুষের জীবন থেকে অবাধে তথ্য ও মূল্য নিষ্কাশন করা।

খননযোগ্য সত্তা এবং এর প্রধান চালিকাশক্তি

'খননযোগ্য সত্তা' বলতে বোঝায় মানুষের নিজস্ব অস্তিত্ব বা সত্তাকে একটি **পণ্য** হিসেবে বিবেচনা করা, যাকে গল্প, সামাজিকতা এবং ডিজিটাল পরিচয়ের মাধ্যমে **খনন, প্যাকেজজাত এবং অর্থোপকরণে (Monetise)** রূপান্তর করা সম্ভব। মানুষের সত্তাকে কাঁচামালের এই নতুন রূপে রূপান্তরিত করার পেছনে বিশ্ববাজারের তিনটি মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন কাজ করছে:

১. **বহনযোগ্যতা এবং চরিত্রের বৈশ্বিক সন্ধান**

বিশ্ববাজারের আকর্ষণ এখন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাজারকে দখল করে নিয়েছে। এর ফলে **মেক্সিকো থেকে নেপাল কিংবা স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া**—সর্বত্রই নতুন নতুন গল্পের এক বৈশ্বিক সন্ধান চলছে।

- **স্থানীয় লোকগাথা ও পুরাণের বাণিজ্যিকীকরণ:** প্রকাশনা সংস্থা এবং পুরস্কার কমিটিগুলো এখন স্থানীয় পৌরাণিক কাহিনী বা লোকগাথাগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। তাদের লক্ষ্য এমন কিছু খুঁজে বের করা যা সব দেশেই গ্রহণযোগ্য (Portability) এবং যার মধ্যে কিছু **'অস্পষ্ট সার্বজনীন আবেদন'** রয়েছে।
- **নতুন ধরনের চরিত্রের চাহিদা:** বিশ্ববাজারের ক্ষুধা মেটাতে এখন এলিয়েন, সাইবার-মনস্টার কিংবা পোস্ট-ব্লবসের মতো নতুন ও বৈচিত্র্যময় চরিত্র খোঁজা হচ্ছে।

২. **'আঞ্চলিকতা' বা লোকালিটির পুনঃসংজ্ঞা**

আঞ্চলিকতা এখন আর কেবল কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা নিকটবর্তী পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি এখন **বৈশ্বিক সমস্যাবলীর একটি প্রতিফলক** (Prismatic refraction) হিসেবে কাজ করে।

- **ন্যারেটিভ ফার্স্ট রেসপন্ডার্স (Narrative First Responders):** যুদ্ধক্ষেত্রে ক্যামেরা হাতে থাকা সাধারণ মানুষ যখন ছবি তোলেন, তারা মূলত ফটোসাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন এবং বিশ্বজুড়ে আলোচনার নতুন খোরাক জোগাতে সাহায্য করেন।
- **সিন্ডিকেটেড সংবাদ পরিষেবা:** বিভিন্ন বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থা স্থানীয় ঘটনাগুলোকে বাছাই (Triage) করে বিশ্ব মিডিয়ার চুল্লিতে জ্বালানি হিসেবে সরবরাহ করে। এর ফলে এমন এক নতুন ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি হচ্ছে যা স্থানীয় ও বৈশ্বিকের মধ্যকার চিরাচরিত পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেয়।

৩. **'আমি' এবং 'আমার' বহুধা বিস্তৃতি (Multiplication of the "I" and the "Me")**

নিজের একটি 'গল্প' থাকার অধিকার এখন আর কেবল ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এই অধিকার এখন সাধারণ মানুষ ছাড়িয়ে ব্যাংক, রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছেও পৌঁছে গেছে।

- **কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধূসর এলাকা:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই সন্ধিক্ষণে **সিরি (Siri) বা চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)**-র মতো বটগুলো মানুষের মতো আবেগ এবং দুর্বলতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এটি আবেগ, বিচারবুদ্ধি এবং সহজাত অনুভূতির (Intuition) ওপর মানুষের যে একক আধিপত্য ছিল, তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

গল্পকথনের মহান শৃঙ্খল

নিজস্ব সত্তার এই 'খনন' প্রক্রিয়াটি একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনা এবং দর্শক সংগ্রহের মাধ্যমে সচল রাখা হয়:

- **গল্পের অধিকার:** প্রতিটি ব্যক্তিকে **বীরত্ব, শিকার** (Victimhood) বা **মুক্তির গল্প** তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। **ইনফ্লুয়েন্সার, কোচ এবং বিভিন্ন রাইটিং অ্যাপের** মাধ্যমে এই গল্পগুলোকে বাজারের উপযোগী করে তোলার জন্য পেশাদার সহায়তা প্রদান করা হয়।
- **ভাইরাল হওয়ার বাণিজ্যিকীকরণ:** তুচ্ছ ব্যক্তিগত গল্পের আকস্মিক 'ভাইরাল' হওয়ার ঘটনা অসংখ্য ইউটিউব তারকার ক্যারিয়ার তৈরি করে দিয়েছে।
- **স্লোগানের মেলবন্ধন:** বর্তমান বাজার দুটি বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চলে—প্রথমত, প্রতিটি সত্তার একটি গল্প আছে; দ্বিতীয়ত, প্রতিটি গল্প একজন দর্শক পাওয়ার যোগ্য। এর ফলে ডেটা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জীবন্ত মানুষের অস্তিত্বকে খনির মতো খুঁড়ে দেখা হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত অনুঘটক: ওটিটি (OTT) স্ট্রিমিং এবং বিনির্মাণ

গল্পের বাজারে ওটিটি স্ট্রিমিং (নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, ডিজনি) বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

- **অবকাঠামোগত বিপ্লব:** ওটিটি প্রযুক্তি পুরোপুরি ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। এটি বড় স্টুডিওগুলোর আগের বাজার দখল করেছে এবং প্রচলিত ডিস্ট্রিবিউশন মডেলগুলোকে পাশ কাটিয়ে গেছে।
- **সাধারণের উত্থান:** গল্পের অর্থনীতি এখন 'অচেনা' বা সাধারণ মানের অভিনেতাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যারা অসামান্যভাবে সাধারণ। এটি নিজের সত্তার এক ধরণের গণতন্ত্রীকরণকে তুলে ধরে, যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি ইতিবাচক নয়।

- **অস্থির সমন্বয়:** চিরাচরিত ব্যক্তির ধারণা এখন **ক্রেডিট স্কোর**, বিমা তালিকা, অ্যালগরিদমিক ডেটাবেস এবং ভোক্তা প্রোফাইলের এক অস্থির সমন্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখন আর একজন একক বা অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন পড়ে না।
- **সেলফির উৎস: চার্লস টেলরের** বিখ্যাত **'সোর্সেস অব দ্য সেলফ'** (নিজের সত্তার উৎস) থেকে এখন আমরা **'সোর্সেস অব দ্য সেলফি'**-তে স্থানান্তরিত হয়েছি। এখানে তারকার পাশে **সেলফি তোলা বা ফটোবোম্বিং** করাকে **লেন্স-ভিত্তিক সমতার** মাধ্যমে গণতন্ত্রীকরণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

কেস স্টাডি: ভারতের স্ট্রিমিং বাজার

২০১৮ সালে **নেটফ্লিক্সের সিইও রিড হেস্টিংস** দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় বাজার **থেকে ১০ কোটি গ্রাহক** পাওয়া সম্ভব। এই ঘটনাটি **'ন্যারেটিভ কলোনাইজেশন' বা বর্ণনামূলক ঔপনিবেশিকতার ব্যাপক**তাকে তুলে ধরে, যেখানে বিশ্বব্যাপী সাবস্ক্রিপশন মডেলকে চাঙ্গা করতে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্ট্রিমিং কন্টেন্টের সাথে বুনে দেওয়া হচ্ছে।

খননযোগ্য সত্তার নৈতিক প্রভাব

বাণিজ্যিক মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের অস্তিত্বকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে গভীর নৈতিক উদ্বেগ তৈরি করে:

- **পণ্যকরণের মাধ্যমে অমানবিকীকরণ:** বন্ধুত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্কের মতো পবিত্র মানবিক বন্ধনগুলোকে বাজারজাতযোগ্য কাঁচামালে রূপান্তর করা মানুষের অস্তিত্বকে নিছক অর্থনৈতিক উপযোগিতায় নামিয়ে আনে।
- **নৈতিক কর্তৃত্বের অবক্ষয়:** একজন অখণ্ড ব্যক্তির পরিবর্তে তাকে যখন অ্যালগরিদমিক ডেটাবেস এবং ক্রেডিট স্কোরের এক অস্থির সমষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন স্বাধীন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- **সম্মতির অভাব:** মানুষের গভীরতম অনুরাগ এবং ক্ষণস্থায়ী সামাজিক সম্পর্কগুলোর এই নিয়মতান্ত্রিক খনন প্রায়শই অনুমতি ছাড়াই করা হয়, যা স্বায়ত্তশাসন এবং ডিজিটাল সম্মতির মৌলিক নীতিগুলোকে লঙ্ঘন করে।
- **মানবিক দুর্বলতার শোষণ:** বীরত্ব, বঞ্চনা কিংবা আত্মত্যাগের গল্পের নিরন্তর খোঁজ মূলত বৈশ্বিক বিনোদনের স্বার্থে মানুষের ট্রমা (মানসিক আঘাত) এবং কষ্টকে পণ্যে রূপান্তরিত করতে উৎসাহিত করে।
- **মানবিক আবেগের কৃত্রিম প্রতিস্থাপন:** মানুষের সহজাত বিচারবুদ্ধি এবং আবেগপ্রবণতাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা অনুকরণ করার ফলে একটি নৈতিক সংকট তৈরি হয়, যেখানে রোবট বা বটগুলো মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের আবেগ নিয়ে কারসাজি করার সুযোগ পায়।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ: ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের কৌশল

- **সামাজিক সার্বভৌমত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো তৈরি করা জরুরি, যাতে মানুষের গভীরতম আবেগ এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে স্পষ্ট অনুমতি বা সীমা লঙ্ঘন করে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা না যায়।
- **আখ্যান নিষ্কাশন বাজার নিয়ন্ত্রণ:** স্থানীয় অস্থিরতা বা মানসিক আঘাতকে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করা রুখতে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম এবং সংবাদ সংস্থাগুলোর ওপর কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।
- **পরিচয় এবং ব্যক্তিসত্তার সুরক্ষা:** একজন ব্যক্তিকে অ্যালগরিদমিক ডেটাবেসের সমষ্টিতে পরিণত করা প্রতিরোধ করতে পদক্ষেপ নিতে হবে; একজন ব্যক্তির অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন পরিচয়ের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- **AI-এর আবেগীয় অনুকরণের শাসন:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাতে মুনাফার উদ্দেশ্যে মানুষের আবেগ এবং সহজাত বিচারবুদ্ধিকে কবজা করতে না পারে, সেজন্য বৈশ্বিক নৈতিক মানদণ্ড (Global ethics standards) তৈরি করতে হবে।
- **গোপনীয়তার মূল্য পুনরুদ্ধার:** ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল পণ্যকরণের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা, অন্তরঙ্গতা এবং বিশ্বাসের সামাজিক গুরুত্ব ফিরিয়ে আনতে সাংস্কৃতিক ও আইনি পরিবর্তন প্রয়োজন।

উপসংহার

'খননযোগ্য সত্তা'র উদ্ভব একটি গভীর রূপান্তরকে নির্দেশ করে, যেখানে মানুষের গল্প এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো পুঁজিবাদী শোষণের প্রাথমিক চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করছে। প্রযুক্তি একদিকে যেমন নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি একজন ব্যক্তিকে বাজারজাতযোগ্য কাঁচামালে পরিণত করছে। এই সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবকেন্দ্রিক সামাজিকতা এবং অখণ্ড ব্যক্তিসত্তাকে রক্ষা করাই বর্তমান ডিজিটাল সভ্যতার প্রধান চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্ন: *মানুষের গল্পের বাণিজ্যিকীকরণ ক্ষতি, আবেগপূর্ণ শ্রম এবং আত্মীয়তার শোষণ নিয়ে গুরুতর নৈতিক উদ্বেগ তুলে ধরে। মানুষের জীবনকে একটি 'খনিযোগ্য পণ্য' হিসেবে গণ্য করার নৈতিক প্রভাবগুলো আলোচনা করুন। (২৫০ শব্দ)*

***

Scan to attempt more questions...

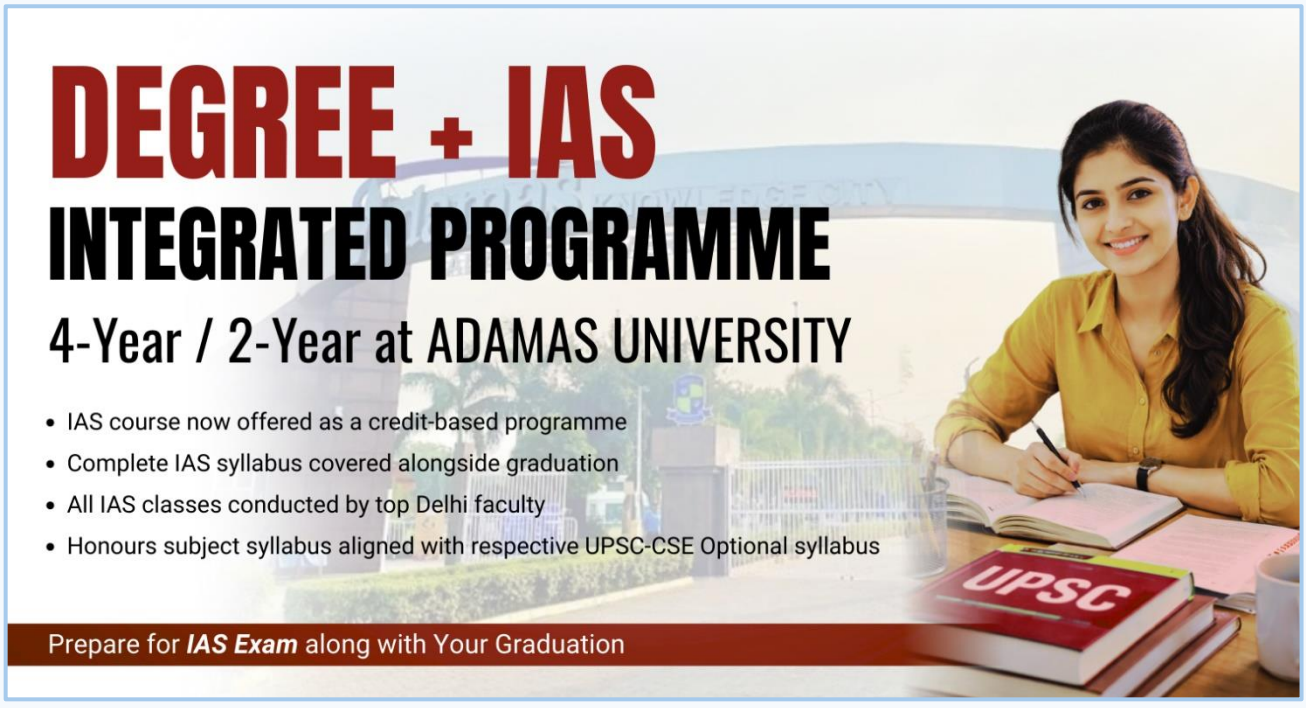

PROF. (DR.) SAMIT RAY
Chairman of RICE Group and
Chancellor of Adamas University

RICE IAS

Delhi's Top Notch IAS Faculty Now At Kolkata

2-YEAR GS PRELIMS & MAINS
Classroom/LIVE Online Foundation Programme

FOR UPSC-CSE 2028

Under the guidance of
S.A. MAJID
Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

KNOW YOUR FACULTY MEMBERS

AKSHAY VRAT
Experience – 12+ Yrs
Subject – Environment

DR. K SHIVESH
Experience – 20+ Yrs
Subject – Modern History

ALOK KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Science & Tech.

DR. KUMUD RANJAN
Experience – 20+ Yrs
Subject – Polity & Constitution

AMIT KUMAR
Experience – 10+ Yrs
Subject – Economics

VIJAY KUMAR
Experience – 07+ Yrs
Subject – Society

ANKIT SHARMA
Experience – 10+ Yrs
Subject – International Relations

KARUNA MISHRA
Experience – 07+ Yrs
Subject – Geography

PANKAJ SINGH
Experience – 10+ Yrs
Subject – AMC

DR. P M TRIPATHI
Experience – 25+ Yrs
Subject – Essay

Sealdah, Kolkata | Old Rajinder Nagar, New Delhi | At Adamas University

8100819447 | 9933118849 | 8100971442

Through the Eyes of Aspirants

Monthly Current affairs magazine of RICE IAS is really helping me alot. It is comprehensively covering current events with segregation of topics in subject wise.

P.V Surendra

The topics are comprehensively covered in each magazine content was crisp, clear & to the point that are very much important for the preparation & the current is also covered with the static part. Keep up the good work:

Kishore Muddada

By reading current affairs, it has become easy to conclude the important news at the end of monthly magazine.

Shreya Mondal

The monthly magazines for current affairs are exam-oriented and written in a very concise manner suitable for performing well in the examinations.

Aindrila saha

By reading Current Affairs it has become easy to conclude the important news at the end of the month.

Kashish Kapoor

Provides gainful insights about the current relevant news. Really beneficial.

Sulagna Roy

RICE IAS

GET CLOSER TO YOUR

IAS & IPS DREAMS

"Bengal once led India in the Civil Services, producing pioneers like Satyendra Nath Tagore and Subhas Chandra Bose. Today, we must revive that legacy. With the right guidance and training, Bengal's youth can again shape governance and nation-building. When Bengal's students rise, the whole nation prospers".

Prof. (Dr.) Samit Ray

CHAIRMAN OF RICE GROUP
& CHANCELLOR OF ADAMAS UNIVERSITY

S.A. MAJID

Co-Founder & Director **RICE IAS**
Vice President -ADAMAS UNIVERSITY

Rishita Das
UPSC CSE 2024
AIR 840

Pemba Narbu Sherpa
UPSC CAPF (AC) 2022
AIR 140

Tamali Saha
IFoS 2021
AIR 94

Sealdah, Kolkata	Old Rajinder Nagar, New Delhi	At Adamas University
8100819447	9933118849	8100971442